FUAD



হরর কাহিনি

অশুভ ছায়া

অনীশ দাস অপু

অতিপ্রাকৃত কাহিনি

অপার্থিব প্রেয়সী

আফজাল হোসেন



ANIK

হরর কাহিনি/অতিপ্রাকৃত কাহিনি

দুটি বই একত্রে

অশুভ ছায়া/অনীশ দাস অপু

এ বইয়ের কয়েকটি গল্প লেখার সময় বিচিত্র সব অনুভূতি কাজ করেছে আমার ভেতর। কখনও আঁতকে উঠেছি, কখনও বা শিরশির করে উঠেছে গা; একটি গল্প তো রাতের বেলায় লিখতেই পারিনি—এমন ভয় করছিল। কোন্ গল্পটি জানতে চান? ওটা রহস্যই থাক। শুধু বলি—আমার অনুভূতি শেয়ার করতে চাইলে বসে যান এ-বই নিয়ে। তারপর দেখুন 'অশুভ ছায়া'র আড়াল থেকে বেরোতে পারেন কি না!

অপার্থিব প্রেয়সী/আফজাল হোসেন

তরুণ লেখক আফজাল হোসেন 'রহস্যপত্রিকা'-য় নিয়মিত লিখছেন। লেখকের বাছাই করা কয়েকটি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হলো 'অপার্থিব প্রেয়সী' সঙ্কলনটি। প্রতিটি কাহিনি বেড়ে উঠেছে আমাদের আশপাশের চেনাজানা পরিচিত পরিবেশকে ঘিরে, কিন্তু আসলে গল্পগুলো অন্য ভুবনের। পাঠক, কথা দিচ্ছি, প্রতিটি গল্প আপনাকে রোমাঞ্চিত করবে, করবে শিহরিত। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

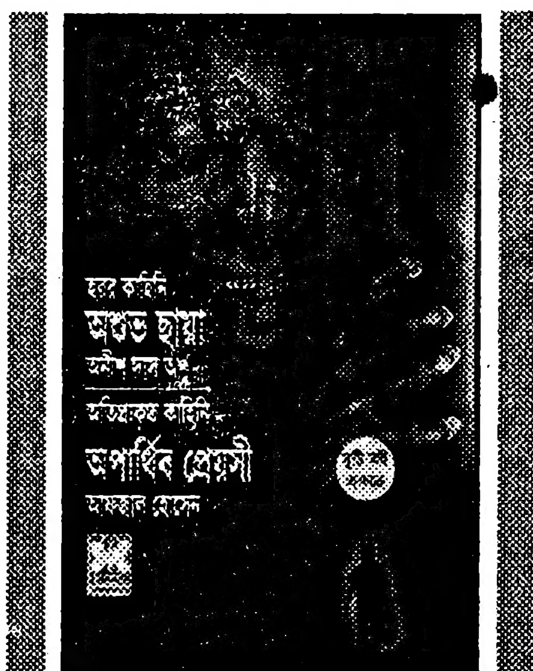
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অশুভ ছায়া

অনীশ দাস অপু

অপার্থিব প্রেয়সী

আফজাল হোসেন





সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-0250-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১২

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

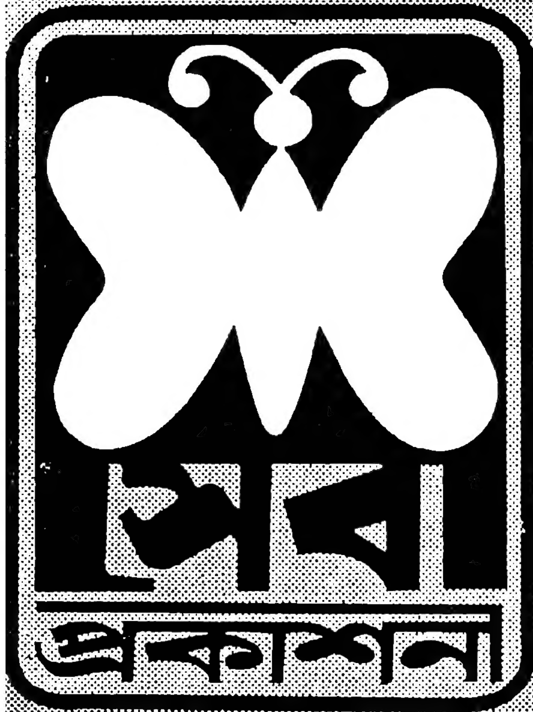
হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

ASHUBHO CHHAYA
By: Anish Das Apu

APARTHIBO PREYOSHI
By: Afzal Husain



একাত্তর টাকা

অশুভ ছায়া

উৎসর্গ

তৃষা

(এই মেয়েটি মাঝে মাঝে এস এম এস করে এমন সব মজার dirty jokes পাঠায়, আমি হাসতে হাসতে চেয়ার উল্টে পড়ে যাই!)

অপার্থিব প্রেয়সী

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় কাজী শাহনূর হোসেন

শ্রদ্ধেয় হাসানাত পারভেজ মুন্‌না

এই দু'জন মহৎ মানুষের অনুপ্রেরণায়

'কলম' এখন আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।

সূচি

অশুভ ছায়া

অপার্থিব প্রেয়সী

ভূমিকা

আমি এ পর্যন্ত যতগুলো গল্প সংকলন করেছি, আমার ধারণা 'অশুভ ছায়া' সেগুলো থেকে বেশ ব্যতিক্রম। আগের গল্প সংকলনগুলোতে ভূত-প্রেতের আধিক্য ছিল। 'অশুভ ছায়া' ভৌতিক কাণ্ডকারখানা থেকে অনেকটাই মুক্ত। আমি পাঠকদের ভিন্নরকম ভয়ের আমেজ দিতে চেয়েছি বইটিতে। এ বইতে ভূতের আধিক্য তেমন না থাকলেও ভৌতিক আবহ পুরোটাই আছে। Horror-এর যে আভিধানিক অর্থ, 'আতংকজনিত কম্পন' গল্পগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন, ওই উপাদানের কোনও ঘাটতি নেই বইতে। কয়েকটি গল্পে রয়েছে সায়েন্স ফিকশনের ছোঁয়া। যারা হরর–সায়েন্স-ফিকশন পড়তে পছন্দ করেন, তাঁদের খুবই ভাল লাগবে ওই গল্পগুলো। হরর-এর সঙ্গে সায়েন্সের মিশেল দিয়ে যে পিলে চমকানো গল্প তৈরি করা যায়, 'অশুভ যাত্রা', 'যন্ত্রণা' এবং 'হন্তারক' তার প্রমাণ। তিনটি গল্পই বিশ্বখ্যাত তিন লেখক হরর কাহিনি হিসেবে প্রকাশ করেছেন। আশাকরি পাঠক উপভোগ করবেন গল্পগুলো।

সেবা'র জন্যে পাণ্ডুলিপি তৈরির সময় আমি সবসময় বইয়ের নামকরণ নিয়ে সমস্যায় পড়ে যাই। তখন টিংকু ভাইয়ের শরণাপন্ন হতেই হয়। তিনি বরাবরই এ বৈতরণী পার হতে আমাকে সাহায্য করেছেন। এবারেও ডোবাননি। টাইটেল গল্পটির তিনটি নাম নির্বাচন করেছিলাম। টিংকু ভাই'র পছন্দ হলো 'অশুভ ছায়া' নামটি। হরর কাহিনি হিসেবে বেশ জুৎসই নাম, কী বলেন?

আমার হরর ভক্ত পাঠকরা প্রায়ই ফোন করে কিংবা এস এম এস পাঠিয়ে জানতে চান হরর উপন্যাস কবে থেকে শুরু করব। এ ভূমিকা যখন লিখছি (৩ মার্চ, রাত ১১-৩০), তার কিছুক্ষণ আগে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী ইভা ফোন করে একই প্রশ্ন করলেন।

জেনে খুশি হবেন শীঘ্রি আপনারা আমার হরর উপন্যাস পাবেন। ইতিমধ্যে 'ওয়্যার উলফ' নামে দুর্দান্ত একটি হরর উপন্যাসে হাতও দিয়েছি। আমি নিশ্চিত, বইটি আপনাদের দারুণ লাগবে! তবে সম্ভবত আগামী মাসেই 'রক্ত তৃষ্ণা' নামে চমৎকার একটি হরর সংকলন নিয়ে আবার আপনাদের সামনে হাজির হচ্ছি।

অনীশ দাস অপু
মুঠো ফোন: ০১৭১২৬২৪৩৩৬

অশুভ ছায়া

অনীশ দাস অপু

প্রথম প্রকাশ: ২০০৮

অশুভ ছায়া

অ্যানুবিসের বিশাল মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে। ওর অন্ধ চোখ শত সহস্র বছরের অসীম আঁধার সয়ে আসছে, হাজার বছরের ধুলো জমেছে পাথুরে ভ্রুতে। গুহার স্যাঁতসেঁতে হাওয়া বিকট মূর্তির গায়ে সৃষ্টি করেছে কালের ক্ষত, তবে পাথরের ঠোঁট দুটোর পৈশাচিক হাসির ভয়াবহতাকে ম্লান করতে পারেনি একটুও। যেন জ্যান্ত দানব একটা। কিন্তু শেয়াল দেবতা অ্যানুবিস নিষ্প্রাণ একটা পাথুরে মূর্তি ছাড়া কিছুই নয়। এই দেবতার যারা পূজা করত সেই পূজারীরা মরে কবে ভূত হয়ে গেছে। এই গুহার চারপাশে যেন মৃত্যুর ছায়া, এই ছায়া যেন ঘুরে বেড়ায় অ্যানুবিসকে ঘিরে। ঘাপটি মেরে আছে মমির কফিনে, গা মিশিয়ে আছে শতাব্দী প্রাচীন মেঝের ধুলোর স্তূপে। মৃত্যু এবং অন্ধকারের এই ভয়াল রাজ্যে আলোর প্রবেশ নিষেধ। গত তিন হাজার বছরে এখানে আলোর একটি রেখাও দেখা যায়নি। কিন্তু তিন হাজার বছর পর আজ দেখা গেল। গুহাগুলোর শেষ মাথায় ঝনঝন শব্দ শোনা গেল, কারা যেন ত্রিশ শতকের পুরোনো লোহার গেট খুলে ফেলল। তারপর খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে প্রতিফলিত হলো মশালের আলো, এরপর ভেসে এল মানুষের গলা। ব্যাপারটা রোমহর্ষক এবং অদ্ভুত। গত তিন হাজার বছরে এই কালো এবং ঘুটঘুটে অন্ধকার সমাধিস্তম্ভে আলোকরেখার কোনও প্রবেশ ঘটেনি। গত তিন হাজার বছরে ধুলোয় ধূসরিত মেঝেতে পড়েনি কারও পায়ের ছাপ। গত তিন হাজার বছরে এই গুহার প্রাচীন বাতাস বয়ে আনেনি কোনও মনুষ্য কণ্ঠ। এই গুহায় শেষ আলোকরেখা বিচ্ছুরিত হয়েছিল বাস্ত্-এর সন্ন্যাসীর হাতের মশাল থেকে; ধুলোয় শেষ পায়ের ছাপ পড়েছিল মিসরীয়দের; শেষ কণ্ঠটি শোনা গিয়েছিল নীলনদের এক পূজারীর। কিন্তু আজ, হঠাৎই গুহামুখ আলোকিত হয়ে উঠেছে বৈদ্যুতিক মশালের আলোয়, মেঝেয় বুট জুতোর শব্দ আর বাতাসে পুরুষালি ইংরেজ কণ্ঠ।

মশালের আলোয় মশালবাহীর চেহারা দেখা গেল। মানুষটি লম্বা, রোগা। বাঁ হাতে ধরা পার্চমেন্ট কাগজের মতই তাঁর চেহারায় বয়সের রেখা সুস্পষ্ট। ভদ্রলোকের মাথার চুল যেন কাশফুল, কোটরাগত চোখ আর হলদেটে ত্বক তাঁকে বুড়ো মানুষের কাতারে ফেললেও ঠোঁটে ঝুলে থাকা হাসিতে মালিন্য নেই একবিন্দু, যুবকের আত্মপ্রত্যয় এবং দৃঢ়সংকল্প যেন ধারণ করে আছে ওই হাসি। তাঁর ঠিক পেছনেই এক তরুণ, হুবহু বৃদ্ধের

চেহারা। বোঝাই যায় যুবক বৃদ্ধের সন্তান।

'আমরা তা হলে ঠিক জায়গায় এসে পড়েছি!' উত্তেজিত হয়ে বলল তরুণ।

'হ্যাঁ, খোকা, এসেছি।' হাসিমুখে জবাব দিলেন বাবা।

'বাবা, দেখ! ওই যে সেই পাথরের মূর্তি। ম্যাপে যেটার নাম লেখা ছিল!'

মেঝেতে হালকা পায়ে দুজনে আগে বাড়লেন, মূর্তিটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সার রোনাল্ড বার্টন হাতের মশালটা উঁচিয়ে ধরলেন শেয়াল দেবতাকে ভাল করে দেখার জন্য। পিটার বার্টন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে চোখ তুলে চাইল কদাকার চেহারাটার দিকে।

অনেকক্ষণ ধরে দুজনে খুঁটিয়ে দেখলেন বিশাল মূর্তিটিকে। দরজা দিয়ে আসা দমকা হাওয়া অ্যানুবিসের গা থেকে অনেকটা ধুলো উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। মশালের আলোয় চকচক করছে ওটার গা। বারো ফুট লম্বা, মানুষ আকৃতির কুকুরমুখো ওই শেয়াল দেবতার গোটা অস্তিত্বে অশুভ এবং ভয়ঙ্কর কী যেন একটা আছে। মূর্তিটার লম্বা হাত দুটো অভিশাপ দেয়ার ভঙ্গিতে উঁচিয়ে আছে, যেন কেউ তার শান্তিভঙ্গ করতে এলে লাফ দিয়ে বহিরাগতকে ধ্বংস করে ফেলবে। দানব মূর্তির পেছনে উঁকি দিলেন সার রোনাল্ড বার্টন। খালি একটা কুলুঙ্গি ছাড়া কিছু নেই ওখানে।

মূর্তির হাসিটা দারুণ জীবন্ত মনে হলো, পাথুরে চোখ দুটো যেন সতর্ক করে দিচ্ছে, সাবধান। কাছে এসো না।

দুজনের কেউ কথা বলছেন না, তবে দু'জনেরই কেমন অস্বস্তি হচ্ছে, গুমট, দমবন্ধ করা অবস্থা, আলো-ছায়ার এই গুহায় কীসের যেন অশুভ সঙ্কেত, বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভাঙলেন সার বার্টন নিজেই। 'ঠিক আছে, খোকা। সারাদিন এটার দিকে তাকিয়ে থাকলে কোনও ফায়দা হবে না। আমাদের এখন অনেক কাজ বাকি। ম্যাপটা একবার দেখে নিয়েছিস তো?'

'দেখেছি, বাবা,' মৃদু গলায় জবাব দিল ছেলে। বাপের মত গমগমে কণ্ঠ নয়। এখানকার বাতাসে দম নিতে তার কষ্ট হচ্ছে। কেমন নর্দমার গ্যাসের গন্ধ। তবে পুঁতি গন্ধটাকে সে সহ্য করে থাকল। কারণ পিটার জানে সে তার বাবার সঙ্গে একটি গোপন সমাধিস্তম্ভে প্রবেশ করেছে, মাটি থেকে সাতাশ ফুট নীচে। ত্রিশ শতাব্দীর প্রাচীন এক সমাধিস্তম্ভে। সমাধি আবিষ্কারের আনন্দও কিছুতেই মাথা থেকে অভিশাপের কথাটা বিস্মৃত হতে দিতে চাইছে না।

এই জায়গার ওপর একটি অভিশাপ রয়েছে; আর সেটি জানার জন্যই মূলত এখানে আসা। সার রোনাল্ড প্যাপিরাস পার্চমেন্ট ম্যাপটির সন্ধান

পেয়েছেন নিনথ পিরামিড খুঁড়তে গিয়ে। কী করে তিনি অভিযানকারী দলের অন্যান্যদের ফাঁকি দিয়ে কাগজখানা হাতড়িয়েছেন কেউ জানে না। কিন্তু যে ভাবেই হোক কাজটা করেছেন তিনি।

অবশ্য মানচিত্র চুরি করার জন্য তাঁকে খুব বেশি দোষ দেয়া যায় না। কারণ গত বিশ বছরে সার রোনাল্ড বার্টন অসংখ্য মরুভূমি চুল আঁচড়ানোর মত আঁচড়েছেন, আবিষ্কার করেছেন বহু পবিত্র ধ্বংসাবশেষ, মর্মোদ্ধার করেছেন কঠিন এবং দুর্বোধ্য সব চিত্রলিপির, কবর খুঁড়ে তুলেছেন কত মমি, স্ট্যাচু, প্রাচীন আসবাবপত্র, মূল্যবান পাথর। কিন্তু তাতে কী লাভটাই বা হয়েছে? যে সরকারের জন্য, দেশের জন্য, পুরাতত্ত্বের সমৃদ্ধির জন্য এত পরিশ্রম করেছেন তিনি, রক্ত পানি হয়ে গেছে খাটতে খাটতে, সেই দেশ কিংবা সরকার তো তাঁকে কিছু দেয়নি। অন্তত পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রধানের আসনে অধিষ্ঠিত করার সম্মানটুকু পর্যন্ত দেখায়নি। তা হলে, শেষ বয়সে খ্যাতি এবং অর্থপ্রাপ্তির আশায় তিনি যদি একটু এদিক-সেদিক করেনই, তা হলে কি তাঁর খুব বেশি নিন্দা করা যায়?

তা ছাড়া মিসরের প্রায় সব পুরাতত্ত্ব বিজ্ঞানীরই মাথায় কমবেশি একটু ছিট আছে। অবশ্য দিনের পর দিন চাঁদি ফাটানো, মগজ গলিয়ে দেয়া রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে উত্তপ্ত বালু খননের মত বিরক্তিকর এবং একঘেয়ে কাজ আর নেই। মস্তিষ্ক রীতিমত বিদ্রোহ করে। আর মাটির নীচের ড্যাম্প পড়া নিকষকালো কবরগুলোর ভৌতিক আবহ শুকিয়ে দেয় আত্মা। প্রাচীন, ভয়ঙ্কর চেহারার দেবতাদের দিকে তাকানোর ব্যাপারটিও খুব একটা সুখকর নয়, বিশেষ করে বেড়াল মাথার বুবাসিস্ট, নাগ দেবতা সেট এবং সাক্ষাৎ শয়তান আমন-রা পিরামিডের সামনে যেভাবে অতন্দ্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে থাকে, তাতে এদেরকে অগ্রাহ্য করে পিরামিডের ভেতরে প্রবেশ করার কথা ভাবতে অতি সাহসী লোকেরও বুক কাঁপে। নিষিদ্ধ এই এলাকার বাতাসে মৃত্যুর গন্ধ রক্তে যেন শিহরণ জাগায়, শিরায় শিরায় হেঁটে বেড়ায় কিলবিলে পোকার মত। সার রোনাল্ড শখের বশে কিছুদিন প্রেততত্ত্ব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন। সম্ভবত এ কারণে ভৌতিক ব্যাপারগুলোর প্রতি অন্যদের চেয়ে তাঁর আকর্ষণ একটু বেশিই। তাই পার্চমেন্টের ম্যাপটা চুরি করতে তিনি দ্বিধা করেননি, যে কোনও মূল্যে এটা যোগাড়ে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এই ম্যাপটি প্রাচীন মিসরের এক সন্ন্যাসীর দখলে ছিল। কিন্তু সন্ন্যাসী মোটেও ভাল লোক ছিলেন না। তিনি প্রেততত্ত্বের ওপর একটি পাণ্ডুলিপি রচনা করেছিলেন। সন্ন্যাসী, বলাবাহুল্য ছিলেন প্রেতপূজারী। সার রোনাল্ড এই পাণ্ডুলিপি খুঁজে পান সন্ন্যাসীর মমির সঙ্গে। তবে লেখাটি তিনি নষ্ট করেননি। ভয় ছিল যদি অভিশাপ নেমে আসে। সার রোনাল্ডের ধারণা যে

কোনও কারণেই হোক সন্ন্যাসীর ওপর প্রেত দেবতাদের অভিশাপ নেমে এসেছিল। কারণ মমি করা সন্ন্যাসীর হাত, পা, চোখ কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। যেন নিষ্ঠুর আক্রোশে কেউ হাত আর পা ছিঁড়ে নিয়েছে, উপড়ে ফেলেছে চোখ। তবে এতদিন পরেও ছিন্নভিন্ন লাশে পচন ধরেনি। পশুচামড়ায় লেখা ছিল পাণ্ডুলিপি। প্রাচীন মিসরীয় ভাষা জানেন বলে লেখাটি পড়তে অসুবিধে হয়নি সার বার্টনের। যতই পড়েছেন ততই বিস্মিত হয়েছেন, আগ্রহ বেড়েছে পরের পৃষ্ঠাগুলো পড়ার জন্যে। পড়তে পড়তে জানতে পারেন অন্ধকার রাজ্যের এক পিশাচ দেবতার কবরের কথা। এই দেবতা অশুভ আর ধ্বংসের প্রতীক, আলোর ঘোরতর শত্রু, আঁধারই তার চালিকাশক্তি। পাণ্ডুলিপির মধ্যে সার রোনাল্ড একটি ম্যাপ, একটি চার্ট এবং পিশাচ দেবতার গুহায় পৌঁছার সমস্ত নির্দেশনাও পেয়ে যান।

পিটার বার্টনের মনে আছে সেই রাতের কথা যে রাতে বাবা দুর্বোধ্য ওই পাণ্ডুলিপি ইংরেজিতে অনুবাদ করে ওকে পড়িয়ে শুনিয়েছিলেন। মনে পড়ে বাবার চোখ কী রকম ঝিকমিক করছিল, যেন বুকের ভেতর থেকে উঠে আসছিল কথাগুলো।

'এবং মানচিত্রের নির্দেশানুযায়ী তুমি দেখতে পাবে সমাধির প্রভুকে যিনি তাঁর উপাসক এবং ধনরত্ন নিয়ে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন।'

শেষ শব্দটা উচ্চারণ করার সময় উত্তেজনায় সার রোনাল্ডের কণ্ঠ যেন বসে গিয়েছিল।

'এবং প্রবেশের রাতে তোমাকে অবশ্যই শেয়াল দেবতার উদ্দেশে তিনটে শেয়ালকে উৎসর্গ করতে হবে, এবং তাজা রক্ত খেতে দিতে হবে শুষ্ক বালুকে। তারপর নেমে আসবে অসংখ্য ক্ষুধার্ত বাদুড়, এরা শেয়ালগুলোকে ভক্ষণ করবে এবং রক্ত নিয়ে চলে যাবে অন্ধকার জগতে পিতা সেট-এর উদ্দেশ্যে।'

'এ স্রেফ কুসংস্কার,' বলেছিল পিটার।

'বাজে কথা বলিস না,' পিটারকে ভর্ৎসনা করেছিলেন সার রোনাল্ড। 'এই রচনার প্রতিটি জিনিস আমি তোকে ব্যাখ্যা করতে পারি, বোঝাতে পারি। কিন্তু তাতে তোর ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না।' পিটার আর কিছু না বলে শুনে গেছে। 'বাইরের চত্বরে আসার পর তুমি দরজাটা দেখতে পাবে, দরজার গায়ে প্রভুর চিত্রাঙ্কিত প্রতীক। প্রতীকটির সপ্তম মস্তকের সপ্তম জিভটি ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে দরজা থেকে ছুটিয়ে আনবে। তারপর খুলে যাবে দরজা এবং সমাধি কক্ষে ঢোকার অধিকার একমাত্র হবে তোমারই। ভেতরের চত্বরে যেতে তোমাকে গুনে গুনে তেত্রিশবার পা ফেলতে হবে, তারপরই তুমি সোজা গিয়ে উপস্থিত হবে অ্যানুবিসের মূর্তির সামনে। যার আরেক নাম পথপ্রদর্শক।

'অ্যানুবিস! এটা মিসরীয়দের এক দেবতার নাম না?' অবাক হয়ে জানতে চেয়েছে পিটার।

তারপর বাবা পাণ্ডুলিপি দেখে ছেলের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

'প্রভু অ্যানুবিস-এর হাতে আছে জীবন এবং মৃত্যুর চাবিকাঠি, তিনি গুপ্ত কার্নেটারকে পাহারা দেন, এবং কেউ তাঁর অনুমতি ছাড়া অবগুণ্ঠন উত্তোলন করতে পারে না। এই শেয়াল দেবতাকে যদি কেউ বন্ধু ভেবে থাকে তা হলে সে মহা ভুল করবে। কারণ তিনি বন্ধু নন। অ্যানুবিস ছায়ার দেবতা, আর এ জন্যেই তিনি সকল রহস্য গোপন রাখেন। বহু আগে, যে দিনের হিসেব কেউ জানে না, সেই সময় প্রভু অ্যানুবিস মানুষের সামনে প্রথমবারের মত উপস্থিত হয়েছিলেন। দেবতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম এক বিশেষ চেহারায়, তাঁর প্রকৃত রূপে হাজির হন। তাঁর সেই বিশেষ চেহারা তুমি দেখতে পাবে ভেতরের বারান্দার শেষ মাথায়। দেখতে পাবে পথপ্রদর্শক-এর আসল চেহারা।'

'সাংঘাতিক ব্যাপার তো!' বিড়বিড় করে বলেছে পিটার। 'ব্যাপারটা সত্যি হলে কী অবস্থা হবে চিন্তা কর একবার? শেয়াল দেবতার বিকট চেহারার আসল রূপ সামনাসামনি দেখার কথা ভাবা যায়!'

সার রোনাল্ড হেসেছেন শুধু, কোনও মন্তব্য করেননি। আবার পড়ায় মনোনিবেশ করেছেন তিনি।

'দেবতার প্রথমদিকের চেহারা বাকিগুলো থেকে ভিন্ন' বর্ণনা করেছে পাণ্ডুলিপি। 'তবে এই চেহারা দেখা সাধারণ মানুষের জন্যে মঙ্গলজনক নয়, তাই পূজারী প্রভুরা যুগ যুগ ধরে তাঁর প্রকৃত চেহারা লুকিয়ে রেখেছেন এবং তাঁর প্রয়োজন অনুসারে তাঁর পূজা করেছেন। কিন্তু এখন আমাদের শত্রুরা–ওদের আত্মা পুড়ে মরুক, পচন ধরুক শরীরে।–ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে অবজ্ঞা করার সাহস দেখালে প্রভু তাঁর প্রতিবিম্ব লুকিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেন এবং তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর প্রতিবিম্বকেও কবর দেয়া হয়।'

শেষের লাইনগুলো সার রোনাল্ড আরও দ্রুত পড়ে গেছেন, বার বার কেঁপে উঠেছে তাঁর কণ্ঠ: 'কিন্তু গুহার শেষ মাথায় অ্যানুবিস শুধু এই কারণে একা দাঁড়িয়ে নেই। তিনি আক্ষরিক অর্থেই পথপ্রদর্শক, এবং তাঁর সাহায্য ছাড়া কেউ সমাধির ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না।'

এই পর্যন্ত পড়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকেছেন বুড়োমানুষটি।

'কী হলো?' অধৈর্য পিটার জানতে চেয়েছে। 'আমার ধারণা এই শেয়াল দেবতাকে নিয়েও অনেক আজগুবি পূজা-অর্চনার কথা আছে, তাই না?'

সার রোনাল্ড জবাব দেননি, নীরবে কী যেন ভাবছিলেন। পিটার লক্ষ করেছে পার্চমেন্ট ধরা বাবার হাত দুটো কাঁপছে। যখন চোখ তুলে চেয়েছেন, ভয়ানক বিমর্ষ লাগছিল তাঁকে। 'হ্যাঁ, খোকা'–ঘড়ঘড়ে গলায় জবাব দিয়েছেন

তিনি। 'ঠিক তাই–আরেক অনুষ্ঠানের কথা বলা আছে ওখানে। কিন্তু ওখানে যাওয়ার আগে এ নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে।'

'তার মানে তুমি ওখানে যাবে–জায়গাটা খুঁজে দেখবে?' উৎসুক হয়ে শুধিয়েছে ছেলে। 'অবশ্যই যাব,' যেন জোর করে কথাটা বলানো হয়েছিল তাঁকে। পার্চমেন্টের শেষ ভাগে আবার নজর ফিরিয়ে নিয়েছেন তিনি:

'কিন্তু সাবধান, অবিশ্বাসীরা কিন্তু এখানে প্রবেশ করলেই মরবে। প্রভু অ্যানুবিসকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগুনো হয়তো সম্ভব হবে, তবে তিনি অনুপ্রবেশকারীকে বাইরের পৃথিবীতে ফেরত যেতে দেবেন না। মনে রেখ অ্যানুবিস এক অদ্ভুত দেবতা যার মধ্যে রয়েছে এক গোপন আত্মা।'

সার রোনাল্ড এই ক'টা লাইন অস্ফুটে খুব দ্রুত পড়ে কাগজটা ভাঁজ করে ফেলেছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আলোচনার মোড় ভিন্ন প্রসঙ্গে ঘুরিয়ে নেন। যেন এই ব্যাপারটাকে ভুলে থাকতে চাইছেন।

পরের সপ্তাহ বাপ-ছেলের কেটে যায় দক্ষিণে অভিযানের জন্য যোগাড়যন্ত্রে। পিটার অবাক হয়ে লক্ষ করে বাবা যেন তাকে কেমন এড়িয়ে চলছেন, একান্ত প্রয়োজন না হলে কথা বলেন না। শুধু ভ্রমণ বিষয়ক আলোচনা হলে দুজনের কথা হয়। কিন্তু পিটার কিছুই ভোলেনি। তার প্রশ্ন বাবা নীরবে সেদিন কী পড়ছিলেন। কেন তাঁর হাত কাঁপছিল, কেনই বা হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে তিনি চলে গিয়েছিলেন। আর পার্চমেন্টটা নিয়ে এত ঢাক ঢাক গুড় গুড় কেন? পাণ্ডুলিপির শেষে যে অভিশাপের কথা বলা হয়েছে আসলে সেটা কী?

পিটারের মাথায় প্রশ্নগুলো কদিন বেশ কুট কুট করে কামড়ালেও ধীরে ধীরে এটার কথা ভুলে যায় সে, অনেকটাই দূর হয় ভয়। ভ্রমণের জন্য দুজনের ব্যস্ততা এত বেড়ে যায় যে অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করার সময় তাদের ছিল না। আসল জায়গায় পৌঁছার পর এলাকাটার নির্জনতা চারদিক থেকে চেপে বসে পিটারকে। আবার ফিরে আসে সেই ভয় এবং দুশ্চিন্তা। সার রোনাল্ড একবার তাকে মিসরীয়দের প্রেততত্ত্বের ওপর কিছু কথা বলেছিলেন, প্রধান ধর্মযাজকদের অনেক আশ্চর্য গল্প শুনেছে সে তার বাবার কাছে। এটা তাদের সেই জন্মস্থান। পিটারের দু'একজন বন্ধুর সবাই অভিশাপের ব্যাপারটি বিশ্বাস করত। এদের প্রত্যেকের মৃত্যু ঘটেছে অদ্ভুতভাবে। এ ছাড়াও রয়েছে তুতানখামেন এবং পট মন্দিরের রোমহর্ষক ঘটনা। গভীর রাতে, তারা জ্বলা আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে এ সব গল্প মনে করত। সামনে তার জন্য না জানি কী বিপদ ওত পেতে আছে ভেবে শিউরে উঠত। তারপর, মানচিত্রে চিহ্নিত নির্দিষ্ট জায়গায় সার রোনাল্ড তাঁবু বসালে নতুন আরেক অশুভ সঙ্কেতের সূচনা হয়।

আস্তানা গাড়ার প্রথম রাতেই সার রোনাল্ডকে তাঁবুর পেছনের দিকের

পাহাড়ে একা যেতে দেখে কৌতূহলী হয়ে ওঠে পিটার। বাবার হাতে রশি বাঁধা একটি সাদা ছাগল এবং মস্ত ধারাল ছুরি দেখে সন্দেহ আরও বেড়ে যায় তার। পিছু নেয় সে। তারপর ঘটে সেই ঘটনা। ছাগলটি জবাই করেন সার রোনাল্ড। অবোধ পশুটার ফিনকি ছোটা রক্ত মুহূর্তে শুষে নেয় শুকনো বালু। বাবার চোখে তখন কসাইদের উৎকট উল্লাস।

একটি ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে থেকে পিটার শোনে বাবা দুর্বোধ্য উচ্চারণে মিসরীয় স্তোত্র আউড়ে চলেছেন। পিটার ভয় পাচ্ছিল ভেবে বাবা তার উপস্থিতির কথা জেনে গেলে হয়তো আর তাকে সঙ্গে নিতে রাজি হবেন না। তবে বাবার আচরণে কেমন ক্ষ্যাপামো একটা ভাব তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়।

কিন্তু বাবার কাছে বলি বলি করেও সে জিজ্ঞেস করতে পারছিল না। পার্চমেন্টের সেই রহস্য নয়, গোপন 'অভিশাপ' নিয়ে।

মাঝরাতের ওই ঘটনার পর দিন সার রোনাল্ড চার্ট দেখে বলেন এখন খনন শুরু করা চলে। ম্যাপে চোখ রেখে, বালিতে প্রতিটি পা মেপে তিনি তাঁর লোকদের কাজ চালিয়ে যেতে বলেছেন। সন্ধ্যার দিকে দশ ফুট ব্যাসার্ধের বিরাট একটি গর্ত খোঁড়ার কাজ শেষ হয়ে যায়, যেন হাঁ করে আছে কোনও দানব মুখ। খনন পর্ব শেষ হতেই স্থানীয় শ্রমিকরা উল্লসিত চিৎকার দিয়ে জানায় গর্তের নীচে একটি দরজা দেখতে পেয়েছে তারা।

দুই

টেনশনের চোটে পিটারের অবস্থা কাহিল। বাবা ওকে নীচে নামতে বলেছেন। সামনে ভীষণ বিপদ, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে দিচ্ছে পিটারকে। কিন্তু বাবাকে যেতে নিষেধ করার সাহস তার নেই। যাব না কথাটি উচ্চারণ করতে পারেনি সে। কারণ তার ভয় এতে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে সার রোনাল্ড কোনও অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারেন। বিশ্রি, পেট গুলিয়ে ওঠা গর্তটার মধ্যে প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাবার সঙ্গে নেমে পড়ে পিটার।

পাণ্ডুলিপিতে বর্ণিত দরজাই ছিল ওটা। দরজার গায়ে, ঠিক মাঝখানে মিসরীয়দের সাত প্রধান দেবতার মাথার ছবি–অসিরিস, ইসিস, রা, বাস্ত, থথ, সেট এবং অ্যানুবিস। তবে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার সাতটা মাথার অধিকারী সাতজন নয়, একজন। আর ওটা কোনও মানুষের শরীরও ছিল না, ভয়াবহ এই আকৃতির সঙ্গে তুলনা করার মত উপমা বোধহয় মিসরীয় কোনও বইতেও নেই। অন্তত ওই মুহূর্তে পিটারের কিছু মনে পড়েনি।

সাত মাথার ভয়াল ভয়ঙ্কর জিনিসটা দেখামাত্র ভয়ে প্রায় জমে যাচ্ছিল পিটার, আতঙ্কের অক্টোপাস যেন চারপাশ থেকে ওকে তড়িৎ গতিতে চেপে ধরেছিল। সাত মাথার নীচের অংশটার যেন দ্রুত রূপান্তর ঘটছিল; মনে হচ্ছিল গলে যাচ্ছে। অবিশ্বাস্য এবং অদ্ভুত সব আকার ধারণ করছিল ওটা। কখনও ওটাকে মনে হয়েছে সর্পিণী মায়াবিনী মেডুসা, কখনও বিশাল, বিকট ভ্যাম্পায়ার ফুলের চেহারা ধারণ করেছে, ছড়িয়ে দিয়েছে বিরাট পাতা, যেন রক্ত-তৃষ্ণায় বাতাসে দুলছিল। তারপরই চোখের পলকে ওটা পরিণত হয়েছে একদলা চকচকে রুপালি খুলিতে। আবার পরক্ষণে রুপালি খুলির রূপান্তর ঘটেছে নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, অজস্র তারকা আর গ্রহসহ।

এ যেন এক দুঃস্বপ্ন। কোনও শিল্পীর পক্ষে এমন বীভৎস ছবি আঁকা সম্ভব নয়। একমাত্র শয়তানের পক্ষেই এ কাজ সম্ভব। সাত মাথার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রায় সম্মোহিত হয়ে পড়েছিল পিটার। বাস্তবে ফিরে আসে বাবার ডাক শুনে। সার রোনাল্ড সকালবেলাতেও কাঠখোট্টা ব্যবহার করলেও এখন তাঁর চেহারা আমূল বদলে গেছে। রীতিমত উৎসুক গলায় তিনি ঘোষণা করেন। 'এটাই সেই দরজা। এই দরজার কথাই পার্চমেন্টে লেখা আছে। এখন বুঝতে পারছি প্রিন তাঁর শয়তানের পূজা অধ্যায়ে কীসের কথা বলতে চেয়েছেন। ওই অংশে তিনি দরজায় প্রতীকের কথা উল্লেখ করেছেন। যাকগে, কাজ শেষ হবার পর আমরা এটার কয়েকটা ছবি তুলব। আশা করি ছবি নিয়ে নিরাপদেই ফিরতে পারব। স্থানীয়রা কোনও ঝামেলা করবে না।'

সার রোনাল্ডের কণ্ঠে খুব বেশি উৎসাহের সুর। ব্যাপারটা ভাল লাগল না পিটারের, বরং ভয় হলো। হঠাৎ মনে হলো সে তার বাবাকে খুব কম চেনে। বাপের সাম্প্রতিক গোপন কর্মকাণ্ড সম্পর্কেও সে কত কম জানে।

গতরাতেও সে তার বাবাকে দেখেছে একটা সমাধি থেকে বেরিয়ে আসতে, হাতে মরা বাদুড়। বাবাকে পাগল সন্ন্যাসীদের মত মনে হচ্ছিল। বাবা কি সত্যি এসব ছাইপাঁশ বিশ্বাস করেন!

'এখন!' বিজয় উল্লাস বৃদ্ধের কণ্ঠে। 'ছুরিটা নিয়েছি। পিছনে যাও।'

ভীত, বিস্মিত চোখে পিটার দেখল বাবা ছুরির ডগাটা সপ্তম মাথা অর্থাৎ অ্যানুবিসের নীচে গাঁথলেন। খরখর শব্দ হলো, তারপর কুকুরমুখো মাথাটা ধীরে ঘুরে যেতে লাগল, যেন গোপন কোনও হাতলের সাহায্যে। ঝনঝন শব্দে খুলে গেল দরজা, প্রতিধ্বনিটা অনেকক্ষণ রইল।

একটা তীব্র, ঝাঁঝাল গন্ধ নাকে বাড়ি খেল। গন্ধটা নাক সয়ে এলে সার রোনাল্ড দ্রুত পা রাখলেন ভেতরে। সঙ্গে পিটার। পাণ্ডুলিপির নির্দেশ অনুযায়ী গুনে গুনে তেত্রিশ পা এগোলেন। তারপর মুখোমুখি হলেন অ্যানুবিসের।

মশালের আলোয়, পিটারের মনে হলো...মূর্তিটার গায়ের রং পাল্টে

যাচ্ছে। ঠোঁটের হাসিটা হঠাৎই যেন অদৃশ্য হয়ে গেল, কঠিন হয়ে উঠল চেহারা, দুই ঠোঁটে ফুটল প্রবল নিষ্ঠুর ভাব। হাঁ করে অ্যানুবিসের এই পরিবর্তন দেখছে পিটার, চমক ভাঙল সার রোনাল্ডের ডাকে।

'শোন, খোকা, সেদিন রাতে পার্চমেন্টের সমস্ত কথা তোকে বলিনি। তোর নিশ্চয়ই মনে আছে একটা অংশ আমি মনে মনে পড়েছিলাম। হ্যাঁ, ওই অংশটা। তোকে জানতে না দেয়ার পেছনে অবশ্যই কারণ ছিল। কারণ পুরোটা জানলে তুই হয়তো ভুল বুঝে এখানে আসতে চাইতি না। তাই সব কথা বলার ঝুঁকিটা ও সময় নিতে চাইনি।

'তুই জানিস না, পিটার, এই মুহূর্তটি আমার কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। বহু বছর আমি এমন সব গোপন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছি যা অন্যের কাছে স্রেফ আজগুবি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যাপার ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিন্তু আমি এসব বিশ্বাস করতাম। প্রতিটি বিস্মৃত কর্মের পেছনে একটি নগ্ন সত্য থাকে; বিকৃত ঘটনাও বৈধতা পেয়ে বাস্তবতায় নতুন ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। আর এ ধরনের কোনও ঘটনার সন্ধানে আমি বহুদিন নিরলস কাজ করেছি–বিশ্বাস করতাম এরকম কোনও সমাধি যদি আবিষ্কার করতে পারি তা হলে গোটা বিশ্বকে প্রমাণ এবং যুক্তি দিয়ে বোঝাতে সমর্থ হব। এই মূর্তির মধ্যে সম্ভবত গোপন প্রেতপূজারীদের মমি রয়েছে। তবে তার জন্য আমি আসিনি। আমি এসেছি তাদের জ্ঞানের সন্ধানে। যে জ্ঞান তাদের সঙ্গে একই সময় কবর দেয়া হয়। এসেছি সেই প্যাপিরাসের পাণ্ডুলিপির খোঁজে যাতে আছে নিষিদ্ধ গোপন সব তথ্য–জ্ঞান, যার কথা পৃথিবীর মানুষ কখনও জানার সুযোগ পায়নি। জ্ঞান–এবং ক্ষমতা!

'ক্ষমতা! আমি ব্ল্যাক টেম্পলের কথা পড়েছি, পড়েছি সেই গভীর ধর্মবিশ্বাসের কথা যে ধর্মকে পরিচালনা করতেন পার্চমেন্টে উল্লিখিত প্রভুরা। তাঁরা জাদুটোনা করার মত সাধারণ সন্ন্যাসী ছিলেন না; তাঁরা এ ভূলোক ছেড়েও দ্যুলোকে বিচরণ করতেন। তাঁদের অভিশাপকে সবাই ভয় পেত, আশীর্বাদকে করত সম্মান। কেন? কারণ তাঁদের জ্ঞানভাণ্ডার অসীম ছিল বলে। বিশ্বাস কর পিটার, এই সমাধির মধ্যে আমরা যে গোপন তথ্যের খোঁজ পাব তা দিয়ে অর্ধেক পৃথিবীতে রাজত্ব করতে পারব। মৃত্যু-রশ্মি, তীব্র বিষ, প্রাচীন গ্রন্থ আর জাদুবিদ্যার সম্মিলিত শক্তি দিয়ে আবার অন্ধযুগের দেবতাদের পুনর্জন্ম ঘটাতে পারব। ভাব একবার ব্যাপারটা। এই ক্ষমতার অধিকারী যে কেউ গোটা দেশকে হাতের মুঠোয় পুরে রাখতে পারবে, পারবে শাসন করতে এবং তার শত্রুদের ধ্বংস করতেও সে এ জ্ঞান ব্যবহার করবে। তার থাকবে অজস্র ধনরত্ন, সম্পদের পাহাড়, বিলাস বৈভব, হাজার সিংহাসনের বিপুল সমারোহ!'

বাবা নির্ঘাত পাগল হয়ে গেছে, ভাবল পিটার। ঝেড়ে দৌড় দেয়ার

ইচ্ছে হলো। এই ভয়াল অন্ধকার জগৎ থেকে বেরিয়ে সুনীল আকাশ দেখার প্রচণ্ড তৃষ্ণা অনুভব করল সে, খাঁটি, তাজা হাওয়ায় বুক ভরে শ্বাস নেয়ার আকাঙ্ক্ষায় আইঢাই শুরু করল ফুসফুস। এই মৃত-শতাব্দীর ধুলাবালির কবল থেকে মুক্তি চায় সে। দৌড় দিয়েওছিল পিটার কিন্তু সার রোনাল্ড খপ করে ওর কাঁধ চেপে ধরলেন, টান দিয়ে ওকে ঘোরালেন তাঁর দিকে।

'তুই দেখছি আমার কথা কিছুই বুঝতে পারিসনি।' বললেন তিনি। 'ঘটে হলুদ পদার্থ থাকলে অবশ্য বুঝতি। যাকগে, তাতে কিছু যায় আসে না। আমি আমার মিশন সম্পর্কে নিশ্চিত। তুইও হবি। তবে আগে আমাকে প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে ফেলতে হবে। এখন তোকে পার্চমেন্টের সেই অংশটা, যেটা আমি পড়ে শোনাইনি, তাতে কী লেখা ছিল, বলব।' পিটারের মস্তিষ্কে যেন সতর্ক ঘণ্টি বেজে উঠল। কে যেন বলতে লাগল পালাও-পালাও! কিন্তু সার রোনাল্ড ওকে শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে আছেন। পালাবার উপায় নেই। তাঁর গলা কাঁপছে।

'যে অংশের কথা আমি বলছি তাতে লেখা ছিল কীভাবে এই মূর্তি পার হয়ে সমাধিতে ঢুকতে হবে। মূর্তির দিকে চেয়ে থেকে লাভ নেই, নতুন কিছু আবিষ্কার হবে না; আর এর মধ্যে গোপনীয়তা বলেও কিছু নেই, দেবতার এই শরীরে কোনও যন্ত্রাংশও নেই। মহাপ্রভু এবং তাঁর উপাসকরা এসব কাঁচা কাজ করতে যাননি। সমাধিতে ঢোকার রাস্তা একটাই-দেবতার শরীরের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে হবে।' অ্যানুবিসের মুখোশের মত ভয়ঙ্করদর্শন চেহারাটার দিকে আবার তাকাল পিটার। শেয়াল মুখটাতে ধূর্ততার ছাপ সুস্পষ্ট নাকি এ স্রেফ আলোছায়ার খেলা?

'কথাটা অদ্ভুত শোনালেও সত্যি।' বলে চলেছেন সার রোনাল্ড। 'তোর নিশ্চয়ই মনে আছে পার্চমেন্টে এই মূর্তিটিকে অন্য সবার থেকে আলাদা বলা হয়েছে? কিন্তু অ্যানুবিস কী করে পথপ্রদর্শক হলো আর এর গোপন আত্মার ব্যাপারটিই বা কী? পরের লাইনেই অবশ্য এ কথার জবাব আছে। মনে হয় মূর্তিটি একটি পিভট (Pivot)-এর ওপর ভর করে ঘুরতে পারে আর ওটার পেছনের একটা অংশ খুলে ফাঁকা হয়ে যায়। সংযোগ ঘটে সমাধির সঙ্গে। কিন্তু এটা তখনই সম্ভব হবে যখন মূর্তির মধ্যে জাগবে মনুষ্য সচেতনতা।'

আমরা আসলে সবাই পাগল, ভাবল পিটার। আমি, বাবা, প্রাচীন সন্ন্যাসীরা এমনকী এই মূর্তিটাও। সমস্ত অশুভ যেন এক গিঁটঠুতে বাঁধা। 'এর অর্থ একটাই। আমি দেবতার দিকে তাকিয়ে নিজেকে সম্মোহিত করব। ততক্ষণ পর্যন্ত সমাহিত থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার আত্মা এই মূর্তির শরীরে প্রবেশ করে এবং সমাধিস্তম্ভের প্রবেশদ্বার খুলে যায়।'

ভয়ের ঠাণ্ডা একটা স্রোত যেন জমিয়ে দিল পিটারকে।

'তবে এটাকে উদ্ভট কোনও চিন্তা ভেবে অবজ্ঞা করিস না। যোগীরা

বিশ্বাস করেন এভাবে অন্যের শরীরে প্রবেশ করা সম্ভব। আত্মসম্মোহন সব জাতির মধ্যেই স্বীকৃত একটি বিষয়। আর সম্মোহনবিদ্যা একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। হাজার বছরেরও আগে থেকে এই সত্যের চর্চা হয়ে আসছে। প্রাচীন সন্ন্যাসীরা সম্মোহনের ব্যাপারটি খুব ভাল জানতেন। আর আমিও এখন তাই করতে যাচ্ছি। নিজেকে সম্মোহন করব আমি এবং আমার আত্মা বা সচেতনতা মূর্তির মধ্যে ঢুকে যাবে। আর আমি তখনই শুধু সমাধিস্তম্ভ খুলতে পারব।'

'কিন্তু ওই অভিশাপ!' বিড়বিড় করে বলল পিটার। 'অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে ওতে কী বলা হয়েছে তুমি তো জানই–যারা বিশ্বাস করে না যে প্রভু অ্যানুবিস এই সমাধিস্তম্ভের পথপ্রদর্শকই শুধু নয়, রক্ষাকর্তাও বটে। এই অবিশ্বাসীদের ওপর অভিশাপ নেমে আসার কথাও তো বলা হয়েছে। তার কী হবে?'

'দূর দূর ওসব খেলো কথা।' সার রোনাল্ড দৃঢ় গলায় বললেন। 'সমাধি লুটেরাদের ভয় দেখাতে ওসব অভিশাপ-টভিশাপের কথা বলা হয়েছে। যা থাকুক কপালে ঝুঁকি আমি নেবই। তুই শুধু দেখ আমি কী করি। আমি যখন সম্মোহিত হয়ে পড়ব তখন মূর্তিটা নড়ে উঠবে এবং ওটার নীচের অংশটা খুলে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তুই ভেতরে ঢুকে যাবি। তারপর আমাকে জোরে ঝাঁকুনি দিলেই আমি আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসব।'

বাবার আদেশ অমান্য করতে পারল না পিটার। মশালটা উঁচু করে ধরল, আলো সরাসরি বিচ্ছুরিত হতে লাগল অ্যানুবিসের মুখের উপর। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল পিটার, দেখল বাবা শেয়াল দেবতার চোখে চোখ রেখেছেন। পাথুরে, ঠাণ্ডা দু'জোড়া চোখ

দৃশ্যটা ভয়ঙ্কর: দুজন মানুষ, বারো ফুট লম্বা এক দেবতা, মাটির নীচে এক অন্ধকার ঘরে পরস্পরের দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। সার রোনাল্ডের ঠোঁট নড়তে শুরু করল। প্রাচীন মিসরীয় স্তোত্র পাঠ করছেন। অ্যানুবিসের কপালে আলো জ্বলজ্বল করছে, সেদিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তিনি। আস্তে আস্তে তাঁর দৃষ্টি চকচকে হয়ে এল; চোখে পলক পড়ছে না, তারায় ফুটে উঠল অদ্ভুত এক নিষ্প্রাণ জ্যোতি। হঠাৎ তাঁর শরীর একদিকে নুয়ে পড়ল, যেন পৈশাচিকভাবে সমস্ত শক্তি কেড়ে নেয়া হয়েছে। আতঙ্কিত পিটার দেখল তার বাবার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে, তিনি হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলেন মেঝের ওপর। কিন্তু দেবতার চোখ থেকে একবারও দৃষ্টি ফেরালেন না। এভাবে কেটে গেল বেশ ক'টি মুহূর্ত। মশাল উঁচিয়ে রাখতে রাখতে পিটারের বাঁ হাতে ঝিঁঝি ধরে গেল।

পিটার কিছু ভাবতে পারছে না। তার বাবাকে এর আগেও বহুবার আত্মসম্মোহন করতে দেখেছে সে আয়না আর আলো নিয়ে। কিন্তু বন্ধ ঘরে

বিপদের কোনও আশঙ্কা ছিল না। আর এখানকার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাবা কি পারবেন মিসরীয় এই দেবতার শরীরে প্রবেশ করতে? যদি পারেনই তা হলে ওই অভিশাপ? প্রশ্ন দুটো বার বার আলোড়িত হতে থাকে পিটারের মনে। কিন্তু কোনও জবাব পায় না। হঠাৎ ব্যাপারটা লক্ষ করল সে। প্রচণ্ড ভয়ে যেন জমে গেল। ওর বাবার চোখে মরা মানুষের শেষ চাউনি, সচেতন ভাবটা সম্পূর্ণ উধাও। কিন্তু দেবতার চোখ–অ্যানুবিসের দৃষ্টি এখন আর নিষ্প্রাণ এবং পাথুরে নয়। ভয়ঙ্কর মূর্তিটা জেগে উঠেছে! ওর বাবা তা হলে ঠিকই বলেছিলেন। কাজটা করেছেন তিনি–সম্মোহনের মাধ্যমে নিজের সচেতনতাবোধ মূর্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়েছেন। কিন্তু এখন? এরপর কী ঘটবে? বাবা বলেছিলেন তাঁর আত্মা সরাসরি সমাধিস্তম্ভে প্রবেশের পথ খুলে দেবে। কই, সেরকম তো কিছুই ঘটছে না। কারণ কী?

শঙ্কিত এবং ভীত পিটার উবু হয়ে পরীক্ষা করল সার রোনাল্ডের শরীর, নিস্তেজ, নিষ্প্রাণ একটা শরীর। মারা গেছেন সার রোনাল্ড বার্টন। ঝট করে পিটারের মনে পড়ল পার্চমেন্টের সেই ভয়ঙ্কর সাবধানবাণী:

যারা বিশ্বাস করবে না তারা মরবে। প্রভু অ্যানুবিসকে পাশ কাটিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া হয়তো সম্ভব হবে, কিন্তু তিনি আর অনুপ্রবেশকারীকে বাইরের পৃথিবীতে ফেরত যেতে দেবেন না। মনে রেখ, অ্যানুবিস এক অদ্ভুত দেবতা যার মধ্যে রয়েছে এক গোপন আত্মা।

গোপন আত্মা! কেঁপে উঠল পিটার। মশালটা উঁচিয়ে ধরে সোজা শেয়াল দেবতার চোখের দিকে চাইল। অ্যানুবিসের ঠাণ্ডা পাথুরে চোখ দুটো জ্যান্ত!

পৈশাচিকভাবে জ্বলজ্বল করছে অশুভ দেবতার দুই চোখ। ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই যেন উন্মাদ হয়ে গেল পিটার। ওর মাথা শূন্য হয়ে গেছে। কিছুই ভাবতে পারছে না। তার মাথায় দড়াম দড়াম বাড়ি খাচ্ছে শুধু একটাই ব্যাপার–তার বাবা মারা গেছেন। আর এই মৃত্যুর জন্য দায়ী এই মূর্তিটা। যেভাবেই হোক বাবাকে হত্যা করে সে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বিকট চিৎকার দিয়ে সামনের দিকে ছুটে গেল পিটার বার্টন, দমাদম ঘুসি মারতে লাগল পাথরের মূর্তির বুকে। হাত ফেটে রক্ত বেরুতে শুরু করল, রক্তাক্ত মুঠিতে চেপে ধরল সে অ্যানুবিসের শীতল দুই পা, টানতে লাগল। যেন উল্টে ফেলবে। কিন্তু এক চুল নড়ল না দানব-মূর্তি। বিকট চোখে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। অশ্রাব্য গালিগালাজ শুরু করল পিটার। বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে ওকে। কী করছে নিজেও জানে না। মূর্তিটা যেন ওর দুর্দশা দেখে আনন্দ পাচ্ছে, ভেঙচি কাটছে। পাগলের মত ওটার গা বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল পিটার। থেকে থেকে ঝাঁকি খাচ্ছে ওর শরীর, ফোঁপাচ্ছে, বাবার কথা বলছে ফোঁপাতে ফোঁপাতে। চোখে খুনের নেশা। যেন ভেঙচি কাটা মুখটাকে ধ্বংস করে দেবে।

অ্যানুবিসের মাথার কাছে পৌঁছুতে কত সময় লেগেছে জানে না পিটার। হঠাৎ ওর সম্বিত ফিরে এল। লক্ষ করল মূর্তিটার ঘাড়ের কাছে চলে এসেছে। পা ঝুলছে মূর্তির পেটের কাছে। উন্মাদ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ভয়ঙ্কর এবং জ্যান্ত চোখ দুটোর দিকে।

হঠাৎ গোটা মুখটা যেন বেঁকে যেতে শুরু করল। ফাঁক হয়ে গেল পাথুরে ঠোঁট, বিশাল এক গহ্বরের সৃষ্টি হলো মুখে, নড়ে উঠল হাত। লম্বা, প্রসারিত হাত দুটোর আঙুলগুলো বাঁকানো, যেন ছোবল দেবে কালনাগিনী। বিদ্যুদ্বেগে হাত দুটো পিটারকে শক্ত, পাথুরে বুকের সঙ্গে মরণ আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলল, পরক্ষণে আঙুলগুলো চেপে বসল ওর গলায়। হাঁ করা মুখটা নেমে এল নীচে, ধারাল দাঁতে কামড় বসাল পিটারের ঘাড়ে। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা উষ্ণ রক্ত ভিজিয়ে দিল প্রতিহিংসায় উল্লসিত ত্রিশ হাজার বছরের পুরোনো অশুভ দেবতার মুখ।

পরদিন স্থানীয় লোকেরা পিটারের রক্তশূন্য, হাড়গোড় ভাঙা লাশটা আবিষ্কার করল অ্যানুবিসের পায়ের নীচে। সার রোনাল্ডের প্রাণহীন দেহটাও তার পাশে চিৎ হয়ে আছে। দেবতার অভিশাপের ভয়ে সমাধিতে ঢোকার সাহস কারও হলো না। বরং দরজা বন্ধ করে যে যার বাড়ি ফিরে গেল। তারা বলল বুড়ো এবং তরুণকে 'ইফেন্দি' হত্যা করেছে। আর এই মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল। কারণ দেবতা অ্যানুবিস অনুপ্রবেশকারীদের সহ্য করেন না।

সবাই চলে যাবার পর আবার কবরের নিস্তব্ধতা এবং অমাবস্যার কালো অন্ধকার নেমে এল পাতাল ঘরটিতে। স্থানীয়রা এখান থেকে চলে যাবার আগে দেখে গেছে অ্যানুবিসের নিষ্প্রাণ পাথুরে মূর্তির চোখে জীবনের কোনও আভাস নেই। কিন্তু মৃত্যুর আগে পিটার বার্টন যা জেনে গেছে তা কেউ জানতে পারেনি, কোনওদিন জানবেও না। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে পিটার দেখেছে অ্যানুবিসের পৈশাচিক পাথুরে চোখের জায়গায় ছলছল করছে ওর বাবার দুই চোখ!

রাক্ষুসে ক্ষুধা

দুটো চকচকে বাদামী ক্যাপসুল গিলে নিল মনরো। তাকাল আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে। হাসল। আজকাল আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে হাসতে পছন্দ করে মনরো। তার দাঁতগুলো এখন ধবধবে সাদা। দশ বছর বয়স থেকে প্রতি বছর তিন মাস দাঁতের ডাক্তারের চেম্বারে যাতায়াত তার নিত্য রুটিনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এখন তার দাঁতে কোনও সমস্যা নেই। সমান, মসৃণ, চৌকোনা দাঁতগুলো হিরের মত ঝকঝক করছে।

এক কদম পিছিয়ে এল মনরো, কনুই ঘষা খেল বাথরুমের বিদ্যুৎ-বাতির সুইচে। মাথার ওপরের বাতিটি নিভে গেল। তবে মনরো আঁধারেও দিব্যি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সবকিছু। ওর জীবনে এটা আরেকটা চমকপ্রদ ঘটনা; ওর আশ্চর্য নৈশ-দৃষ্টি। ক্যাপসুলগুলো খাওয়ার পর থেকে মনরোর জীবনে অভূতপূর্ব সব পরিবর্তন ঘটে চলেছে। সবচেয়ে পরিবর্তন এসেছে খাদ্যাভ্যাসে। যে মনরোর এক সময় খাবার দেখলেই গা গোলাত এখন তার খিদে বেড়ে গেছে বহুগুণ।

বোর্ডিং হাউজের ডাইনিং রুমে ঢুকল মনরো। তার টেবিলটা যথারীতি খালি অথচ মাসখানেক আগেও টেবিলটা খালি পেত না সে। আজকাল মনরো নিঃশব্দে খাওয়া সারে, তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে থাকা অন্য ভাড়াটেদের দৃষ্টি অগ্রাহ্য করেই, তারপর বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। ওর একটু এক্সারসাইজ করা দরকার। হ্যাটখানা মাথায় চাপিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল মনরো।

রাস্তায় নেমে বুক ভরে দম নিল ও। ঠাণ্ডা বাতাস ঝাপটা দিল পিঠে। হাঁটা ধরল মনরো। শহরের শেষ প্রান্তে আসার পরে শুরু করল দৌড়। বিরামহীন তিন ঘণ্টা দৌড়াল সে। সামান্য ক্লান্ত বোধ করছে। এবার বাড়ির ফিরতি পথ ধরল মনরো। রাস্তার পাশে একটি লাঞ্চবার-এ আটকে গেল নজর। কাউন্টারের সামনে রাখা একটি টুলে বসে পড়ল সে। আরেকটা টুলে পড়ে থাকা খবরের কাগজটা তুলে নিল। পড়তে লাগল। মনোযোগে ছেদ পড়ল কাউন্টারম্যানের কণ্ঠে:

'শুনুন, মিস্টার, আমি জানি না আপনি কে বা কী, তবে আপনি যে-ই হোন, এখান থেকে উঠে পড়ুন। পনেরো মিনিট আগে শর্টসার্কিট হয়ে বিদ্যুৎ চলে গেছে। অথচ অন্ধকারে বসে আপনি কিনা পেপার পড়ছেন! কোটেন

তো, মিয়া!'

কাঁধ ঝাঁকাল মনরো, চলে এল ওখান থেকে। আবার হাঁটতে লাগল রাতের বেলা এই হাঁটাহাঁটি নতুন কিছু নয়। কিছুদিন আগে, যখন ও ছিল নিতান্তই রোগা-পটকা, বেঁটে, খুদে একটা মানুষ–তখনও সান্ধ্যভ্রমণ করত মনরো। হাঁটত যাতে ক্লান্ত হয়ে ঘুম আসে।

আর হাঁটাহাঁটি করতে গিয়েই লোকটার সঙ্গে ওর পরিচয়।

বসন্তের শেষের দিকের এক রাতের ঘটনা ছিল ওটা। মনরো হাঁটতে হাঁটতে অচেনা একটি রাস্তায় চলে এসেছে, এমন সময় ধোঁয়া চোখে পড়ল ওর। একটি বাড়ির সামান্য খোলা একটি দরজা দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ফায়ার ড্রিলের ট্রেনিং নেয়া মনরোর চোখ প্রথমেই রাস্তায় ফায়ার অ্যালার্ম বক্স খুঁজল। তারপর পুলিশের সন্ধান করল। এরপর পথচারীর খোঁজ করল। কিন্তু কিছু বা কাউকে চোখে পড়ল না। বুক ভরে শ্বাস নিল মনরো, দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল ঘরে। বাড়িতে একটিই মাত্র ঘর। আর ধোঁয়ার পাতলা একটি রেখা উঠছে এই ঘর থেকেই। ঘরের মাঝখানে তিন ঠেঙা টেবিলের ওপর রাখা পিতলের একটি পাত্র থেকে ধোঁয়ার উৎপত্তি। ধোঁয়ার সামনে, মনরোর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষুদ্রকায়, বাঁকা পায়ের একটি মানুষ। তার পরনের আলখেল্লার নীচের অংশ মাটিতে লুটোচ্ছে। বেঁটে লোকটি মনরোর দিকে ফিরে তাকালও না, ইশারায় দেয়ালে ঠেস দেয়া কাউচে বসতে বলল।

কাউচের কিনারায় বসল মনরো। পিতলের পাত্র থেকে লকলকে অগ্নিশিখা জ্বলে উঠে মাঝে মাঝে আলোকিত করে তুলছে ঘর। ক্ষুদ্রকায় মানুষটির আলখেল্লার সোনার কাজ করা কারুকাজ ঝলমল করে উঠছে। আলখেল্লায় চাঁদ, ছাগলসহ অচেনা ছোট ছোট কিছু জন্তুর ছবি। বেঁটে মানুষটি ঘুরল:

'তুমি এসেছ বলে আমি খুশি হয়েছি। খুবই খুশি। ভেবেছিলাম কেউই বুঝি আসবে না।'

মনরো হাঁ করে তাকিয়ে থাকল লোকটির দিকে।

লোকটি হাত ঝাড়া দিতেই তার হাতে যেন ভোজবাজির মত উদয় হলো একটি ছোট প্যাডের কাগজ এবং পেন্সিল। সে পেন্সিলে কী যেন লিখল। তারপর বলল, 'ভিটামিন বি। নার্ভের জন্য খুবই চমৎকার। তোমার কী কী সমস্যা আমাকে বলো।'

মনরো একটু ভেবে নিল। সে তার সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলতে ভালবাসে।

'আমার খিদে বলে কিছু নেই,' বলল সে। 'রাতে আমার ঘুম আসে না।

আমার দাঁতের অবস্থা জঘন্য। ছেলেবেলায় একবার রিকেট হয়েছিল আমার। তারপর থেকে শরীরের হাড়গোড় তুলোর মত নরম–'

'বেশ,' হাতে হাত ঘষল ক্ষুদ্রকায় মানুষটি। 'তোমার লাগবে পুরো ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, সেই সঙ্গে অন্যান্য ভিটামিনেরও প্রয়োজন হবে। শুধুই ভিটামিন। কোনও তন্ত্রমন্ত্রের দরকার নেই। এখন ওং বং চং মন্ত্রের যুগ ফুরিয়েছে। ভিটামিন ক্যাপসুল খেলেই সমস্ত রোগ সেরে যাবে। আর সবগুলোই খেতে হবে। ভাগ্যিস, নিয়তি আমার কাছে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে!'

ছোট্ট হাতটি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল প্যাড, সেখানে উদয় হলো গাঢ় বাদামী রঙের একটি বোতল। বোতলটি মনরোর দিকে এগিয়ে দিল সে। মনরোকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল।

'এটা নাও,' হাসছে ক্ষুদ্র মানুষ। 'ওষুধের দোকানে কোটি টাকা দিলেও এ জিনিস মিলবে না। অত্যন্ত উঁচুমানের ওষুধ এগুলো। মাইগড, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কী দারুণ একটা ওষুধ তোমাকে দিচ্ছি। নাও। পয়সা দিতে হবে না। আমার তরফ থেকে তোমার জন্য এটা উপহার। তবে তোমাকে একেবারে শুধু শুধু দিচ্ছি না। একটা বিষয় প্রমাণ করা দরকার আমার। তোমাকে দিয়ে সে বিষয়টি প্রমাণ করতে চাই। ক্যাপসুল ফুরিয়ে গেলে আবার এসো। মাগনা দিয়ে দেব।'

মনরোর হাতে বাদামী বোতল। তাকে হতবুদ্ধি লাগছে। রাস্তায় একা দাঁড়িয়ে আছে ও। অথচ একটু আগেও একটি ঘরে ছিল মনরো। ধোঁয়া উড়তে দেখেছে। কিন্তু সত্যি কি ধোঁয়া দেখেছে ও? কুয়াশা পাক খাচ্ছে রাস্তায়। কুয়াশাকে ধোঁয়া ভাবেনি তো? আর বাড়িটাই বা গেল কোথায়? পুরোটাই যদি ওর অনুর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা হয়ে থাকে তা হলে হাতে ক্যাপসুলের এ বোতল এল কোত্থেকে? শ্রাগ করল মনরো, ঘুরল, বোতল নিয়ে ফিরে এল বোর্ডিং হাউজে।

নিজের ঘরে ঢুকল মনরো, মুঠোয় শক্ত করে ধরা বাদামী বোতল। সাবধানে আটকে দিল দরজা। কাপড় খুলতে লাগল। শার্ট খুলতেই শীতল বাতাস ঝাপটা দিয়ে গেল ওকে। নাকের ভেতরটা সুড়সুড় করে উঠল। হ্যাঁ-আ আ চো! হাঁচি দিল মনরো। হাঁচির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল মাথা ব্যথা। বোতলের দিকে তাকাল মনরো। বোতলের গায়ে একটি লেবেল লাগানো। লেবেলে লেখা: **এখুনি দুটো ক্যাপসুল খেয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ো।**

বোতলের ক্যাপ খুলল মনরো, তালুতে ফেলল দুটো চকচকে ছোট ক্যাপসুল। এক ঢোক পানি দিয়ে পেটে চালান করে দিল ক্যাপসুল জোড়া, তারপর শুয়ে পড়ল বিছানায়। শুয়ে শুয়ে কল্পনা করল পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা

তার হাতে চলে এসেছে এবং সে ইচ্ছে করলেই যে কাউকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে মেরে ফেলতে পারছে এবং মেরিলিন মনরোর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে। গত রাতটাও যার প্রায় বিনিদ্র কেটেছে, সেই মনরো আজ বালিশে মাথা ঠেকানোর এক মিনিটের মধ্যে তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

পরদিন সকাল আটটায় ঘুম ভাঙল মনরোর। সাধারণত ঘুম ভাঙার পরই তার মেজাজ খারাপ হয়ে যায় সর্দিতে বোজা নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে পারে না বলে। তবে আজ কী আশ্চর্য! নিঃশ্বাস নিতে মোটেই কষ্ট হচ্ছে না তার। নাকে একটুও সর্দি নেই! মাথাটাও ঝিমঝিম করছে না। ড্রেসারের ওপরে রাখা বোতলে চোখ চলে গেল মনরোর। লেবেলটা আছে এখনও। তবে নতুন লেখা ফুটে আছে ওতে: **দেখলে তো? আরও ক্যাপসুল প্রয়োজন হবার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করো।**

বোতলটি উল্টেপাল্টে দেখল মনরো। বোতলের গায়ে কোথাও নির্মাতা বা প্রতিষ্ঠান কিংবা এতে কী ধরনের ওষুধ আছে তা সম্পর্কে কিছুই লেখা নেই।

গোসল সেরে নিল মনরো। কাপড় পরে নেমে এল নীচে, ডাইনিংরুমে নাস্তা খেতে। নাস্তায় সে শুধু দুটো শুকনো আলু বোখারা খায়। আর কিছু না। আলু বোখারা দুটো দ্রুত সাবাড় করে ফেলল মনরো। এমন সময় প্লেটে গরম বিস্কিট নিয়ে হাজির হলেন বাড়িউলি মিসেস হেঞ্চ। একটু ইতস্তত করে বাড়িউলির কাছে বিস্কিট খেতে চাইল মনরো।

'কেন, মি. ফিদারস্টোনহাগ,' বললেন মিসেস হেঞ্চ, 'বিস্কিট আপনার পেটে যে সহ্য হবে না তা তো জানেনই। জেনেশুনে বিষ পান করতে চাইছেন যে!'

'মিসেস হেঞ্চ,' গলায় গাম্ভীর্য ফোটাল মনরো, 'সারা দিন যে মানুষটিকে কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় তার শুধু দুটো শুকনো আলুবোখারা খেলে চলে না।' সে পরপর দুটো বিস্কিট খেল। তারপর একে একে পেটে চালান করল আপেল, কলা এবং এক জোড়া বেকন।

দিনটি কেটে যেতে লাগল দ্রুত। বেশ চমৎকার একটি দিন। জর্ডান অপটিকাল কোম্পানির প্রেসিডেন্ট মি. জর্ডান মনরোর কাজের গতির বেশ প্রশংসা করলেন। সে অত্যন্ত দ্রুত তৈরি করে ফেলল বুক কীপিং শিট। মনরো লক্ষ করল মি. জর্ডানের সেক্রেটারি গ্লোরিয়া রিংগল, যে কিনা মনরোর দিকে ভুলেও তাকায় না, আজ বেশ কয়েকবার তাকে ফিরে দেখল।

ওই রাতে ঘুমাবার আগে বোতলের লেবেল পড়ল মনরো। লেবেলে লেখা: **তুমি কি ক্লান্ত এবং তোমার কর্মক্ষমতা কি হ্রাস পেয়েছে? অন্যরা যখন সেরা চাকরি এবং সুন্দরী মেয়েগুলোকে বগলদাবা করে নিয়ে যাচ্ছে তুমি কি**

তখনও বোকার মত মাটিতে পায়ের নখ খুঁড়ছ? তোমাকে আর হতাশ হতে হবে না, মনরো। যাও। এখুনি দুটো ক্যাপসুল খেয়ে ফেলো।

মনরো দুটো ক্যাপসুল গিলল।

সকাল। রোদ চমকাচ্ছে সূর্য। মনরো লাফ মেরে নামল বিছানা থেকে। হাত পা টান টান করে ভরাট গলায় গান ধরল। শেভ করার সময় লক্ষ করল তার দাড়ি আগের চেয়ে ঘন হয়ে উঠেছে। ত্বকের রঙে সোনালি ছাপ। আর তার চোখ–আহ্! কী অন্তর্ভেদী চাউনি চোখে। সে কোথায় যেন পড়েছে ড্রাইভাররা কাঁচা গাজর খায় যাতে রাতের অন্ধকারে গাড়ি চালাতে সমস্যা না হয়। কাল রাতে মনরো লক্ষ করেছে সে অন্ধকারেও খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের বড় বড় লেখাগুলো পড়তে পারছে। সত্যি, দিন দিন দারুণ উন্নতি হচ্ছে মনরো ফিদারস্টোনহাগের।

সে নাস্তা সারল পাঁচটি বিস্কিট এবং তিনটি ডিম দিয়ে। লক্ষ করল কৌতূহল নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন মিসেস হেঞ্চ।

অফিসে মনরো অ্যাকাউন্টিং চার্টের কাজ সারল অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। সাড়ে দশটা নাগাদ আবার খিদে পেয়ে গেল ওর। লাঞ্চ কাউন্টারে গিয়ে বসল এক গ্লাস দুধ খেতে। পাশের টুলটা দখল করল গ্লোরিয়া রিংগল। মিস রিংগলকে মনে মনে ভালবাসে মনরো। যদিও সাহস করে কথাটা প্রকাশ করা হয়নি।

মনরো মিস রিংগলের দিকে হাসি মুখে ফিরল। 'গ্লোরিয়া,' প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল সে, 'আজ রাতে আমার সঙ্গে ডিনার করবে?'

'কেন নয়, মি. ফিদারস্টোনহাগ,' হাসি ফিরিয়ে দিল সুন্দরী গ্লোরিয়া। 'আপনার সঙ্গে ডিনার আমি উপভোগ করব। বলুন কোথায় যাবেন?'

মনরো তিনটার সময় বেরুল অফিস থেকে। বাড়ি গিয়ে দেখবে বোতলের লেবেলে কী নির্দেশ আছে। মনরো দেখল ওতে লেখা: **ওহ্, বয়, গ্লোরিয়ার সঙ্গে ডেট। তিনটে ক্যাপসুল খাও।**

সন্ধেটা কাটল চমৎকার। মনরো এবং গ্লোরিয়ার যেন জন্মই হয়েছে একে অন্যের জন্য। ওদের রুচিবোধে কী অপূর্ব মিল! ওরা একই বিষয় নিয়ে হেসে কুটিপাটি হলো, অফিসের লোকজন সম্পর্কে দু'জনের ধারণায় কোনও ব্যবধান নেই, দু'জনেরই অপারেশন করে ফেলে দেয়া হয়েছে টনসিল। গ্লোরিয়া ক্ষুধার্ত মানুষ পছন্দ করে: আর মনরো তার খিদে মেটানোর জন্য সর্বোত্তম পুরুষ।

কিন্তু আজ রাতে উদ্বেগ বোধ করছে মনরো। লাঞ্চ ওয়াগনের লোকটার ঝাড়িতে মেজাজ বিগড়ে যায়নি ওর, বরং ভয় লাগছে। সবাই জানে ভিটামিন A চোখের দৃষ্টি বৃদ্ধি করে। কিন্তু সবকিছুরই একটা সীমা আছে। মনরো

অন্ধকারে হাঁটছে। রাস্তার নুড়ি পাথরে লাথি কষাচ্ছে। নুড়ি পাথর, কাগজের টুকরো ছোটখাট এ সব জিনিস আঁধারেও আশ্চর্য পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। হঠাৎ ওর চোখের সামনে ধোঁয়া উড়তে লাগল। তারপর হাজির হয়ে গেল হুড়কোবিহীন একটি দরজা। খুলে গেল কপাট। ক্ষুদ্রকায় একটি মানুষের পরিচিত শারীরিক কাঠামো ফুটে উঠল। পিতলের একটি পাত্রের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। পাত্রের নীচে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে।

সরাসরি কাজের কথায় চলে এল মনরো। 'দেখুন মি. ...আ...আমি চাই না আপনি আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাবুন। আমি জানি আপনি আপনার ইয়ে নিয়ে খুব ব্যস্ত আছেন...তবে হলো কী...'

'আমি মোটেই ব্যস্ত নই,' স্ফূর্তির গলায় বলল বেঁটে লোকটি। 'তোমাকে সানন্দে সাহায্য করব। দেখতেই পাচ্ছ এটা একটা অসাধারণ নতুন প্রজেক্ট। জাদুবিদ্যায় রীতিমত বিপ্লব ঘটাতে চলেছি আমরা। গত পঞ্চাশ মিলিয়ন বছরেও ওরা কিছুই শিখতে পারেনি। এখনও থোড়-বড়ি-খাড়া এবং খাড়া-বড়ি-থোড় টাইপের ম্যাজিকের জগতে পড়ে আছে। নাহ্, আমাদের সংস্কার-সাধন করতেই হবে। আর ভিটামিন দিয়ে আমি আমার গবেষণা শুরু করেছি। A ভিটামিন দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির জন্য, B ভিটামিন নার্ভের শক্তি বাড়ায়, সি ভিটামিন ব্যবহারে সেরে যায় দাঁতের সমস্ত ক্ষত, D ভিটামিন মজবুত করে তোলে শরীরের হাড়—আর বাকিগুলোর কথা তো তুমি জানই। তুমি ভিটামিন নিতে এসেছ, নিয়ে যাও। একদিন বিশ্বের প্রতিটি স্কুল ছাত্র তোমাকে ভিটামিনের জাদুর অগ্রদূত হিসেবে জানবে।'

'কিন্তু দেখুন,' মরিয়া গলায় বলল মনরো, 'আমি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি দেখতে পাচ্ছি। যে কারণে লোকজনের চোখে পড়ে যাচ্ছি। অন্ধকারেও সবকিছু দেখার খায়েশ আমার নেই। জাদুকর হওয়ার কোনও ইচ্ছেও আমার নেই। ভিটামিন A-টা আমার ওষুধের তালিকা থেকে বাদ দেয়া যায় না?'

মনরোর মনে হলো লোকটা যেন রাগে তার খুদে মুঠো পাকিয়েছে। 'সেক্ষেত্রে,' বলল বামন জাদুকর, 'আমি ভিটামিন A বাদ দিয়ে অন্য ভিটামিনগুলোর ডোজ বাড়িয়ে দিচ্ছি। তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। নতুন প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ খাও'—আবার শূন্য থেকে উদয় হলো বোতল, '—এবং সুখি মানুষ হও।'

আবার রাস্তায় একা মনরো। ডানে-বামে তাকাল। খুদে মানুষ কিংবা বাড়ি কিছুই চোখে পড়ল না। ঘন হয়ে উঠছে কুয়াশা। মনরো দ্রুত পা চালাল। নিজের আস্তানায় ফিরে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওপরে, ঢুকল ঘরে। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। তবে তার আগে দুটো ক্যাপসুল খেয়ে নিতে ভুলল না।

ওই হপ্তার শেষের দিকে, ভিটামিন পিলের নিয়মিত ডায়েট চালিয়ে যাওয়ার পরে, মনরো সিদ্ধান্ত নিল গ্লোরিয়ার সঙ্গে তার এনগেজমেন্ট দ্রুত সেরে ফেলা দরকার। গ্লোরিয়া লোকজনকে বলে বেড়াতে লাগল প্রথম প্রথম মনরোকে সে পাত্তা না দিলেও আজকাল সে মনরো ছাড়া কিছুই বোঝে না। মনরোর সবকিছুই তার ভাল লাগে। তার আচার আচরণ, খিদে...সবকিছু।

শুক্রবারটা শুরু হলো বাজে ভাবে। মিসেস হেঞ্চ মনরোকে পরিষ্কার বলে দিলেন মনরো তাঁকে যে ভাড়া দেয় তা দিয়ে তার রাক্ষুসে ক্ষুধা মেটানো সম্ভব নয়। মনরোর জন্য খাবার কিনতে কিনতে তিনি নাকি ফতুর হয়ে যাচ্ছেন। হয় মনরোকে ভাড়া বাড়িয়ে দিতে হবে নতুবা ছাড়তে হবে ঘর।

মনরো আশ্বাস দিল ব্যাপারটি ভেবে দেখবে।

সেদিন বিকেলে প্রচণ্ড খিদে পেতে লাগল মনরোর। সে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর লাঞ্চ কাউন্টারে গেল। গ্লোরিয়া তার দিকে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আছে দেখেও না দেখার ভান করল। এমন খিদে জীবনেও লাগেনি তার।

সন্ধ্যাবেলা একটি রেস্টুরেন্টে ঢুকল মনরো পেটে খিদের আগুন নিয়ে। রেস্টুরেন্টের প্রায় সমস্ত খাবার সে একাই সাবাড় করল। গ্লোরিয়ার অন্ধকার মুখে আরও আঁধার ঘনাল। সে মনরোকে নিয়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরল। তবে পথে প্রেমিকের সঙ্গে একটি কথাও বলল না। ঘরে ঢুকেই কিচেনে ছুটল মনরো। চোখের পলকে এক বাক্স বিস্কিট শেষ করল সে, গিলল এক বোতল কেচাপ–কিন্তু এখনও অতৃপ্ত মনরো ফিরে এল লিভিংরুমে।

অপূর্ব সুন্দর একটি নীল পোশাক পরে আধশোয়া অবস্থায় কাউচে বসে আছে গ্লোরিয়া। খুবই সুন্দর লাগছে ওকে। এত সুন্দর, যে কেউ ওকে দেখলে খিদের কথা ভুলে যাবে। গ্লোরিয়ার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাল মনরো।

'ডার্লিং,' বলল সে, 'তোমার ঠোঁট যেন পাকা টসটসে লাল বেরী। তোমার গায়ের ত্বক পীচ ফলের মত জ্বলজ্বল করছে। তোমার দুধ সাদা ঘাড় আমাকে মাখনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে–'

আর বলতে পারল না মনরো।

'খুবই দুঃখজনক ঘটনা,' এ নিয়ে কমপক্ষে একশোবার কথাটা পুনরাবৃত্তি করলেন মিসেস হেঞ্চ। 'ছেলেটা দিলে বড় চোট পেয়েছে। মেয়েটা চলে যাওয়ার পর থেকে ছেলেটা বেদনায় শুকিয়ে যাচ্ছে। এরকম অবস্থা কখনও ছিল না ওর। সবকিছুর প্রতিই সে যেন আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। এমনকী

এখন ওষুধও খাচ্ছে না। যদিও ওষুধ খেয়ে ওর উপকারই হচ্ছিল। মনরো সমস্ত ওষুধ ফেলে দিয়েছে জানালা দিয়ে। আবার আগের মত না খাওয়া রোগে ধরেছে ওকে।'

'ওরা মেয়েটার কোনই খোঁজ পায়নি? মেয়েটা কি কারও সঙ্গে ভেগে গেল, নাকি এমনি এমনি অদৃশ্য হয়ে গেল?'

'কেউ ওর খোঁজ পায়নি,' বললেন মিসেস হেঞ্চ, জিভ বের করে ঠোঁট চাটলেন, চেহারা করুণ করে ডানে-বামে মাথা নাড়লেন। 'সে স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছে।'

ফোবিয়া

একেকজন মানুষের একেক রকম ফোবিয়া থাকে—এ এমন এক অস্বাভাবিক ভয় যার ওপর লোকের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। কেউ মাকড়সা দেখলে অজ্ঞান হয়ে যায় ভয়ে, কারও রয়েছে তেলাপোকা ভীতি। তবে ইলেন ইঁদুর দেখলেই ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। আর ইঁদুর নিয়ে সে রাতে ওর জীবনে যে ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটল...

ছোট রেস্টুরেন্ট থেকে ডিনার খেয়ে বেরুতে বেরুতে রাত আটটা বেজে গেল। রেস্টুরেন্টটি বড় পার্কটির এক কোণে। গরমের রাত। ইলেন সিদ্ধান্ত নিল হেঁটেই বাড়ি ফিরবে। ওর বাসা বেশি দূরে নয়, পার্ক থেকে মাত্র কয়েকশো গজ।

ইলেন ঢুকে পড়ল পার্কে। মাথার ওপর ডালপালা নিয়ে ঝুঁকে আছে গাছ। রাস্তাটা নির্জন এবং একটু যেন বেশিই অন্ধকার। গা কেমন ছমছম করে ওঠে ইলেনের। কদম দ্রুত হলো ওর। এ পার্ক নিয়ে নানা অদ্ভুতুড়ে গল্প শুনেছে ইলেন। যদিও বিশ্বাস করেনি সেসব কাহিনি।

অন্ধকার রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে খোলা একটা জায়গায় চলে এল ইলেন। আধখানা চাঁদ উঠেছে আকাশে। এদিকটাতে অল্প জোছনা। চলার গতি কমিয়ে দিল সে, যদিও মন থেকে অস্বস্তিভাবটা দূর হচ্ছে না।

পার্কের মাঝখানে বড়সড় একটি লেক। যে রাস্তা ধরে হাঁটছে ইলেন, ওটা সোজা লেকের দিকে চলে গেছে। এ রাস্তার মাথায় আরেকটা পথ দেখতে পেল ইলেন। ওখানে কেউ নেই। পেছন ফিরে তাকাল ও, ভাবছে ফিরতি পথ ধরবে কিনা। কিন্তু ও পার্কের মাঝামাঝিতে চলে এসেছে। এখন আবার ফিরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।

রাস্তায় পাতার খসখস ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। বাতাসে দুলছে ডাল, খসখস শব্দ তুলছে পাতায়। ব্যস্ত শহরের দূরের কোলাহল পার্কের নীরবতা ভঙ্গ করতে পারেনি। ইলেন হাঁটছে, রাতের বাতাসে পাতার ফিসফিসানি। মনে হচ্ছে ও যেন সভ্যতা থেকে হাজার মাইল দূরে। হঠাৎ আরেকটা শব্দে খাড়া হয়ে গেল কান। পাতা বা অন্য কিছুর শব্দ নয়, ভিন্ন একটা আওয়াজ। পায়ের শব্দ। আমারই পায়ের শব্দ, নিজেকে বোঝাতে চাইল ইলেন।

না, সিমেন্টের রাস্তায় যে শব্দটা উঠেছে ওটা ইলেনের পায়ের আওয়াজ

নয়। অন্য কারও পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে। ভয় ঢুকে গেল ইলেনের মনে। ধড়াশ ধড়াশ লাফাতে লাগল কলজে। চলার গতি বেড়ে গেল।

ইলেনের ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কারণ পেছনের পায়ের শব্দটা হচ্ছে ওর পা ফেলার শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। ইলেন জোরে হাঁটলে পেছনের জনও জোরে হাঁটছে।

ঝেড়ে দৌড় দেয়ার ইচ্ছেটা বহু কষ্টে দমন করল ইলেন। ওর পেছনে যে-ই থাকুক, তাকে বুঝতে দেয়া যাবে না ও ভয় পেয়েছে। ইচ্ছে করে হাঁটার গতি মন্থর করল ইলেন। কিন্তু অনুসরণকারী মোটেই গতি কমাল না। দ্রুত হয়ে উঠল তার পদ-শব্দ।

নিজের ওপর আর নিয়ন্ত্রণ রইল না ইলেনের। দৌড় দিল ও। ছুটতে লাগল রাস্তা ধরে। কয়েক সেকেন্ড পেছনে কোনও শব্দ পেল না ইলেন। তারপর, ওর হৃৎপিণ্ডের দিড়িম দিড়িম ঢাকের শব্দ ছাড়িয়ে পেভমেন্ট ভেসে এল দ্রুত এবং ছন্দবদ্ধ ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ।

লেক সোজা যে রাস্তাটি চলে গেছে, ওটাতে উঠে এল ইলেন। অনেকেই পার্কে হাওয়া খেতে এসে লেকের ধারে বসে থাকে। ইলেন আশা করল এমন কাউকে দেখতে পাবে। ছোট একটি টিলা বেয়ে নেমে লেক অভিমুখে ছুটল ও। মোড় ঘুরল। দপ করে নিভে গেল আশার আলো। লেকের রাস্তায় জন-মানুষের চিহ্নমাত্র নেই। ইলেন টের পেল টিলা বেয়ে নেমে আসছে তার অনুসরণকারী। পায়ের শব্দ হচ্ছে। থপ থপ থপ থপ। ওকে এই ধরল বলে!

উন্মাদের মতোঁ চারপাশে চোখ বুলাল ইলেন। বামে বেশ ঘন ঝোপ আর কতগুলো গাছ দেখতে পেল। ছুটে গেল ওদিকে, চট করে লুকিয়ে পড়ল ঝোপের আড়ালে।

এদিকে গাছপালার সারি। ঘন বলে চাঁদের আলোর অবাধ প্রবেশের সুযোগ নেই। ডাল আর পাতার আবরণী ভেদ করে যেটুকু আলো প্রকৃতির বুকে পৌঁছেছে তাতে অন্ধকার দূর হয়েছে সামান্যই। ইলেন প্রথমে পায়ের শব্দ শুনতে পেল তারপর দেখতে পেল পায়ের মালিককে।

লোকটা ইলেনের লুকানো জায়গা থেকে কুড়ি ফুট দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ইলেনের দিকে পেছন ফেরা। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর পা বাড়াল লেকের ধারের বেঞ্চিতে। বসল।

ঝোপের আড়ালে বসে ঘেমে ভিজে একাকার ইলেন। ওর এখানে লুকিয়ে পড়া মোটেই উচিত হয়নি। লোকটা নিশ্চয় টের পেয়েছে ও কোথায় লুকিয়েছে। লোকটা কি অপেক্ষা করছে কখন ইলেনের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবে এবং ও আড়াল ছেড়ে উঠে দাঁড়াবে? অবশ্য ইলেনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে পার্কের ভ্রমণকারীরা হাঁটতে হাঁটতে এদিকে চলে আসতে পারে। ও তখন লাফ মেরে বেরিয়ে আসবে ঝোপের আড়াল থেকে, লোকের ভিড়ে

মিশে গিয়ে বেরিয়ে পড়বে পার্ক থেকে।

বেঞ্চিতে বসা লোকটার দিকে আবার তাকাল ইলেন। সে চুপচাপ বসেই আছে, স্থির দৃষ্টি লেকে। হঠাৎ কী যেন একটা নজর কাড়ল ইলেনের। পানির ধারে কীসের একটা ছায়া, এগিয়ে আসছে। বিরতি দিল। এবারে ওটাকে পরিষ্কার দেখতে পেল ইলেন। বড় একটা ইঁদুর। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় লাফ মেরে উঠতে গেল ইলেন–নিজেকে দমন করল বেঞ্চির লোকটার কথা ভেবে। গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাওয়া চিৎকারটাকেও একই সঙ্গে গলা টিপে মারল।

যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে ইলেন, বড়টার সঙ্গে আরও তিনটে ইঁদুর যোগ দিল। চাঁদের আলোয় ওদের বিকট ছায়া এবং কুৎসিত মুখগুলো দেখতে পাচ্ছে ইলেন। সিমেন্টের রাস্তায় প্রাণীগুলোর থাবার আওয়াজ উঠল। গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিতে ইচ্ছে করল ইলেনের, মন চাইল ছুট দেয়। কিন্তু বেঞ্চিতে বসা লোকটার ভয়ে কিছুই করতে পারল না।

লোকটা পাথরের মূর্তি হয়ে বসে আছে বেঞ্চে, ইঁদুরগুলো তার কাছ থেকে তিন হাত দূরেও নেই। ওগুলোকে নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছে সে, ভাবল ইলেন। কিন্তু তার মাঝে কোনও ভাবান্তর নেই। কেমন লোক এ?

ইঁদুরের দিকে চোখ ফেরাল ইলেন। ওরা যেন সম্মোহন করেছে ওকে। ঝোপে, দুই ফুট দূরে খসখস একটা শব্দ হলো। চিৎকার বন্ধ করার জন্য মুখে সোয়েটার চেপে ধরল ইলেন। যদি ওর দিকে ছুটে আসে কোনও ইঁদুর? ধারাল নখ বাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে?

এমন সময় তীব্র আতংক নিয়ে ইলেন দেখল লেকের ধারের চারটে ইঁদুর ওকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। ওদের ধারাল মুখগুলো যেন উঁচিয়ে আছে ইলেনের দিকেই। লম্বা লেজ নড়ছে ডানে-বামে।

চিৎকার দিল ইলেন। উঠে দাঁড়াল বেঞ্চির লোকটা। ঝোপের দিকে আসছে। হাঁচড়েপাঁচড়ে সিধে হলো ইলেন। পিছিয়েছে এক কদম, একটা পা গিয়ে পড়ল গভীর একটা গর্তে। এটা ইঁদুরের গর্ত। ডজন খানেক ইঁদুরের বাচ্চা ব্যথা এবং ভয়ে কিচ্‌কিচ্‌ করে উঠল। পিলপিল করে বেরিয়ে এল গর্ত ছেড়ে। ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। এক ঝটকায় গর্ত থেকে পা বের করে আনল ইলেন। আবার পিছিয়েছে, ওর পা চাপা পড়ে ভর্তা হয়ে গেল একটি বাচ্চা ইঁদুরের নরম শরীর। মরণ যন্ত্রণায় কিইইচ করে উঠল ওটা। ইলেন গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল।

লোকটা ক্রমে কাছিয়ে আসছে। ঝোপ থেকে বেরিয়ে পড়ার প্রাণপণ চেষ্টা করল ইলেন। কিন্তু প্রচণ্ড ভয়ে জমে যাওয়া দুর্বল হাঁটু যেন সাড়া দিতে চাইছে না। কোনও মতে ঘন ঝোপঝাড় ঠেলে বেরিয়ে এল ও, পা রাখল রাস্তায়।

লোকটা দেখে ফেলেছে ইলেনকে। আরও কাছে চলে এসেছে সে। চাঁদের ম্লান আলোয় তার মুখ দেখতে পেল ইলেন। ভয়ে শরীরের সব কটা রোম দাঁড়িয়ে গেল। ওটা মোটেই মানুষের মুখ নয়! ওটা একটা ইঁদুরের মস্ত মুখ, মুখটা নড়ছে, সেইসঙ্গে নড়ছে মুখের দু'পাশের গোঁফ।

ঘুরেই ছুট দিল ইলেন। প্রচণ্ড ভয়ে দিশাহারা হয়ে দৌড়াতে লাগল ও। পেছনে ভেসে এল অসংখ্য ইঁদুরের ভয়ংকর কিচ্‌কিচ্‌ নিনাদ।

ছুটতে ছুটতে পার্কের 'এক্সিট' লেখা গেটের প্রায় কাছাকাছি এসে গেল ইলেন। আর মাত্র দশ গজ। তারপরই ওর মুক্তি। আশ্চর্য! গেটের কাছে কেউ নেই। একজন ভ্রমণকারীও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তাতে কী? ইলেন তো এখনই বেরিয়ে পড়বে। হঠাৎ ওর কলজে হিম হয়ে গেল ঠিক ওর পেছনে তীব্র কিইইচ শব্দ হতে। আঁতকে উঠে পাঁই করে ঘুরল ও। ভয়ংকর চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইঁদুর-মানব। জ্বলজ্বল করছে চোখ। দৃষ্টিতে বিকট উল্লাস। কই, দানবটার ছুটে আসার শব্দ তো পায়নি ও। ইলেনের মুখ হাঁ হয়ে গেল, চিৎকার দেবে। লম্বা, ধারাল থাবা আছড়ে পড়ল মুখে। চিৎকারটা আর মুখ ফুটে বেরুতে পারল না। তার আগেই আঁধার হয়ে এল ইলেনের দুনিয়া।

যন্ত্রণা

মি. বদরুল হাসান চল্লিশ পেরিয়েছেন আরও বছর পাঁচেক আগে। উচ্চতা মাঝারী, ওজন তিন মণের কাছাকাছি। মুখখানা থলথলে, মাংসের চাপে চোখ দু'টো ভেতরে ঢুকে আছে। এই মুহূর্তে তিনি চোখ কুঁচকে রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে তাকিয়ে আছেন বসার ঘরের এক কোণে রাখা একুশ ইঞ্চি সনি কালার টিভির দিকে। ওদিকে খানিকক্ষণ অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করে কটমট করে চোখ ফেরালেন আবদুস সামাদের দিকে। আবদুস সামাদ হাড়গিলে চেহারার, তবে চোখের তারায় শিশুসুলভ একটা সরল ভাব আছে। সে মি. বদরুল হাসানের ত্রিশ হাজার টাকা দামের দামী কার্পেটের ওপর হাত পা ছড়িয়ে বসেছে, সামনে একটা টুল বক্স, হরেক রকম যন্ত্রপাতি, গুনগুন করে 'ভালবাসিয়া গেলাম ফাঁসিয়া' গাইছে আর টুল বক্স নিয়ে কী যেন খুটুর খাটুর করছে।

রাগে বদরুল হাসান সাহেবের গা জ্বলে যাচ্ছে। আবদুস সামাদের মত নিম্ন শ্রেণীর একটি লোক তাঁর ঘরের মেঝেতে হাত পা ছড়িয়ে বসেছে, ব্যাপারটা সহ্য করতে পারছেন না তিনি। কিন্তু নিজের স্বার্থেই নিম্ন শ্রেণীর এই লোকটিকে তাঁর কিছুক্ষণের জন্য সহ্য করতেই হবে।

আবদুস সামাদ নোংরা একটা ত্যানা দিয়ে হাত মুছল, তারপর আড়মোড়া ভেঙে তাকাল বদরুল হাসান সাহেবের দিকে।

'সার, আজ কেমন আছেন?'

বদরুল সাহেবের বাম দিকের ভ্রুটা টকাশ করে লাফ দিল। 'আমি কেমন আছি তা তোমার পরে জানলেও চলবে। আগে বলো হারামজাদা টিভিটা আমাকে আর কত ভোগাবে। ওটার পেছনে আজ আবার কত খসাতে হবে?'

আবদুস সামাদ টিভি সেটের দিকে দ্রুত একবার নজর বোলাল, তারপর চোখ ফেরাল বদরুল হাসানের দিকে। 'ওটার টিউব জোড়া গেছে। অসিলেটারের অবস্থাও খারাপ। নতুন ফিল্টারও লাগাতে হয়েছে।'

চেহারা থমথমে হয়ে গেল মি. বদরুল হাসানের, নীচের পাতলা ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলেন তিনি।

'হারামজাদা টিভিটার পেছনে রিপেয়ারের জন্য এ পর্যন্ত যত টাকা আমি ঢেলেছি,' বললেন তিনি, 'তাতে নতুন আরেকটা সেট কেনা যেত।'

হাসল আবদুস সামাদ। নরম গলায় বলল, 'তা হয়তো যেত। কিন্তু সার, গতবার আপনি আমার সামনেই এমন লাথি মারলেন স্ক্রিনে যে...'

ঘুরে দাঁড়ালেন বদরুল হাসান, হোল্ডারে একটা সিগারেট ঢোকালেন। 'মনে আছে আমার,' তাঁর কণ্ঠ তেতো শোনাল। 'কিন্তু ফাজিলটা ঠিক মত কাজ করছিল না।' শ্রাগ করলেন তিনি। 'ভেবেছিলাম লাথি গুঁতা খেয়ে যদি ঠিক হয়।'

'কিন্তু লাথি খেয়ে ওটার আবার বারোটা বেজেছে,' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল আবদুস সামাদ হতাশ ভঙ্গিতে। 'এভাবে করলে তো, সার, একটা জিনিসও টিকিয়ে রাখতে পারবেন না।'

'আমাকে উপদেশ দিতে এসো না, আবদুস সামাদ,' গমগমে গলায় বললেন বদরুল হাসান। 'টিভির সমস্যাটি কী সেটা বলো।'

টুল বক্স বন্ধ করল আবদুস সামাদ। উঠে দাঁড়াল। 'উপদেশ দিচ্ছি না, সার। একটু সাবধানে জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে বলছিলাম। ইলেকট্রনিক্স জিনিসের মা-বাপ নেই, সার। গ্যারান্টিও কম। আপনার টিভিতে এবার বেশ বড় রকমের সমস্যা হয়েছে। তারটার সব ছিঁড়ে গেছে। আরও কী ক্ষতি হয়েছে খোদা মালুম। গত মাসে আপনার রেডিওর একই রকম অবস্থা হয়েছিল। আপনি ওটাকেও ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।'

'রেডিওটাও ঠিকমত কাজ করছিল না,' বদরুল সাহেবের কণ্ঠ বরফশীতল।

'কিন্তু কেন কাজ করছিল না, সার? বেয়াদবী মাফ করবেন–আমার ধারণা আপনি রেডিও-টিভি কোনটারই ঠিকমত যত্ন নেন না।'

ঠোঁটে ঝোলানো হোল্ডারের সিগারেটে ধীরে সুস্থে আগুন জ্বালালেন মি. বদরুল হাসান। এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন, তারপর বিজ্ঞানী যেভাবে মাইক্রোস্কোপে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট দেখেন, ঠিক সেরকম দৃষ্টিতে তাকালেন আবদুস সামাদের দিকে।

'এই ব্যাখ্যার জন্য তোমাকে নিশ্চয়ই আমাকে আলাদা চার্জ দিতে হবে না?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রিপেয়ারম্যান। 'আসল ব্যাপারটা কী বলুন তো, সার? বার বার এরকম হচ্ছে কেন?'

'জানি না,' কর্কশ গলায় বললেন হাসান সাহেব। 'বললামই তো টিভিটা ঠিকমত কাজ করছিল না। আর তোমার এত ভ্যাজর ভ্যাজর করার কী দরকার? সেট ঠিক হয়েছে কিনা তাই বলো।'

আবদুস সামাদ কোনও কথা না বলে টিভি অন করল। পর্দায় ভেসে উঠল আবদুল বয়াতীর মুখ। গলা ফাটিয়ে জারী গাইছে। এক দৃষ্টিতে বয়াতীর মুখখানা দেখল কিছুক্ষণ আবদুস সামাদ, ভল্যুম কমাল। আবার বাড়াল। তারপর সন্তুষ্টচিত্তে অফ করল টিভি। ঘুরে দাঁড়াল বদরুল হাসান সাহেবের দিকে।

হাসান সাহেব বিচিত্র মুখ ভঙ্গি করে ঘর থেকে বেরুলেন, পেছনে এল আবদুস সামাদ।

'আপনার বিলটা পাঠিয়ে দেব, সার,' বলল আবদুস সামাদ বদরুল হাসান সাহেবের পাশে হাঁটতে হাঁটতে।

'হুম্‌ম' জবাব দিলেন বদরুল হাসান।

সদর দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আবার বদরুল হাসানের দিকে তাকাল আবদুস সামাদ। কী যেন বলতে গিয়েও বলল না। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল মাথা নাড়তে নাড়তে।

লিভিং রুমে এসে ঢুকলেন বদরুল হাসান। ম্যান্টলপিসের ওপর রাখা ঘড়িটা গম্ভীর শব্দে বেজে উঠল।

গলার স্বর নিচু করে বদরুল সাহেব বললেন, 'আবার শুরু করেছ? অনেক হয়েছে তো! আমার কথা কানে যায় না?'

কিন্তু ঘণ্টাটি একভাবে বেজে যেতে লাগল। ম্যান্টলপিসের দিকে হেঁটে গেলেন বদরুল হাসান। গলার স্বর সপ্তমে তুললেন, 'বললাম তো অনেক হয়েছে। তারপরও যন্ত্রণা দাও। এত সাহস!'

দু'হাতে ঘড়িটাকে মুঠো করে ধরলেন তিনি, টান দিলেন জোরে। প্লাগসুদ্ধ ঘড়িটা ছিটকে এল দেয়াল থেকে। তারপর ওটাকে ধরে মস্ত আছাড় দিলেন বদরুল হাসান। ভেঙে টুকরো হয়ে গেল ঘড়ি। তাতেও রাগ কমল না। এবার পা দিয়ে পিষতে শুরু করলেন যন্ত্রটাকে। কিন্তু ভাঙা ঘড়ি থেকে ঘণ্টা ধ্বনি ভেসে এল অনবরত, যেন মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে কোনও পশু। বেশ সময় লাগল ঘণ্টার শব্দ থামতে। ভাঙা কাঁচ আর ছেঁড়া স্প্রিং-এর ওপর ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন বদরুল হাসান। ঘামে মুখ ভিজে সপসপে, থর থর করে কাঁপছে শরীর। শান্ত হলেন তিনি ধীরে ধীরে। শরীরের কাঁপুনি থামলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে, নিজের বেডরুমে গিয়ে ঢুকলেন।

দরজা বন্ধ করে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন বদরুল হাসান। নিজেকে ভঙ্গুর, ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত লাগছে। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। তবে মাঝে মাঝেই দুঃস্বপ্ন দেখে আঁতকে উঠলেন ঘুমের ঘোরে।

মি. বদরুল হাসান ব্যাচেলর মানুষ। উত্তরায় প্রাসাদোপম একটি বাড়িতে থাকেন। পৈতৃক সূত্রে অগাধ সম্পত্তির মালিক। ব্যাঙ্কে কত টাকা আছে নিজেও বোধহয় জানেন না। কাজেই পেটের ধান্ধা তাঁকে করতে হয় না। অবসরে তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় কলাম লিখে পাঠান। কোনওটি ছাপা হয়, কোনওটি হয় না।

জীবন এবং পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে কোনও আগ্রহ নেই বদরুল হাসানের। প্রতিবেশীদের খবর রাখার কোনও প্রয়োজন বোধ করেন না।

তাঁর বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা এ কারণে হাতে গোনা। অবশ্য এতে কোনও অসুবিধে নেই বদরুল সাহেবের। পত্রিকায় লেখালেখি আর বাড়িতে ইলেকট্রিক বিভিন্ন গ্যাজেট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই তাঁর সময় চলে যায়। অবশ্য বেশিরভাগ যন্ত্রই তিনি ভেঙে ফেলেন খুলতে গিয়ে। আর কাজটা যে একেবারে অজ্ঞতা থেকে করেন ঠিক তাও নয়। মনে হয় যান্ত্রিক কাঠামোগুলো ভেঙে তিনি এক ধরনের বিকৃত আনন্দ লাভ করেন।

এ মুহূর্তে মি. বদরুল হাসান তাঁর বিশাল বেডরুমের দরজা খুলে নেমে আসছেন সিঁড়ি বেয়ে। পরনে স্মোকিং জ্যাকেট, এগোলেন খুদে স্টাডি রুমের দিকে। ওখান থেকে টাইপ রাইটারের খটাখট শব্দ ভেসে আসছে। তাঁর সেক্রেটারী, শেহনাজ পারভীন বদরুল সাহেবের নোটগুলো টাইপ করছে। বদরুল হাসান এগুলো বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠাবেন। তিনিও টাইপ জানেন তবে টাইপ রাইটার মেশিনটিকে আরও অনেক যন্ত্রের মতই পছন্দ করেন না। কম্পিউটারের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা আরও বেশি। এ কারণে জিনিসটি কেনেননি তিনি।

শেহনাজ পারভীনের বয়স তেইশ। সে সুন্দরী এবং আকর্ষণীয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরী সায়েন্সে এম. এ করছে। মি. বদরুল হাসানের কাছে পার্ট টাইমের কাজ করে। যা বেতন পায় তা দিয়ে হোস্টেল খরচা তো চলে যায়ই, দেশের বাড়িতে ছোট ভাইটাকেও মাসে মাসে পাঠাতে পারে কিছু।

শেহনাজ পারভীন বদরুল হাসানের তেরো নম্বর সেক্রেটারী। শোনা যায়, কোনও মেয়েই নাকি বদরুল সাহেবের সাথে এক মাসের বেশি কাজ করতে পারেনি তাঁর তিরিক্ষি মেজাজের কারণে। শেহনাজের ধৈর্য প্রশংসনীয়। মাস তিন হলো সে সেক্রেটারীর কাজটি করে যাচ্ছে কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়াই।

টাইপ করতে করতে মাথা তুলে চাইল শেহনাজ। তাঁর বস ভেতরে ঢুকেছেন। হোল্ডারসহ সিগারেট ঝুলছে মুখ থেকে। উদাসীন ভঙ্গিতে তিনি একবার পেছনে ফিরে দেখলেন, তারপর শেহনাজের পেছনে এসে দাঁড়ালেন। উঁকি দিলেন টাইপ রাইটারে আটকানো কাগজটার দিকে। তারপর ডেস্ক থেকে কতগুলো কাগজ হাতে নিলেন।

'সারা বিকেল বসে তুমি এই করেছ?' জানতে চাইলেন তিনি ঠাণ্ডা গলায়।

চোখে চোখ রাখল শেহনাজ। স্পষ্ট গলায় বলল, 'জ্বী। সাড়ে তিন ঘণ্টায় চল্লিশ পৃষ্ঠা টাইপ করেছি, সার। আমার সাধ্যে এই কুলাল।'

টাইপ রাইটারের দিকে আঙুল নাচালেন বদরুল হাসান। 'ইডিয়েটে গ্যাজেটটা দিয়ে মাত্র চল্লিশ পৃষ্ঠা টাইপ! আরে, টমাস জেফারসন মাত্র আধাদিনে পালকের কলম দিয়ে আমেরিকার সংবিধান লিখেছিলেন, তা

জানো?'

রিভলভিং চেয়ারটা ঘোরাল শেহনাজ। শীতল শোনাল কণ্ঠ, 'তা হলে মি. জেফারসনকে ভাড়া করছেন না কেন, সার?'

বদরুল হাসানের বাম ভ্রু লাফিয়ে উঠল। 'তোমাকে আমি বলিনি যে মুখে মুখে তর্ক একদম পছন্দ নয় আমার?'

টাইপ রাইটারের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল শেহনাজ, 'অসংখ্যবার এবং অসংখ্যবার বলেছেন।' আবার সোজা হয়ে বসল। 'একটা কথা বলব, সার।' ভ্যানিটি ব্যাগের দিকে হাত বাড়াল। 'আরেকটা নতুন মেয়ের খোঁজ করুন, এমন কেউ যার তিনটে হাত এবং গায়ে গণ্ডারের চামড়া তা হলে তার সঙ্গে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারবেন। আমার পক্ষে...' সশব্দে নিজের পকেট বুক বন্ধ করল শেহনাজ। 'আপনার সাথে কাজ করা সম্ভব নয়।'

'চাকরিটা ছেড়ে দিতে চাইছ?' জিজ্ঞেস করলেন বদ্রুল সাহেব।

'জ্বী। ছাড়তাম আরও আগেই। কারণ আপনার মত এত খুঁতখুঁতে, খামখেয়ালী স্বভাবের লোকের সঙ্গে কাজ করার মত ঝক্কি আর নেই। একটা স্কলারশিপ পেয়েছি আমি। আগামী মাসে ইউরোপে চলে যাচ্ছি।' ব্যাগটা ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেল শেহনাজ।

বিমূঢ় দেখাল বদরুল হাসানকে, কিছু বলার জন্য মুখ খুললেন একবার, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজালেন, তারপর স্বভাব বিরুদ্ধ অত্যন্ত নরম গলায় ডাক দিলেন পেছন থেকে। 'শেহনাজ...দয়া করে যেয়ো না।'

থমকে দাঁড়াল শেহনাজ পারভীন। ঘুরল। বদরুল সাহেবের চেহারায় ভয়ার্ত একটা ছাপ ফুটে উঠেছে যা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হত না ওর।

'কিছু বললেন?' কোমল স্বরে বলল শেহনাজ।

মুখ ঘোরালেন বদরুল হাসান, অস্বস্তিতে ভুগছেন যেন। 'ইয়ে মানে...আরেকটু সময় যদি আমার সাথে থাকতে। না, কোনও কাজের জন্য নয়। ইয়ে...আজ এক সাথে ডিনারটা না হয় করলাম...' আশা নিয়ে চেয়ে থাকলেন তিনি শেহনাজের দিকে।

'আমার খিদে পায়নি তেমন,' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল শেহনাজ। 'তা ছাড়া ডিনারের সময় এখনও হয়নি। হতাশা ফুটে উঠতে দেখল সে বস-এর মুখে। 'হয়েছে কী আপনার, সার?' সহানুভূতির সুর নেই, এমনি প্রশ্ন।

হাসতে চেষ্টা করলেন বদরুল হাসান। কেমন বিকৃত দেখাল মুখ। 'না, হবে আবার কী? তাড়া না থাকলে চলো ঘুরে আসি কোথাও থেকে।'

ঝাড়া দু'মিনিট বদরুল হাসান সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল শেহনাজ। তারপর থমথমে গলায় বলল, 'ধন্যবাদ সার। আজ আমার সত্যি তাড়া আছে আর তাড়া না থাকলেও আপনার সঙ্গে কোথাও যেতাম না

আমি। কেন, সে ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আপনাকে দিতে বাধ্য নই আমি। গুড নাইট, মি. বদরুল হাসান।'

বদরুল হাসান সাহেবের মুখের রঙ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। একটু টলে উঠলেন তিনি। লোকটার আবার প্রেশার উঠে যাচ্ছে না তো? শঙ্কিত হয়ে ভাবল শেহনাজ। সে কিছু বলার আগেই বদরুল হাসান বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, শেহনাজ। ঠিক আছে। কোথাও যেতে হবে না। এক কাপ কফি খেতে খেতে একটু গল্প করার সময়ও কি হবে না তোমার? আমার আসলে এই মুহূর্তে একা থাকার কথা ভাবলে খারাপ লাগছে।'

আবার লিভিং রুমে ফিরে এল শেহনাজ, দাঁড়াল বদরুল হাসানের পাশে। 'আপনি অসুস্থ নাকি, সার?' জিজ্ঞেস করল সে।

এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন বদরুল সাহেব।

'তা হলে কোনও দুঃসংবাদ?'

'না।'

এক মুহূর্ত নীরবতা। আবার জানতে চাইল শেহনাজ।

'তা হলে সমস্যাটা কী আপনার?'

হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন বদরুল হাসান। আঙুলের ফাঁক দিয়ে তাকালেন শেহনাজের দিকে। ভীত, সন্ত্রস্ত দৃষ্টি।

'আমি খুব ক্লান্ত,' ভাঙা গলায় বললেন তিনি। 'গত চার রাত এক ফোঁটাও ঘুমাতে পারিনি। আর এখন একা থাকার কথা ভাবলেই...' ব্যক্তিগত দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলছেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও, ভাবনাটা নিজের ওপর বিরক্তি এনে দিল তাঁর। তবু বলে চললেন, 'এ সত্যি অসহ্য, শেহনাজ। অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটেছে আমার চারপাশে। ব্যাখ্যাতীত ঘটনাগুলো।'

'বলে যান।'

টিভি সেটের দিকে আঙুল তুললেন বদরুল সাহেব, 'ওই...ওই যে জিনিসটা ওখানে। ওটা গভীর রাতে আপনা আপনি চালু হয়ে যায়, জাগিয়ে রাখে আমাকে সারারাত।' তাঁর চোখ ঘর ঘুরে স্থির হলো হল রুমের দিকে। 'আর ওই পোর্টেবল রেডিওটা দেখ। ওটাকেও আমি বেডরুমে রাখি। ঘুমাতে গেলেই রেডিওটা নিজ থেকে অফ-অন হতে থাকে।'

কথা বলতে বলতে মাথা নিচু করে ফেলেছিলেন বদরুল সাহেব, যখন মুখ তুললেন, শেহনাজ লক্ষ করল চোখের তারায় অদ্ভুত একটা পাগলামির ভাব ফুটে উঠেছে। 'আমার বিরুদ্ধে এই বাড়িতে ষড়যন্ত্র চলছে; শেহনাজ। টিভি সেট, রেডিও, লাইটার, ইলেকট্রিক ঘড়ি, আর...আর ওই বদমাশ গাড়িটাও যেটাকে আমি চালাই।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বদরুল হাসান, মুখ সাদা হয়ে গেছে, উত্তেজিত। 'গত রাতে গাড়িটা আমি গ্যারেজে ঢোকাচ্ছিলাম খুব ধীরে আর

সাবধানে।' শেহনাজের দিকে এক পা এগিয়ে এলেন তিনি, হাতের মুঠো বার বার খুলছেন আর বন্ধ করছেন। 'হঠাৎ হুইলটা আমার হাতের মধ্যে ঘুরতে শুরু করল। শুনলে? আপনা থেকেই হুইলটা ঘুরছিল। স্রেফ সেধে গিয়ে ধাক্কা খেল গ্যারেজের এক ধারে। ভাঙল একটা হেড লাইট–ওই যে ম্যান্টেলপিসের ওপর।'

শেহনাজ ম্যান্টেলপিসের দিকে তাকাল। ওখানে কিছু নেই। প্রশ্নবোধক দৃষ্টি শেহনাজের।

'আমি...আমি ওটা ফেলে দিয়েছি,' ভীরু গলায় বললেন বদরুল হাসান। তারপর জোর করে গলায় স্বর ফোটালেন, 'এরকম অবস্থা অনেক আগে থেকে হয়ে আসছে, শেহনাজ, কোনওদিনই আমি যন্ত্রপাতি ঠিক মত ব্যবহার করতে পারিনি।' হাহাকারের মত শেষ বাক্যটা যেন বেরিয়ে এল বদরুল সাহেবের গলা চিরে।

শেহনাজ স্থির চোখে তাকাল তাঁর দিকে, মায়া হলো আত্মম্ভরী লোকটার জন্য।

'হাসান সাহেব,' খুব নরম গলায় বলল সে, 'আমার মনে হয় আপনার ডাক্তার দেখানো উচিত।'

বদরুল হাসানের চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠল, কর্কশ শোনাল কণ্ঠ। 'ডাক্তার!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'বিংশ শতাব্দীর সর্বরোগ হরণকারী বলে দাবী করা ইডিয়েটগুলো! যদি বিষণ্নতায় ভোগো ডাক্তার দেখাও। যদি সুখে থাকো তা হলেও ডাক্তার এনে এর কারণ খোঁজো। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলেও ডাক্তারের কাছে যাও। তুমি,' গলা ফাটালেন তিনি শেহনাজকে লক্ষ করে, 'নিজে গিয়ে ডাক্তার দেখাও না।' রাগে কাঁপছে গলা। 'আমি একজন যুক্তিবাদী, র‍্যাশনাল, বুদ্ধিমান মানুষ। আমি জানি আমি কী দেখছি। আমি জানি কী শুনছি। গত তিন মাস ধরে যান্ত্রিক ফ্রাঙ্কেনস্টাইনগুলো আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, আমাকে শেষ করার পাঁয়তারা কষছে। বুঝলে, মিস শেহনাজ পারভীন?'

শেহনাজ কয়েক সেকেন্ড উত্তেজিত লোকটাকে যেন জরীপ করল। তারপর বলল, 'বুঝলাম, সার। আপনি সত্যি খুব অসুস্থ। আসলেই আপনার চিকিৎসার দরকার। রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে আপনার নার্ভের বোধ হয় ক্ষতি হয়েছে। তাই আবোল তাবোল সব দেখছেন এবং শুনছেন।'

মেঝের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল শেহনাজ, তারপর ঘর থেকে বেরুবার জন্য পা বাড়াল।

'যাচ্ছ কোথায় তুমি?' চেঁচিয়ে উঠলেন বদরুল।

'আপনার কারও সঙ্গ প্রয়োজন নেই, সার।' বলল শেহনাজ হলঘর থেকে। 'আপনার দরকার ডাক্তার দেখানো।'

‘দেন গেট আউট অভ হিয়ার,’ আবারও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি। ‘এক্ষুণি বেরিয়ে যাও। আর কোনও দিন যেন তোমার মুখ না দেখি।’

‘জীবনেও দেখবেন না,’ বলল শেহনাজ। ‘আপনার মত পাগলের সাথে কাজ করে কোন্ বোকা?’ দুপদাপ পা ফেলে সে দরজার দিকে এগোল।

‘সাবধান,’ চেঁচিয়ে বললেন বদরুল হাসান। ‘আর কোনওদিন যেন তোমাকে এখানে না দেখি। তোমার চেক আমি পাঠিয়ে দেব। আর শুনে রাখো, তোমার মত বেয়াদব সেক্রেটারীর কখনও প্রয়োজনও হবে না আমার।’

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল শেহনাজ। বুক ভরে বাতাস নিল, তারপর আশ্চর্য শান্ত গলায় বলল, ‘মি. বদরুল হাসান, যন্ত্র নিয়ে যে যন্ত্রণায় আপনি আছেন, প্রার্থনা করি, তা থেকে খুব সহজে যেন নিষ্কৃতি না পান।’

বেরিয়ে গেল শেহনাজ, পেছনে দড়াম করে বন্ধ হলো দরজা। মূর্তির মত নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেন বদরুল হাসান। উপযুক্ত শব্দ হাতড়াচ্ছিলেন সেক্রেটারীকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে। কিন্তু শেহনাজ চলে গেছে বুঝতে পেরে উৎসাহ হারিয়ে ফেললেন। এমন সময় শুনলেন ইলেকট্রিক টাইপ রাইটারটা খট খট শব্দ করছে।

বুকের রক্ত জল হয়ে গেল তাঁর শব্দ শুনে। কিছুক্ষণ পরে থেমে গেল টাইপ রাইটার। পড়ার ঘরে ঢুকলেন বদরুল হাসান। টাইপ রাইটারে কাগজ পরানো। বদরুল সাহেব রোলারটা ঘোরালেন কাগজের লেখা পড়ার জন্য। তিন লাইনে লেখা একই কথা, ‘এখান থেকে ভাগো, বদরুল।’

নিজেই এই কথাগুলো লিখেছে টাইপ রাইটারটা। টুকরোটা ছিঁড়ে আনলেন তিনি যন্ত্র থেকে, দলা মোচড়া করে ফেলে দিলেন মেঝের ওপর।

‘এখান থেকে ভাগো, বদরুল,’ গলার স্বর সপ্তমে তুলে বললেন তিনি। ‘গোল্লায় যা তুই। আমাকে বেরিয়ে যেতে বলার কে তুই?’ জোর করে চোখ বন্ধ করে রাখলেন বদরুল সাহেব, ঘামে ভেজা মুখে হাত ছোঁয়ালেন। ‘এটা একটা যন্ত্র...একটা টাইপ রাইটার। ফালতু একটা জিনিস...’

স্থির হয়ে গেলেন তিনি লিভিং রুমের টিভি থেকে ভেসে আসা একটা কণ্ঠ শুনে।

‘এখান থেকে ভাগো, বদরুল।’ বলছে কণ্ঠটা।

বুকের ভেতর ব্যাঙের মত লাফাতে শুরু করল হৃৎপিণ্ড, ঘুরেই ছুটলেন বদরুল লিভিং রুমের দিকে। হাতে গিটার নিয়ে অল্প বয়েসী একটা মেয়ে নাচছে টিভি পর্দায়। নাচের সময় হাইহিলে শব্দ তুলছে, সোজা তাকাচ্ছে বদরুল সাহেবের দিকে। মিউজিকের তালে মেয়েটা নাচতেই থাকল। তা হলে গলার স্বরটা নিশ্চয়ই ভুল শুনেছেন, ভাবলেন বদরুল হাসান। সেক্রেটারী মেয়েটা ঠিকই বলেছে। নিদ্রাহীনতার কারণে আবোল তাবোল

দেখছেন আর শুনছেন তিনি।

টিভির মিউজিক থেমে গেল। মেয়েটি গিটার হাতে ক্যামেরার সামনে 'বো' করল, মুখ তুলে আবার সরাসরি তাকাল বদরুল সাহেবের চোখের দিকে।

মিষ্টি করে হাসল মেয়েটা, স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, 'এখান থেকে ভাগো, বদরুল।'

রাগের চোটে বিকট চিৎকার করে উঠলেন বদরুল হাসান। হাতের কাছে ফ্লাওয়ার ভাসটা নিয়ে গায়ের শক্তিতে ছুঁড়ে মারলেন টিভিটার দিকে। প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো টিভি, গ্লাস ভেঙে শত টুকরো হলো, ধোঁয়া উঠতে লাগল গল গল করে। তারপরও, কী ভয়ানক ব্যাপার, ধোঁয়ার মাঝ থেকে মেয়েটার রিনরিনে কণ্ঠ ভেসে আসতে লাগল।

'এখান থেকে ভাগো, বদরুল,' বলে চলল কণ্ঠটি। আহত জন্তুর মত চিৎকার দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরোলেন বদরুল, হলঘর পেরিয়ে উঠে গেলেন সিঁড়িতে।

টপ ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকালেন তিনি, গলার রগ ফুলে গেল চিৎকার করার সময়। 'ঠিক আছে। ঠিক আছে নির্বোধ যন্ত্রের দল। তোরা আমাকে ভয় দেখাতে পারবি না। শুনতে পাচ্ছিস? আমি জীবনেও তোদেরকে ভয় পাব না।'

ঠিক তখন পড়ার ঘর থেকে গভীর, স্পষ্ট এবং ছন্দায়িত ভঙ্গিতে ভেসে এল টাইপ রাইটারের শব্দ। বদরুল বুঝতে পারলেন হারামজাদাটা কী টাইপ করছে। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল তাঁর। তবে নিজেকে সামলে নিয়ে ঢুকলেন বেড রুমে, দরজা বন্ধ করলেন। তারপর বালিশে মুখ চেপে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। বন্ধ দরজা ভেদ করেও টাইপ রাইটারের টাইপ করার শব্দ ভেসে আসতে লাগল। তারপর এক সময় আপনাআপনি থেমে গেল। নীরব হয়ে গেল বাড়ি।

দুই

সে রাতেও যথারীতি ঘুম হলো না বদরুল হাসান সাহেবের। একাধিকবার দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলেন তিনি। সারা শরীর ঘেমে চুপচুপে। ঘুমের আশা বাদ দিয়ে সিলিং-এর হালকা নীলাভ আলোর দিকে চেয়ে থাকলেন চুপচাপ। হঠাৎ ঢং ঢং শব্দে বাজতে শুরু করল দামী সুইস দেয়াল ঘড়িটা। গুণতে থাকলেন বদরুল হাসান। বারো...এক...দুই...তিন। থেমে গেল ঘণ্টাধ্বনি।

তাঁকে আতঙ্কিত করে দিয়ে ভেসে এল ধাতব, খনখনে কতগুলো শব্দ, 'এখনও সময় আছে। ভেগে পড়ো, বদরুল।' চোখ বড় বড় করে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন বদরুল সাহেব। ওখান থেকেই কথাগুলো আসছে। ভাঙা রেকর্ডের মত একভাবে বেজে যেতে লাগল পেণ্ডুলাম। আর সহ্য হলো না বদরুল সাহেবের। বেড সাইড টেবিলের ওপর মার্বেল পাথরের সাদা একটা কুকুরের মূর্তি ছিল, ওটাকে ঝট করে হাতে তুলে নিলেন তিনি। 'শুয়োরের বাচ্চা।' বলে ছুঁড়লেন দেয়াল ঘড়ি লক্ষ্য করে। কাঁচ ভাঙার তীক্ষ্ণ শব্দ হলো। ফেটে চৌচির হয়ে গেল শৌখিন জিনিসটা। কিন্তু পেণ্ডুলামটা দুলতেই থাকল আগের মত। আর সেই অসহ্য কথাগুলো! উঃ!

কানে আঙুল চাপা দিয়ে ছিটকে ঘর থেকে বেরুলেন বদরুল হাসান। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ঘড়ির শব্দ বন্ধ হয়ে গেছে। তবু ভেতরে যেতে সাহস পেলেন না তিনি। ঝুল বারান্দায় ইজি চেয়ারটায় বসে থাকলেন চুপচাপ। অন্ধকার আকাশে তাঁর দৃষ্টি। দরদর ধারায় জল পড়ছে চোখ বেয়ে। অঝোরে কাঁদছেন বদরুল হাসান।

ভোরের নরম রোদ গায়ে মেখে জেগে উঠলেন বদরুল হাসান। কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন মনে নেই। ভ্রু কুঁচকে কিছুক্ষণ সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কয়েকজন কৌতূহলী মর্নিং ওয়াকার পথ চলতে তাঁর দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। বিব্রত বোধ করলেন বদরুল সাহেব। প্রতিবেশীদের সাথে তাঁর সদ্ভাব নেই। তাঁর কাছে প্রতিবেশী মানেই পরনিন্দা, পরচর্চাকারী। এজন্য কোনও দিন কারও সাথে সেধে আলাপ করার প্রবৃত্তি হয়নি বদরুল সাহেবের। আর তারাই তাঁকে সাত সকালে ব্যালকনিতে হাঁ করে ঘুমাতে দেখে নিশ্চয়ই মুখরোচক গল্পের সন্ধান পেয়ে গেছে। অবশ্য কে কী বলল তার থোড়াই কেয়ার করেন তিনি। লোকগুলোর দিকে মুখ বাঁকিয়ে তিনি ঢুকে গেলেন ঘরে। তারপর ফ্রেশ হতে বাথরুমে ঢুকলেন।

প্রতিদিন শেভ করার অভ্যাস বদরুল সাহেবের। কিন্তু আজ ক'দিন গালে ব্লেড ছোঁয়াননি ইচ্ছে করেই। ঘুম হয় না বলে অবসাদ তাঁকে গ্রাস করে থাকে সর্বক্ষণ। আয়নায় তাকিয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে চমকে উঠলেন বদরুল হাসান। একী দশা! চোখের নীচে কয়েক পোচ কালি, খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলো সব সাদা। গালের হনু দুটো জেগে উঠেছে প্রকটভাবে। চোখের সাদাটে জমির পাশে ছানির মত কী যেন। চাউনিটা উদ্‌ভ্রান্ত, অসহায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইলেকট্রিক রেজরটা হাতে নিলেন বদরুল হাসান। প্লাগ লাগানোই ছিল, সুইচ টিপতেই চালু হয়ে গেল যন্ত্র। গালে ছোঁয়ালেন তিনি ধারাল রেজার। আহ, কী ঠাণ্ডা! ইলেকট্রিক নিড়ানির মত

দাড়ির জঙ্গল সাফ হতে লাগল মৃদু ঘস ঘস শব্দে। হঠাৎ উঃ! করে উঠলেন বদরুল সাহেব। হাতটা সরিয়ে নিয়েছেন গাল থেকে। বিস্ফারিত চোখে আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখলেন তাঁর কালচে চামড়ায় প্রথমে সাদা একটা কাটা দাগ ফুটে উঠল, সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে ফাঁকটা পূরণ হয়ে গেল টকটকে লাল রক্তে। অসাবধানতার জন্য মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করলেন বদরুল সাহেব। গালে আবার রেজর ছোঁয়াতে যাবেন, আয়নায় তাকিয়ে দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। রেজরটাকে অবিকল গোখরো সাপের ফণা মনে হলো, ছোবল মারতে উদ্যত। সরাসরি রেজরের দিকে চাইলেন বদরুল হাসান। হার্ট বিট মিস করল একটা। রেজরটা যেন ক্রূর চোখে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। হঠাৎ রেজর ধরা হাতটা নড়তে শুরু করল। টেনে নিয়ে যাচ্ছে গালের দিকে। হাতটাকে থামাবার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন বদরুল। পারলেন না। ছোবল দিল ওটা তাঁকে। তীব্র জ্বালা অনুভব করলেন জুলফির নীচে। 'মাগো!' বলে খালি হাত দিয়ে জায়গাটা চেপে ধরলেন, আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়াতে শুরু করল রক্ত। রক্ত পড়ছে গাল বেয়ে, হাতে ধরা ইলেকট্রিক রেজর, বদরুল হাসানের ভয়ার্ত মুখ–সব মিলে আয়নায় যেন সিনেমার এক ফ্রিজ শট।

একটা গাল দিয়ে রেজরটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বদরুল। ওটা বাথরুমের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে এক কোণে পড়ে থাকল। দ্রুত আয়োডিন লাগালেন তিনি কাটা জায়গায়। জ্বলে উঠল ভীষণ। দাঁতে দাঁত চেপে ড্রেসিং-এর কাজটা সারলেন বদরুল হাসান। তারপর রেজরটাকে চোখের আগুনে পোড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করে আবার তুলে রাখলেন যথাস্থানে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে নাস্তা সারলেন বদরুল হাসান। তাঁর একটা ঠিকে ঝি আছে। ভোরবেলায় এসে বাসন-কোসন ধুয়ে, নাস্তা বানিয়ে, দুপুর আর রাতের খাবার রান্না করে চলে যায়।

নাস্তা সেরে সেদিনের ইত্তেফাকটা চোখের সামনে মেলে ধরলেন বদরুল সাহেব। সেই একই গৎবাঁধা খবর। দেশে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি, টাকার আরেক দফা অবমূল্যায়ন, অমুক জায়গায় ডাকাতি, তমুক জায়গায় ছিনতাই ইত্যাদি ইত্যাদি। হেডিংগুলোয় চোখ বুলিয়ে বিরক্ত বদরুল কাগজটা ফেলে দিলেন টেবিল থেকে। টেনে নিলেন কফির কাপ। ধূমায়িত কফিতে চুমুক দিচ্ছেন, এই সময় বেজে উঠল ফোন। ঝন ঝন শব্দটা কানে মধু বর্ষণ করল। আসলে এই মুহূর্তে কারও সঙ্গ চাইছিলেন বদরুল সাহেব। হোক না সে অদৃশ্য সঙ্গী। সাগ্রহে রিসিভার কানে ঠেকালেন বদরুল হাসান।

'ইটস বি হাসান স্পীকিং,' গমগমে গলায় বললেন তিনি।

'আচ্ছা, এটা কি তারকালোক?' ভেসে এল একটা কচি কণ্ঠ।

'না তো! তুমি কত নম্বর চাইছ?'

'আমি একটু জাহিদ হাসানের নাম্বারটা চাইছি। ভীষণ দরকার। দিতে পারবেন?'

অপর প্রান্তে অনুনয়।

বেশ মজা পেলেন বদরুল হাসান। বোঝাই যাচ্ছে নয়-দশ বছরের বাচ্চা। তিনি বাচ্চাদের সাথে কথা বলতে বেশ পছন্দ করেন।

'জাহিদ হাসানের নাম্বার দিয়ে কী করবে তুমি?' কৌতুকের সুরে জানতে চাইলেন তিনি।

'উনি না আমার খুব প্রিয় অভিনেতা। আপনি বিটিভিতে সবুজ সাথী দেখেন? ওই যে মফিজ পাগলা...'

শেষ কবে বিটিভি দেখেছেন মনে করতে পারলেন না বদরুল হাসান। স্যাটেলাইটের অনুষ্ঠানগুলোই তাঁর কাছে ট্র্যাশ মনে হয়, বিটিভি দূরে থাক। তবু বাচ্চাটার সাথে কথা চালিয়ে যাবার লোভে তিনি বললেন, 'হুম। দেখেছি তো।'

'তা হলে তো কথাই নেই। জানেন, সেদিন না...' সোৎসাহে কী যেন বলতে গিয়েছিল বাচ্চা, হঠাৎ লাইনটা কেটে গেল।

ভয়ংকর দৃষ্টিতে রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন বদরুল হাসান। যেন লাইন কেটে যাবার জন্য ফোনটারই দোষ।

প্রচণ্ড জোরে তিনি রিসিভারটা ক্রেডলে নামিয়ে রাখলেন। গায়ের ঝাল কমল যেন কিছুটা। তারপরও ওটার দিকে কটমট করে চেয়ে রইলেন। এমন সময় আবার 'ক্রিং ক্রিং' আওয়াজ। বাচ্চাটাই আবার ফোন করেছে ভেবে তাড়াতাড়ি রিসিভার কানে ঠেকালেন বদরুল হাসান।

'এখনও সময় আছে, বদরুল। ভেগে পড়ছ না কেন?' ভরাট গলায় কেউ বলে উঠল ওধার থেকে।

'কী!' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন বদরুল হাসান।

'বলছি এখনও সময় আছে, বদরুল। ভেগে পড়ছ না কেন?' কথাটা পুনরাবৃত্তি করল অদৃশ্য কণ্ঠ।

আর সহ্য করতে পারলেন না বদরুল হাসান। 'ইউ ব্লাডি ফুল!' বলে গায়ের জোরে রিসিভারটা ছুঁড়ে মারলেন। তারে টান খেয়ে ক্রেডলসুদ্ধ হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল ফোন। টপ সেন্টার টেবিলের এক কোণে ফোনের তার বেধে গেল যেন কীভাবে। শূন্যে ঝুলতে লাগল রিসিভার। মাউথ পিস দিয়ে একভাবে, একঘেয়ে কথাগুলো ভেসে আসতে লাগল বার *বার—'এখনও সময় আছে, বদরুল। ভেগে পড়ছ না কেন?'*

ছুটে গেলেন বদরুল। এক টানে ছিঁড়ে ফেললেন তার। তারপর পাগলের মত রিসিভারটা কার্পেটে ঢাকা মার্বেল পাথরের মেঝেতে ঠুকতে লাগলেন। ভেঙে টুকরো হয়ে গেল ওটা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। ভাঙা

ফোনের পাশে বসে হাঁফাতে লাগলেন তিনি।

কিছুক্ষণ পর সুস্থির হয়ে ভাবতে বসলেন বদরুল হাসান। এরকম কেন ঘটছে? তাঁর মাথা টাথা সত্যি খারাপ হয়ে যায়নি তো? তিনি কি স্রেফ হ্যালুসিনেশনের শিকার নাকি যা ঘটছে সব বাস্তব? শেহনাজ ঠিকই বলেছে তাঁর আসলে ডাক্তার দেখানো দরকার। নাকি সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাবেন? ধুর তিনি কি পাগল নাকি যে পাগলের ডাক্তারের কাছে যাবেন? তারচে' কোনও মেডিসিনের ডাক্তারের কাছে যাওয়াই ভাল। ঘুম না হওয়াটাই তাঁর রোগ। কীভাবে ঘুম হবে এটা জানতে হলেও একবার ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার।

মেডিসিনের জাঁদরেল ডাক্তার প্রফেসর বাতেনকে দেখাবেন, সিদ্ধান্ত নিলেন বদরুল সাহেব। কিন্তু ডা. বাতেনের সাথে আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হয়। অভ্যাস বশে ফোনের দিকে হাত বাড়াতে গিয়েও নিজেকে সংযত করলেন। তাঁর সামনেই চিৎ হয়ে পড়ে আছে ভাঙা রিসিভার। এ এলাকায় কাছে পিঠে কার্ড ফোন সেন্টার নেই। এক কিলোমিটার দূরে পুলিশ বক্সের সাথে আছে একটা। এখন আর ওখানে যেতে ইচ্ছে করছে না। মোবাইল ফোনটাও অকেজো হয়ে পড়ে আছে। একবার ভোরের কাগজ-এ ফোন করার চেষ্টা করছিলেন জরুরী প্রয়োজনে। বার বার এনগেজড টোন পাওয়ায় মাথায় রক্ত চড়ে যায় বদরুল সাহেবের। সব দোষ মোবাইলের ওপর চাপিয়ে আছাড় দিয়ে ভেঙে ফেলেন তিনি ওটাকে। সন্ধ্যা বেলায় নিজেই যাবেন ডাক্তারের কাছে, সিদ্ধান্ত নিলেন বদরুল সাহেব। প্রফেসরের অ্যাসিস্ট্যান্টকে একখানা একশো টাকার নোট ধরিয়ে দিলে আজকেই সে অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করে দেবে।

তিন

খিঁচানো মেজাজ নিয়ে বাসায় ফিরলেন বদরুল হাসান। প্রফেসর বাতেনকে পাননি তিনি। চেম্বার বন্ধ। শুক্রবার তাই। আরে, শুক্রবার বলে কি অসুখ-বিসুখগুলোও ছুটি নেয় নাকি? নাকি বন্ধের দিন বলে স্পেশাল তোয়াজ করে? যত্তসব কাণ্ডজ্ঞানহীন ডাক্তারের বাস এ দেশে।

রাগে গজ গজ করতে করতে বদরুল সাহেব বার ক্যাবিনেট থেকে একটা 'ভ্যাট সিক্সটি নাইন'-এর বোতল বের করলেন। মদ্যপানের অভ্যাস তাঁর তেমন নেই। কোনও কারণে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লে তরল পদার্থটা টনিকের কাজ দেয়। কিন্তু আজ কাজ করল উল্টো। দপদপিয়ে ব্যথা শুরু

হলো মাথায়। যেন ফেটে যাবে। ব্যালকনিতে এসে বসলেন। এক ফোঁটা বাতাস নেই। খিঁচানো মেজাজ খাপ্পা হয়ে গেল আরও। ঢুকলেন শোবার ঘরে। ফুল স্পীডে এসি ছেড়ে দিলেন। ধুত্তুরি, ঘর ঠাণ্ডা হচ্ছে কই? নাকি এই ব্যাটাও জাত ভাইদের মত বিট্রে শুরু করে দিল? খানিকক্ষণ এয়ার কুলারের নবগুলো নিয়ে খোঁচাখুঁচি করলেন তিনি। মুখ প্রায় ঠেসে ধরলেন যন্ত্রটার গায়ে। 'উঁহুঁ, কেমন একটা গরম বাতাস আসছে না?' 'আমার সাথে বিটলামি, না? দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা' বলে বাথরুমে ঢুকলেন বদরুল হাসান। পানি দিয়ে চোবাবেন এয়ার কুলার। জবর শিক্ষা দিয়ে ছাড়বেন যাতে এমন ফাজলামি আর না করে।

বাথরুমের দরজায় পা রাখতেই বদরুলের চোখ কপালে উঠে গেল। শেভিং কেবিনেটে রাখা ইলেকট্রিক রেজরটা নিজে থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। চোখ কচলালেন বদরুল। ভুল দেখছেন না তো? নাহ, ওই তো ওটা নড়ে উঠল। তারপরই বদরুল সাহেবকে লক্ষ্য করে লাফ দিল।

'বাপরে!' বলে মাথা সরিয়ে নিলেন বদরুল সাহেব। ভীষণভাবে মাথাটা ঠুকে গেল দরজার কোণে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য বিনে পয়সায় তারার ফুলঝুরি দেখলেন তিনি। তারপর প্যান্ট বেয়ে সরসর করে কী একটা উঠে আসছে টের পেয়ে সেদিকে তাকাতেই আঁতকে উঠলেন। রেজরটা!

আহত জন্তুর মত গোঙানি বেরিয়ে এল বদরুল হাসানের গলা থেকে। হাতের এক ঝটকায় রেজরটাকে ফেলে দিয়ে দৌড়ালেন বেডরুমে। দরজা বন্ধ করার আগে এক পলক দেখলেন এঁকেবেঁকে এগিয়ে আসছে রেজর, ঠিক গোখরো সাপের মত ফণা তুলে।

দরজায় খিল দিয়ে কিছুক্ষণ হাপরের মত হাঁফালেন বদরুল। হঠাৎ টের পেলেন খুব শীত করছে তাঁর। চালু হয়ে গেছে এসি পুরো দমে। ঠকাঠক কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে গেল। এয়ার কুলার বন্ধ করার জন্য এগোলেন তিনি। কিন্তু দু'পা এগোনোই সার। যন্ত্রটাতে যেন সাইক্লোন বইতে শুরু করেছে। শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে বাতাসের। কিছুতেই এসির সামনে যাওয়া যাচ্ছে না। দেখতে দেখতে ঘরের তাপ মাত্রা অস্বাভাবিক ভাবে নেমে এল। বদরুল সাহেব বুঝলেন আর কয়েক মিনিট এ ঘরে থাকলে তিনি ঠাণ্ডায় জমেই মারা যাবেন। এয়ার কুলার বন্ধের আশা ত্যাগ করে দরজা খুললেন তিনি। এবং সাথে সাথে আক্রান্ত হলেন।

শয়তান রেজরটা যে দরজার কাছেই ওঁৎ পেতে ছিল, কে জানত? সোজা বদরুল সাহেবের টুঁটি লক্ষ্য করে ওটা লাফ দিল। একটুর জন্যে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলো আক্রমণ। সাঁৎ করে মাথা সরিয়ে নিয়েছেন বদরুল। রেজর গিয়ে ধাক্কা খেল দরজার চৌকাঠে।

পড়িমরি করে দৌড় দিলেন বদরুল হাসান। এক সাথে তিনটে করে

সিঁড়ি টপকাতে লাগলেন ওজনদার শরীর নিয়েও। নীচ তলায় নেমে পেছন ফিরে চাইতেই আতঙ্কে চোখ বড় বড় হয়ে গেল। রক্তের নেশায় উন্মাদ রেজরটা লাফাতে লাফাতে নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে।

দৌড় দিতে গেলেন বদরুল হাসান। সকালে ছিঁড়ে রাখা টেলিফোনের তারে পা বেধে দড়াম করে খেলেন এক আছাড়। দুনিয়া দুলে উঠল চোখের সামনে। ঠিক তখন সবচেয়ে রোমহর্ষক ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করল।

স্টাডি রুমে আপনা থেকে জ্যান্ত হয়ে উঠল টাইপ রাইটার। খট খট শব্দে ওটা কী টাইপ শুরু করে দিয়েছে বদরুল সাহেব বুঝতে পারলেন খুব ভাল ভাবে। তাঁর বেডরুমের ভাঙা দেয়াল ঘড়িটা বাজতে শুরু করল ঢং ঢং শব্দে। ভাঙা টিভির শূন্য গহ্বর থেকে ভেসে এল খল খল হাসি। আর একই সঙ্গে ভাঙা ফোন বেজে উঠল। 'ক্রিং ক্রিং' শব্দটা বিস্ফোরণের মত বাজল কানে। বদরুল সাহেব শুনতে পেলেন দেয়াল ঘড়ি, টিভি আর ফোন এক সাথে বলতে শুরু করেছে, 'তোমার আর রক্ষা নেই, বদরুল। আর রক্ষা নেই।'

গোটা ব্যাপারটা অস্বীকার করতে মন চাইল বদরুল সাহেবের। চোখ বুজে ভাবার চেষ্টা করলেন তিনি যা শুনছেন সব মিথ্যা, যা দেখছেন তা দুঃস্বপ্ন বৈ অন্য কিছু নয়।

কিন্তু পায়ে সাপের দংশনের মত তীব্র জ্বালা টের পেতেই লাফিয়ে উঠলেন বদরুল। সেই রেজরটা। ধারাল খুরের আঘাতে গোড়ালির কাছ থেকে কেটে নিয়েছে প্যান্ট। গল গল ধারায় বেরুনো তাজা রক্ত সাথে সাথে শুষে নিয়ে আরও রক্তাক্ত রঙ ধারণ করল লালচে কার্পেট।

এক লাথিতে রেজরটাকে পা থেকে ফেলে দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গাড়ি-বারান্দার দিকে ছুটলেন বদরুল হাসান। অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে ছিল শক্তিশালী, কালো মার্সিডিজ বেঞ্জটা। তিনি কাঁপা হাতে চাবি বের করলেন পকেট থেকে, তালা খুলতে গিয়ে ঝনাৎ করে পড়ে গেল রিংসুদ্ধ চাবি। নিজেকে বিশ্রী একটা গালি দিয়ে উবু হলেন বদরুল। হঠাৎ তাঁর পিলে চমকে দিয়ে মেঘ গর্জনের শব্দে চালু হয়ে গেল মার্সিডিজের ইঞ্জিন। সার্চ লাইটের মত একটা হেড লাইট জ্বলে উঠল অন্ধকারের বুক চিরে। তারপর ব্যাক গিয়ার মেরে গাড়িটা নিজেই পিছু হঠল। চাবি খুঁজবেন কী, এমন ভৌতিক কাণ্ড দেখে সব ভুলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন বদরুল হাসান গাড়ির দিকে। সম্বিত ফিরল যখন মার্সিডিজ সগর্জনে তাঁর দিকে ছুটে এল, তখন।

হেড লাইটের তীব্র আলো অন্ধ করে দিল বদরুল হাসানকে। গাড়িটা তাঁর গায়ের ওপর এসে পড়ছে বুঝতে পেরে ব্যাঙের মত লাফ দিলেন তিনি এক ধারে। আহত পা-টা বেকায়দায় পড়ল এক টুকরো দশ ইঞ্চি ইটের

ওপর। দুনিয়া ফাটানো চিৎকার দিয়ে উঠলেন তিনি। পরক্ষণে চিৎকারটাকে গপ করে গিলে ফেলতে হলো মূর্তিমান আজরাইলকে আবার তাঁর দিকে ছুটে আসতে দেখে। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এবার দিক্‌বিদিক্‌ শূন্য হয়ে ছুটলেন মি. বদরুল হাসান।

মৃত্যু ভয় কাকে বলে টের পেলেন তিনি। 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে চিৎকার করলেন কিন্তু কেউ শুনল না তাঁর কথা। তুরাগ নদীর ধারে, উত্তরার একেবারে শেষ প্রান্তে নিজের বাড়িটি করেছেন বদরুল সাহেব। এদিকে সকালে আর বিকেলে স্বাস্থ্যসেবীরা আসে তাজা বাতাস ভক্ষণ করতে। সন্ধ্যার পরে কেউ ভুলেও পথ মাড়ায় না। কারণ এখানকার বাসিন্দাদের সন্ধ্যার পর সময় কাটে ক্লাবে বা পার্টিতে। আর বদরুল সাহেবের মরণ আর্তনাদ কেউ শুনতে পাচ্ছে না কারণ তাঁর নিকটতম প্রতিবেশীর বাড়িও এখান থেকে অন্তত পাঁচশো গজ দূরে। সে বাড়িতে এ মুহূর্তে আলো জ্বলছে না। হয়তো বাসিন্দারা বেরিয়ে পড়েছে নৈশ অভিসারে। তাই কেউ দেখল না একটি অসহায় মানুষ উন্মত্ত যন্ত্র দানবের হাতে নির্মম মৃত্যুবরণ করতে চলেছেন।

খানাখন্দে হোঁচট খেয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে ছেলে বেলার কথা মনে পড়ছে বদরুল হাসানের। ছোট বেলা থেকেই সব ধরনের যান্ত্রিক অনুষঙ্গের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা। বাড়ির টিভি, রেডিও ইত্যাদি নিজ হাতে খুলে, নব টব মুচড়ে দিয়ে বিকৃত মজা পেতেন তিনি। বড় হয়েও যায়নি বদভ্যাসটা। ইলেকট্রিক গ্যাজেটগুলো অনভ্যস্ত হাতে নাড়াচাড়ার কারণে বহুবার ওগুলো বিগড়ে গেছে আর সেই সাথে জিনিসগুলোর প্রতি ঘৃণা বেড়েছে বদরুল সাহেবের। মনে হয়েছে তাঁকে মানসিক অশান্তিতে রাখার জন্যই যন্ত্রগুলো ইচ্ছে করে নষ্ট হয়। আর তাঁকে মেরামতের জন্য বার বার পকেট থেকে মোটা অঙ্কের টাকা গচ্চা দিতে হয়।

কিন্তু এখন কৃতকর্মের জন্য বড্ড আফসোস হচ্ছে বদরুল হাসানের। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিগুলোর ওপর এতকাল অবিচার করার ফল এখন পাচ্ছেন হাতে হাতে। জীবন দিয়ে মাশুল দিতে হচ্ছে।

বিশাল বপু নিয়ে গোঙাতে গোঙাতে ছুটছেন বদরুল হাসান। পেছনে অপ্রতিরোধ্য মৃত্যুর মত শখ করে কেনা মার্সিডিজ বেঞ্জ। আজ বিকেলেও ওটার দরজা ঠিক মত খুলছিল না বলে পেল্লায় এক লাথি বসিয়ে দিয়েছিলেন বদরুল। হয়তো সেই লাথির প্রতিশোধ নিতেই ছুটে আসছে মূর্তিমান আতঙ্ক।

ছুটতে ছুটতে তুরাগের পাড়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন বদরুল সাহেব। দূরে কোথাও পাড় ভাঙার অস্পষ্ট শব্দ বুকে কাঁপ ধরাল। নীচে তাকাতেই হিম হয়ে গেল শরীর। অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু খলবলে জল

রাশির শব্দ। পেছনে তাকালেন তিনি। হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে আছে যমদূত।

'মাফ করো!' দু'হাত জড় করে কেঁদে উঠলেন তিনি। 'আমি সাঁতার জানি না। আমাকে এভাবে মেরো না, প্লীজ।'

জবাবে গর্জে উঠল ইঞ্জিন। আবার এগোতে শুরু করল মৃত্যু। এক পা করে পিছু হঠতে শুরু করলেন বদরুল হাসান। এগিয়ে আসছে মার্সিডিজ। একটা হেড লাইটে গাড়িটাকে এক চোখো দানবের মত লাগছে। চোখটা মৃত্যু খিদেয় অস্থির।

পিছু হঠতে হঠতে একেবারে পাড়ের কিনারে এসে গেলেন বদরুল হাসান। এখানে মাটি খুব নরম। তাঁর ভারী শরীরের ওজন সইতে পারল না নরম মাটি। হঠাৎই টের পেলেন বদরুল সাহেব পায়ের নীচ থেকে সরে যাচ্ছে আশ্রয়, পিছলে পড়ে যাচ্ছেন তিনি উঁচু পাড় থেকে। ছিটকে পড়ার আগ মুহূর্তে বদরুল সাহেবের মনে হলো মার্সিডিজের চোখটা যেন হাসছে। প্রতিশোধ নিতে পারার পরিতৃপ্তির হাসি!

চার

বদরুল হাসানের ফুলে ফেঁপে ওঠা পচা লাশ তুরাগের দক্ষিণে আবিষ্কার হলো দিন দুই পরে। মাছ ধরতে গিয়ে স্থানীয় জেলেরা লাশটাকে পেল। তাঁরা পুলিশের হাতে তুলে দিল মৃত দেহ।

যথারীতি পোস্টমর্টেম হলো। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে ডাক্তার বললেন, প্রচুর মদ্য পানের আলামত পাওয়া গেছে তাঁর দেহে। রুটিন মাফিক তদন্তে পুলিশ বদরুল সাহেবের প্রতিবেশীদের কাছে জানতে পারল, বদরুল সাহেবকে নাকি অনেকেই দেখেছে একা, উদ্ভ্রান্তের মত কথা বলতে। দু'একজন প্রতিবেশী এটাও জানাল মাঝে মাঝেই তাঁর বাসার সামনে দিয়ে যাবার সময় গোঙানি আর চিৎকারের আওয়াজ শুনেছে। সমস্যা হয়েছে কিনা জানতে গিয়েছিল তারা। অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে তাদেরকে। এরপর থেকে বদরুল হাসানের ব্যাপারে তারা আর মাথা ঘামায়নি।

তদন্ত শেষে পুলিশ তাদের রিপোর্টে লিখল মি. বদরুল হাসানের অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য তিনি নিজেই দায়ী। একা থাকতেন তিনি, কারও সঙ্গে কথা বলতেন না। শেষ দিকে তাঁর মধ্যে এক ধরনের মস্তিষ্ক বিকৃতি লক্ষ করা যায়। ঘটনার দিন প্রচুর মদ খেয়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি গাড়ি নিয়ে। (গাড়ির হুইলে তাঁর হাতের ছাপ এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়)। সম্ভবত তুরাগ

নদীর ধারে এসে হাওয়া খেতে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। মাতাল অবস্থায় পাড় ভেঙে ছিটকে পড়েন নদীতে। এবং সলিল সমাধি লাভ করেন।

এই ঘটনার মাস ছয় পরে বনানী গোরস্তানে এসেছে তমিজ আলী কবরের গায়ে বেড়ে ওঠা ঘাস, আগাছা ইত্যাদি ছাঁটতে। ঘাস ছাঁটার যন্ত্র দিয়ে কাজটা এক মনে চালিয়ে যাচ্ছে সে। হঠাৎ একটা কবরের পাশে এসে যন্ত্রটা যেন পাগল হয়ে উঠল। বার বার তমিজ আলীর হাত থেকে ছিটকে যেতে চাইল, কবরটার গায়ে আঘাত করতে লাগল। যেন তীব্র ঘৃণা ভরে লাথি মারছে। তমিজ ভাবল তার যন্ত্রে বুঝি গোলমাল। সে ঘাস কাটার যন্ত্রটা পরীক্ষা করে দেখল। কোনও সমস্যা নেই। অন্য কবরের পাশের আগাছা ঠিকই সাফ করছে যন্ত্র, কিন্তু নতুন, দামী পাথরের এই কবরটার কাছে এলেই যেন খেপাটে আচরণ শুরু করে দিচ্ছে। কৌতূহল হলো তমিজ আলীর। কবরটার দিকে তাকাল সে ভাল করে। অল্প স্বল্প লেখাপড়া জানে। ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়েছে। পড়ল:

মি. বদরুল হাসান
(১৯৫২-১৯৯৭)

এই কবরে নিশ্চয়ই জিনের আসর আছে, ভ্রূ কুঁচকে ভাবল তমিজ আলী। নইলে ঘাস কাটার যন্ত্র এমন করে কেন?

জিনের কথা ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিল ওর। এদিক ওদিক তাকাল। ধারে কাছে কেউ নেই। আয়াতুল কুরসী পড়ে বার তিনেক ফুঁ দিল বুকে। তারপর যন্ত্রটা শক্ত মুঠোয় চেপে কবরটার দিকে সভয়ে আরেক বার তাকিয়ে গোরস্তানের গেটের দিকে হন হন করে হাঁটা দিল।

ফাঁদ

অক্টোবরের এক সন্ধ্যায় ছোট্ট হোটেলটিতে এসে পৌঁছলেন মশিউ পিনেট। রাস্তার ওপর শরতের শুকনো পাতা, বিবর্ণ পথটা ধরে হেডলাইটের আলোয় গ্রামের আঁধার চিরে আসার সময় মনটা বেশ উৎফুল্লই ছিল পিনেটের। তিনি প্যারিস টেক্সটাইল ম্যানুফাকচারারের একটি বড় ফার্মের রিপ্রেজেন্টেটিভ। উত্তর ফ্রান্সের একঘেয়ে এলাকাগুলোতে আগে নিয়মিত ঢুঁ মেরেছেন পিনেট। দু'ধারে পপলার গাছের সারি, মাঝখানে রাস্তা। বহুবার তিনি এ রাস্তায় যাতায়াত করেছেন। আজ অবশ্য আলাদা আরেকটা এলাকায় এসেছেন তিনি, দক্ষিণের লিঁও থেকে ইলে ডি ফ্রান্সের দিকে যাত্রা শুরু করেছেন। তাঁর বেতন বেড়েছে, ফুর্তির এটি অন্যতম একটি কারণ। আর নতুন এলাকায় যেতে পারছেন, স্বভাবতই ভাল লাগছে তাঁর।

এ এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এককথায় শ্বাসরুদ্ধকর। বিপুল বেগে গাড়ি ছুটিয়েছেন পিনেট, হাসিতে উদ্ভাসিত চেহারা। আনন্দ থাকারই কথা। অত্যন্ত সফল হয়েছে তাঁর এবারকার ট্যুর। মক্কেলের দেয়া টাকায় ফুলে আছে মানিব্যাগ।

এ মুহূর্তে তিনি ফ্রান্স থেকে পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে তাঁর বাড়ি কুরবোভোই'র শহরতলীতে। দীর্ঘ পথভ্রমণে শরীর বেজায় ক্লান্ত, গাড়ি ঠেলে বাড়ি পৌঁছার ধকল আর সইতে পারবেন না বুঝতে পেরেছেন। সেই অক্সেরে থেকে গাড়ি ছুটিয়ে আসছেন তিনি, এখন একটু বিশ্রাম না নিলেই নয়। একটা গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ ছোট হোটেলটার সাইনবোর্ডে আটকে গেল চোখ। সিদ্ধান্ত নিলেন রাতটা হোটেলে কাটিয়ে পরদিন বাড়ি ফিরবেন। হোটেলটা প্রায় একটা জঙ্গলের মধ্যেই বলা যায়। চারপাশে পাইন গাছ, একটা ক্যানভাসের নীচে কতগুলো চেয়ার-টেবিল ফেলে রাখা, অবশ্য হলওয়েতে আলো জ্বলছে। তার মানে এটা পরিত্যক্ত নয়। পাইন গাছের নীচে গাড়ি রাখলেন পিনেট। এক বার-এ চোখ পড়ল, অনেকগুলো বোতল সাজানো বারটিতে। দেখে মনে হয় উষ্ণ, তরল পদার্থে বোঝাই বোতলগুলো।

হোটেল বা সরাইখানাটির সামনে আর কোনও গাড়ি দেখা যাচ্ছে না। তবে ও নিয়ে পিনেটের ভাবনাও কিছু নেই। তিনি কারও সঙ্গ আশা করছেন না, এ মুহূর্তে আধ বোতল ওয়াইনের জন্য আকুলি-বিকুলি করছে বুকটা। মদ গিলে শরতের হিম ভাবটা থেকে রক্ষা পেতে চান। তারপর পেট পুরে

ডিনার খেয়ে আট ঘণ্টা ঘুম দিলেই পরদিন সকালে তাজা মন ও শরীর নিয়ে যাত্রা শুরু করা যাবে প্যারিসের উদ্দেশে। গাড়ি পার্ক করে ওতে তালা লাগালেন পিনেট, তারপর হলঘরে ঢুকলেন। পালিশ করা মেঝেতে শুয়ে আছে একটা বেড়াল। শহুরে পোশাক পরা এক লোক কনিয়াক পান করছে। এ ছাড়া জীবনের চিহ্ন নেই কোথাও। লোকটা পিনেটকে দেখে মৃদু গলায় 'শুভ সন্ধ্যা' বলল। তারপর এক ঢোকে গ্লাসের তরল জিনিসটা শেষ করে বেরিয়ে গেল। মশিউ পিনেট জানালা দিয়ে দেখলেন একটা নীল রঙের বড় মার্সিডিজ নিয়ে চলে যাচ্ছে লোকটা। গাড়িটা রাস্তার ঢালে পার্ক করা ছিল।

কাউন্টারের বেল টিপে ধরতেই চটি ফটফট করে এগিয়ে এল এক লোক। বিনয়ের অবতার সেজে জানাল–হ্যাঁ, মশিউ অবশ্যই এখানে একটা ঘর পেতে পারেন, আর ডিনারের ব্যবস্থাও করা যাবে।

মশিউ পিনেট রেজিস্টারে নিজের নাম সই করলেন। চারপাশে চোখ বুলিয়ে অবাকই লাগল তাঁর, এতবড় ডাইনিং রুম, অন্তত দুশো মানুষ এক সাথে বসে খেতে পারে। অথচ কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এটা ট্যুরিস্ট সিজন নয়, ব্যাখ্যা করল হোটেল মালিক। তাই লোকজন খুব কমই আসে। অবশ্য এ নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই পিনেটের। তিনি এখন ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়তে পারলেই খুশি।

হোটেল মালিক মধ্যবয়স্ক, টাক মাথা, কান জোড়া অস্বাভাবিক বড়। চোখ দুটি কুঁতকুঁতে, লোভ আর কুটিলতার ছায়া তাতে। হাসার সময় বেরিয়ে পড়ল সোনা বাঁধানো দাঁত, আলো পড়ে ঝিক করে উঠল। হাসলে লোকটাকে মোটেই ভাল লাগে না, কুৎসিত দেখায়।

লোকটা তার নাম বললেও ঠিক শুনতে পাননি পিনেট। তবে প্রথম দর্শনেই টাকুকে অপছন্দ হয়েছে তাঁর। ডিনার টেবিলে হাজির থাকল সে। পিনেট আশপাশে কাউকে দেখতে পেলেন না। অবশ্য রান্নাঘরে কেউ থাকতে পারে মনে হলো তাঁর। একটু পর লো-কাট কালো ফ্রক পরা এক মুটকিকে দেখতে পেলেন তিনি এক ঝলকের জন্যে, দূর থেকে হেঁটে যাচ্ছিল, চোখাচোখি হতে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সালাম করল, বিড়বিড় করে কী যেন বলে চলে গেল। লোকটার বউ হবে, ধারণা করলেন পিনেট।

খাওয়ার আগে হাত মুখ ধোয়া দরকার। টয়লেটের দরজা দেখিয়ে দিল হোটেল মালিক। ডাইনিং রুমের পরে ছোট্ট করিডর, তার মাথায় টয়লেট। অন্ধের মত হাত বাড়িয়ে অনেক কষ্টে খুঁজে পেতে বাত্তির সুইচ জ্বালালেন পিনেট এবং শিউরে উঠলেন দৃশ্যটা দেখে। একটা মাকড়সা। প্রকাণ্ড। বাদামি রঙ। বসে আছে চিড় ধরা পাথুরে মেঝেতে। ওটার ধাতব চোখজোড়া যেন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল পিনেটের দিকে। মাকড়সা ভীষণ ভয় পান পিনেট। তীব্র ঘৃণায় ওটাকে জুতোর নীচে পিষে ফেললেন তিনি।

টয়লেটের দরজা খুলে আলো জ্বেলে আর্তনাদ করে উঠলেন পিনেট। এখানেও দুটো দানব, একটা দেয়ালে, তাঁর মাথার কাছে, অন্যটা কমোডের নীচে, মেঝেতে। ওটা নড়ে উঠতে খসখসে পায়ের শব্দও যেন শুনতে পেলেন পিনেট। আর অদ্ভুত ব্যাপার, নীল ধাতব চোখ মেলে সরাসরি তাকিয়ে থাকল মাকড়সা পিনেটের দিকে। পিনেটের মনে হলো ওটার চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে ঘৃণা। তিনি এটাকেও ভর্তা বানালেন জুতোর নীচে পিষে। চোখের আলো নিভে গেল প্রাণবায়ু বেরিয়ে যেতে।

অপর মাকড়সাটা বিদ্যুৎগতিতে ল্যাভেটরির সিস্টার্নের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল, পিনেট আবার চিৎকার দিলেন। তাঁর চিৎকার শুনে চলে এল হোটেল মালিক। মনে হলো মজা পেয়েছে লোকটা, চোখ জোড়া নাচছে।

'না, মশিউ,' বলল সে, 'ভয় পাবার কিছু নেই। বছরের এ সময়ে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার কারণে ওগুলো প্রায়ই চলে আসে এদিকে। ওগুলো আপনার কোনও ক্ষতি করবে না। সবগুলোই আমার পোষা।'

মুখ দিয়ে বিদঘুটে একটা শব্দ করল লোকটা, পিনেটের কানে রীতিমত অশ্লীল শোনাল, প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে সিস্টার্নের আড়াল থেকে উদয় হলো বাদামী আতঙ্ক। পিনেটের চোখ বড় বড় হয়ে গেল অবিশ্বাসে, মাকড়সাটা লোকটার হাতের তালুতে উঠে আসছে। মাকড়সার গায়ে টোকা দিল হোটেল মালিক, কুঁকড়ে গেল ওটা। হাতের তালুতে বসে রইল চুপচাপ।

মশিউ পিনেট ম্লান এবং বিবর্ণ লোকটাকে 'এক্সকিউজ মি' বলে করিডরের বেসিনে হাত মুখ ধুয়ে নিলেন। ডাইনিং রুমে ফিরে আসার পর খানিক স্বস্তি বোধ করলেন। লোকটার হাতে মাকড়সাটাকে দেখতে না পেয়ে পেশীতে ঢিল পড়ল তাঁর।

হোটেলঅলা অদ্ভুত মানুষ হলেও রান্নার হাতটা সত্যি ভাল। ডিনার খেয়ে তৃপ্তি পেলেন পিনেট। ডিনার শেষে হোটেলঅলাকে একসাথে ড্রিঙ্ক করার অফারও দিয়ে বসলেন। সরাইখানাটা দীর্ঘদিন ধরে চালাচ্ছে কিনা জানতে চাইলে লোকটা বলল, 'না। আমরা বেশিদিন কোথাও থাকি না। আমি এবং আমার স্ত্রী।'

এ নিয়ে আর কথা বলার আগ্রহ অনুভব করলেন না পিনেট। ঠিক করলেন হোটেলঅলার চার্জ এখুনি বুঝিয়ে দেবেন। তিনি হিসেবী মানুষ। ভোরে উঠেই চলে যাবেন।

টাকার বান্ডিলে ঠাসা মানিব্যাগটা খুললেন পিনেট। ওদিকে তাকিয়ে চোখ চকচক করে উঠল হোটেল মালিকের। লোকটা তাঁর মানিব্যাগের দিকে চেয়ে আছে বুঝতে পেরে পিনেট দ্রুত কয়েকটা অফিশিয়াল চিঠি দিয়ে বান্ডিলগুলো আড়াল করার চেষ্টা করলেন। তাতে লাভ হলো না। উল্টো আরও ফুলে উঠল মানিব্যাগ।

মানিব্যাগের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে হোটেলঅলা বলল, 'এবার বেশ কামিয়েছেন, মশিউ'। প্রশ্ন নয়, বিবৃতির মত শোনাল কথাটা। পিনেট দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন। খানিক পরে শুভরাত্রি জানিয়ে নিজের ব্যাগটা নিয়ে চললেন দোতলায়, শোবার ঘরে।

করিডরে কার্পেট বিছানো, কয়েকটা টেবিলও পাতা আছে। তাতে ফ্লাওয়ার ভাসে ফুল, উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। ১২ নম্বর ঘরটা পিনেটের। তিনি মাত্র তালায় চাবি ঢুকিয়েছেন, এমন সময় আলো নিভে গেল। নীচতলায় সুইচবোর্ড, ওখান থেকেই ইলেকট্রিসিটি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। দীর্ঘ এক মিনিট অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো পিনেটকে। বাম দিকে মৃদু খচখচ শব্দে তাঁর কপালে ঘাম ফুটল, তিনি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। একটু পরে সিলিং-এর আলো জ্বলে উঠল। দরজা বন্ধ করে কপাটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক সেকেন্ড, চোখ বোলাচ্ছেন ঘরে।

ঘরটা সুন্দরভাবে সাজানো, অন্য সময় হলে ঘরের আরাম-আয়েশ ভালই উপভোগ করতেন পিনেট, কিন্তু এ মুহূর্তে সিঁটিয়ে আছেন। দ্রুত কাপড় ছাড়লেন তিনি। ব্যাগ খুলে একটা বই বের করলেন, তারপর ঘরের কোণের বেসিনে গিয়ে দাঁড়ালেন দাঁত মাজতে। বিছানায় ওঠার আগ মুহূর্তে কার যেন মৃদু পায়ের শব্দ পেলেন পিনেট। জানালা দিয়ে তাকালেন, হোটেলঅলা। পিনেটের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। গভীর আগ্রহে গাড়ি দেখছে। তারপর ঘুরে দাঁড়াল সে, দরজা বন্ধ করে ভেতরে ঢুকল। বিছানায় উঠে পড়লেন পিনেট।

উপন্যাসটা যাচ্ছেতাই। তাই পড়ায় মন বসল না। দারুণ ক্লান্তি লাগলেও ঘুমাতে ইচ্ছে করছে না মশিউ পিনেটের। বেডসাইড টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালানো থাকল। একটু পরে তন্দ্রামত এল তাঁর। হঠাৎ জেগে উঠলেন গাড়ির শব্দে। হোটেল থেকে কেউ গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে। একটু পরে মিলিয়ে এল ইঞ্জিনের শব্দ।

অস্বস্তিবোধ করলেন পিনেট। প্রবল ইচ্ছে হলো জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেন তাঁর গাড়িটা ঠিক ঠাক আছে কিনা। উঠতে যাচ্ছেন, হঠাৎ অস্পষ্ট খচমচ একটা শব্দ শুনতে পেলেন। সাথে সাথে তাঁর নার্ভগুলো টানটান হয়ে গেল। ধীরে ধীরে মাথা ঘোরালেন তিনি, শব্দের উৎস খোঁজার চেষ্টা করছেন। ঘড়ির দিকে একপলক তাকালেন পিনেট। দুটো বাজে। খচমচ শব্দটা আসছে হাতের কোণ থেকে। হাতের ওই কোণে টেবিল ল্যাম্পের আলো পৌঁছায়নি। এখন ঘরের আলো জ্বালতে হলে দরজার কাছে যেতে হবে পিনেটকে। আর খালি পায়ে কাজটা করার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি টেবিল ল্যাম্পটাকে কাত করে ধরলেন হাতের দিকে। ওখানে কিছু একটা আছে, তবে অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

টেবিলের দিকে হাত বাড়ালেন পিনেট চশমার জন্যে। কাজটা করতে তাঁকে ল্যাম্পটাকে খাড়া করতে হলো, আর হাতড়াতে গিয়ে শুনতে পেলেন মৃদু থপ করে একটা শব্দ হয়েছে বিছানার নীচে, কার্পেটে। চশমাটা পড়ে গেছে ওখানে। ঝুঁকলেন তিনি, হাত দুই দূরে চশমাটা, হাত বাড়ালেন চশমা তুলে নিতে।

ঠিক তখন হঠাৎ খচমচ শব্দটা আবার হলো, আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন পিনেট। দেখতে পেয়েছেন ছায়া শরীর নিয়ে জিনিসটা সিলিং বেয়ে নামছে, তাঁর কাছে চলে আসছে। চশমা ছাড়াও বোঝা গেল জিনিসটা কী, যদিও ওটার অস্তিত্ব স্বীকার করতে চাইল না মন।

রোমশ একটা জীব, পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম বিষাক্ত মাকড়সা ট্যারানটুলার কথা মনে করিয়ে দিল। গোল সুপ প্লেটের চেয়েও আকারে বড়, টেলিফোন তারের মত মোটা পা। সিলিং বেয়ে নেমে আসার সময় ওটার পা দেয়ালে ঘষা লেগে খচমচ শব্দ হচ্ছে, গলা থেকে অস্পষ্ট ঘরঘর একটা শব্দও বোধহয় শোনা গেল। এগিয়ে আসছে ওটা, টেবিল ল্যাম্পের আলোয় তীব্র ঘৃণা নিয়ে পিনেট দেখলেন, বাদামী লোমে ভরা মুখটা অশ্লীলভাবে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। লাঠি বা এ ধরনের অস্ত্রের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন তিনি। শুকনো জিভ টাকরায় লেগে আছে, চিৎকার যে করবেন সে অবস্থাও নেই। পাজামা ভিজে গেছে, কপাল থেকে বইছে ঘামের স্রোত। একবার চোখ বুজলেন তিনি, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকালেন। আশা করলেন চোখ মেলে দেখবেন আসলে এতক্ষণ স্রেফ একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। ওসব মাকড়সা-ফাকড়সার কোনও অস্তিত্ব নেই।

কিন্তু বিকট প্রাণীটাকে আরও কাছে আসতে দেখে তাঁর আশা নিভে গেল দপ করে। ওটার নীলচে চোখজোড়া স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বাথরুমে ভর্তা করে দিয়ে আসা জীবগুলোর মত স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। প্রবল ঘৃণা এবং ভয় নিয়েও বিস্ময়বোধ করলেন পিনেট। চোখ জোড়া যেন অবিকল হোটেলঅলার মত! থেমে দাঁড়াল জীবটা, তারপর লাফ মেরে নামল বিছানার ওপর। নাকে বিকট দুর্গন্ধ ঝাপটা মারল পিনেটের। বিশাল মাকড়সাটা ভয় ধরানো খচমচ শব্দ তুলে লম্বা পা ফেলে উঠে এল পিনেটের মুখে, তার মুখ এবং চোখ ঢেকে দিল চটচটে আঠাল শরীর দিয়ে। মুখ হাঁ করে একের পর এক চিৎকার দিতে শুরু করলেন মশিউ পিনেট।

'অদ্ভুত একটা কেস,' মশিউ পিনেটের ঘরের বেসিনে হাত ধোয়ার সময় বললেন ডাক্তার। 'ওনার হার্টের অবস্থা ভালই ছিল, তবে আকস্মিক কোন শকে মারা গেছেন। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে একটা ইনকুয়ারী দরকার।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি।

হোটেলঅলার বউ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল, ভীরু পায়ে নেমে গেল নীচে। নীচের বারে দাঁড়িয়ে হোটেলঅলা মুচকি মুচকি হাসছিল। সে টাকার মোটা একটা বান্ডিল ঢোকাল কাউন্টারের নীচে।

ওপরের ঘরে ছোট বাদামী রঙের একটা মাকড়সা, এক ইঞ্চির আটভাগের একভাগ হবে লম্বায়, মৃত লোকটির কপালের ওপর ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ডাক্তার এক ঝটকায় লাশের ওপর থেকে সরিয়ে দিলেন ওটাকে।

অশুভ যাত্রা

ডাইভারের ভঙ্গিতে শরীর টানটান করে দাঁড়িয়ে আছে রিচার্ড ক্লেটন। রূপোলি স্পেসশিপ 'ফিউচার' নিয়ে মহাশূন্যের অনন্ত যাত্রার উদ্দেশে ডাইভ দিতে যাচ্ছে সে। গভীর দম নিল রিচার্ড ক্লেটন, হাত বাড়াল সামনে। চোখ বুজে স্পর্শ করল ঠাণ্ডা ইস্পাতের লিভার। ইস্পাতের শীতল ছোঁয়ায় সামান্য কেঁপে উঠল শরীর। তারপর লিভারটা ধরে টান মারল নীচের দিকে।

এক সেকেন্ড কিছুই ঘটল না।

তারপরই হঠাৎ প্রবল একটা ঝাঁকুনি ওকে ছুঁড়ে ফেলল স্পেসশিপের মেঝেয়। নড়ে উঠেছে ফিউচার! সেই সাথে অদ্ভুত একটা শব্দে ভরে গেল ভেতরটা। যেন পাখি দ্রুত ডানা ঝাপটাচ্ছে কিংবা দেয়ালি পোকা একটানা গুঞ্জন তুলছে। শব্দটা একটানা বেজেই চলল। সেই সাথে অত্যন্ত দ্রুত লয়ে কাঁপতে থাকল ফিউচার। পাগলের মত এপাশ-ওপাশ দুলছে। ইস্পাতের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে খেয়ে ফিরছে গুঞ্জনটা। শব্দটা ক্রমে উঁচু হয়ে উঠল। হতবুদ্ধি হয়ে মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে থাকল রিচার্ড ক্লেটন। তারপর কোনমতে হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল সে। ফুলে ওঠা কপালে হাত বোলাতে বোলাতে ধপ্ করে বসল খুদে বাঙ্কে।

স্পেসশিপটা নড়ছে এখনও। ভয়ঙ্কর কাঁপুনিটা কমেনি একটুও। কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকাতেই দুঃখ, বিস্ময় এবং হতাশায় চোয়াল ঝুলে পড়ল তার। ঈশ্বর! প্যানেলটা গেছে। অস্ফুটে বলল ক্লেটন। প্রচণ্ড ধাক্কায় কন্ট্রোল প্যানেলটার কোনও অস্তিত্বই নেই। ভেঙেচুরে শেষ। ভাঙা কাঁচ পড়ে আছে মেঝেতে। ডায়ালগুলো প্যানেলের নগ্নমুখে এদিক-ওদিক ঝুলছে।

ক্লেটন হতাশ হয়ে বসে রইল ওখানেই। এরচে' করুণ অবস্থা আর কী হতে পারে? তার ত্রিশ বছরের স্বপ্ন এভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে তারই সামনে। দশ বছর বয়স থেকেই সে স্বপ্ন দেখে এসেছে একটা স্পেসশিপ তৈরি করবে, উড়ে যাবে অনন্ত অম্বরে। সেভাবেই নিজেকে গড়ে তুলেছিল ক্লেটন। কোটিপতি বাপের একটা পয়সাও এদিক-সেদিক করেনি। স্পেসশিপ তৈরি করার স্বপ্ন সফল করার জন্য প্রচুর পড়াশোনা করেছে, রাশানদের সাথে বন্ধুর মত মিশেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছে ওদের রকেটগুলো। প্রতিষ্ঠা করেছে ক্লেটন ফাউন্ডেশন। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ভাড়া করে এনেছে মেকানিক, অঙ্কশাস্ত্রবিদ, জ্যোতির্বিদ, প্রকৌশলী এবং শ্রমিক। দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর অবশেষে তৈরি হয়েছে তার স্বপ্নযান

'ফিউচার'। ছোট্ট, জানালাবিহীন ফিউচারে ভ্রমণের জন্য যা যা প্রয়োজন সবই ছিল। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এই যানে ছিল অক্সিজেন ট্যাংক, প্রচুর ফুড ক্যাপসুল এবং স্বচ্ছন্দে হাঁটাহাঁটি করার মত ছ'কদম জায়গাও। আর এই ছোট কেবিনটিই হয়ে উঠেছিল তার সকল স্বপ্নসাধ মেটানোর একমাত্র অবলম্বন। ক্লেটন চেয়েছিল ফিউচারে করেই সে স্বপ্নভূমি মঙ্গলগ্রহে পাড়ি জমাবে। সে-ই হবে মঙ্গলগ্রহে পদার্পণকারী প্রথম মানুষ। হিসেব করেও দেখেছে মঙ্গলে যেতে আসতে তার বিশ বছর সময় লাগবে। ঘণ্টায় হাজার মাইল বেগে ছুটবে ওর ফিউচার। সেভাবেই সব ঠিকঠাক করা হয়েছিল। পুরো প্যানেল সিস্টেমটাই করা হয়েছিল স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলার জন্য। কিন্তু শুরুতেই এ কী বিপত্তি!

'এখন আমি কী করব?' ক্লেটন ভাঙা কাঁচগুলোর দিকে তাকিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। বাইরের পৃথিবীর সাথে তার সকল সম্পর্ক এখন বিচ্ছিন্ন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ভাঙা বোর্ডে সে না দেখতে পারবে সময় না দূরত্ব, না বুঝতে পারবে গতি। এই ছোট্ট, বদ্ধ কেবিন ছেড়ে বাইরে যাওয়ার কোনও উপায়ই নেই। এখানেই হয়তো ওকে বছরের পর বছর বসে থাকতে হবে। একা। নিঃসঙ্গ। নিজেকে সে অন্য কাজে ব্যস্ত রাখবে তারও উপায় নেই। পড়ার মত বইপত্র কিংবা খবরের কাগজ নেই, নেই খেলাধুলার সরঞ্জাম। মহাশূন্যের বিশাল গহ্বরে এক কয়েদী যেন সে এখন।

পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে এসেছে রিচার্ড ক্লেটন। পৃথিবীটাকে এখন সবুজ আগুনের একটা গোলার মত লাগছে। দ্রুত তাকে পেছনে ফেলে সামনে এগোচ্ছে ফিউচার। এগিয়ে যাচ্ছে আরেক আগুনের গোলার দিকে–মঙ্গল যার নাম।

ক্লেটন মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখল মহাশূন্যে ওর উত্থানপর্বের দৃশ্যটি। দেখল কমলা রঙের আগুন জ্বেলে ফিউচার ঘন সাদা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বুলেটের গতিতে শূন্যে চলেছে। অসংখ্য লোক হাঁ করে দেখছে তার মহাশূন্য যাত্রা। মৌমাছির ঝাঁকের মত ভিড় সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ওর সহকারী জেরী চেজ। সবাই অবাক হয়ে দেখছে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শূন্যে মিলিয়ে গেছে ফিউচার। লোকজন এখন নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে আলোচনা করতে করতে ঘরে ফিরছে। কিন্তু কিছুদিন পর ওর কথা তাদের আর মনেও থাকবে না। অথচ তাকে, রিচার্ড ক্লেটনকে, এই উড়োজাহাজেই থাকতে হবে বিশটা বছর।

হ্যাঁ, থাকতে হবে। কোনও বিকল্প নেই। কিন্তু এই কাঁপুনি থামবে কখন? ভাবছে ক্লেটন। কাঁপুনি ইতোমধ্যেই অসহনীয় হয়ে উঠেছে। ফিউচার যখন তৈরি করা হয় তখন এরকম কোনও ভাইব্রেশনের কথা তার কিংবা বিশেষজ্ঞদের কারও মাথাতেই আসেনি। তা হলে নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

নেয়া হত। কিন্তু এই কাঁপুনি যদি আর না থামে? যদি কুড়িটা বছর ধরেই ফিউচার এভাবে কাঁপতে থাকে? ভাবতেই আতঙ্কে হিম হয়ে যায় ক্লেটন।

বাঙ্কে শুয়ে শুয়ে ভাবছে রিচার্ড ক্লেটন। শৈশব থেকে বর্তমান পর্যন্ত ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনা বিশদভাবে মনে পড়ে যাচ্ছে। তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে সব ঘটনা মনে পড়ে যাওয়ায় নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠল সে। ভেবেছিল এভাবে অন্তত কিছুটা সময় পার করা যাবে। এই দীর্ঘ সময় কাটাবে কীভাবে ভাবতেই শিরশির করে ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে।

'আমি অন্তত ব্যায়ামও তো করতে পারি' চিৎকার করে বলল ক্লেটন। উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। ছ'কদম সামনে, ছ'কদম পেছনে। কিন্তু শিগ্‌গিরই একঘেয়ে হয়ে উঠল এ হাঁটাহাঁটি। দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্লেটন। এগোল ফুড-স্টোর কেবিনেটের দিকে। একটা ফুড ক্যাপসুল বের করে মুখে দিয়ে গিলে ফেলল—সংক্ষিপ্ত খাবার। 'এমনকী খাওয়ার জন্যেও আমাকে সময় ব্যয় করতে হচ্ছে না। স্রেফ মুখে দিয়ে গিলে ফেললেই হলো।' শঙ্কিত মনে ভাবল সে। ওর মুখ থেকে কখন উবে গেছে হাসি। ফিউচারের কাঁপুনি ওকে যেন পাগল করে ছাড়বে। অস্থির হয়ে সে শুয়ে পড়ল বাঙ্কে, ঘুমাবার চেষ্টা করল। ঘুম এলে হয়তো এই বিশ্রী, একঘেয়ে গুঞ্জন ও কাঁপুনির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে। বাতি নিভিয়ে দিল ক্লেটন। চোখ বুজে নিজের বন্দীদশার কথা ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়েও পড়ল।

ঘুম ভাঙার পর প্রথমেই ক্লেটনের মনে প্রশ্ন জাগল, এখন দিন না রাত। কিন্তু স্পেসশিপের মধ্যে দিনরাত্রির তফাত বোঝার উপায় নেই। এখানে দিনও নেই, রাতও নেই। আছে শুধু স্নায়ুকে যন্ত্রণা দেয়া একঘেয়ে শব্দটা। মস্তিষ্ক কুরে কুরে খাওয়া দুঃসহ শব্দটা। বাঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ক্লেটন দেখল ওর পা কাঁপছে। টলতে টলতে এগুলো সে কেবিনেটের দিকে। ফুড ক্যাপসুল গিলল কয়েকটা।

আবার বাঙ্কে এসে বসল ক্লেটন। ভীষণ নিঃসঙ্গ লাগছে। পরিচিত অপরিচিত সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন সে এখন। অথচ এখানে করার মত কিছুই নেই। জেলখানার নিঃসঙ্গ কয়েদীদের চেয়েও খারাপ অবস্থা তার। ওরা বরং ওর এই সেলের চেয়ে বড় জায়গায় থাকে, সূর্যের আলো উপভোগ করতে পারে; প্রাণভরে শ্বাস নিতে পারে তাজা বাতাসে। আর দু'একজন হলেও মানুষের দেখাও পায় তারা। কিন্তু তার অবস্থা! সম্পূর্ণ বিশ্ব সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন এক গুহাবাসী যেন সে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব চিন্তা পেয়ে বসছে ওকে। জীবন্ত কাউকে, কোনও একটা কিছু দেখার তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব করছে সে নিজের অন্তরে। সামান্য একটা জ্যান্ত পোকার দেখা পেলেও জীবনের সমস্ত সম্পদ তাকে দিতে পারে এখন ক্লেটন। শুধু একটু প্রাণের স্পন্দন দেখতে

চায় ও।

এই লাগাতার একঘেয়ে শব্দ ও অসহ্য ঝাঁকুনি সয়ে যাওয়া, মেঝেতে গুনে গুনে পা ফেলা, ক্যাপসুল খাওয়া আর ঘুমানো ব্যস, এ ছাড়া আর কিছু করার নেই ক্লেটনের। ভাবনাগুলোও যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। একসময় হঠাৎ হাতের নখ কাটার প্রবল ইচ্ছে পেয়ে বসল তাকে। প্রচুর সময় ব্যয় করে কাজটা সারল সে। কিন্তু নখ কেটে কি সময় পার করা যায়? আর কোনও কাজ না পেয়ে সে এবার তীক্ষ্ণ চোখে নিজের জামাকাপড়গুলো পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছোট্ট আয়নাতে নিজের শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখখানা দেখে গেল সে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কেবিনের প্রতিটি জিনিস দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কিন্তু তারপরও ঘুম আসার মত ক্লান্তি অনুভব করল না।

মাথাটা দপদপ করতে লাগল ক্লেটনের। চিনচিনে একটা ব্যথা। মনে হচ্ছে এই জীবনে ব্যথাটা থেকে রেহাই মিলবে না। ঘুম আসছে না, তবুও বাঙ্কে গিয়ে শুলো সে। শুয়ে জোর করে চোখ বুজল। আস্তে আস্তে তন্দ্রার মত এল। কিন্তু ফিউচারের ঝাঁকুনিতে বারবার কেঁপে উঠল শরীর, তন্দ্রার ভাবটা কেটে গেল বারবার, একসময় পুরোপুরি জেগে গেল সে। বাঙ্ক ছেড়ে উঠে আলো জ্বালল ক্লেটন। এবং আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ করল সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে।

'সময় হচ্ছে আপেক্ষিক' বন্ধুরা সবসময় বলত ক্লেটনকে। এখন সে হাড়ে হাড়ে কথাটার সত্যতা টের পাচ্ছে। সময় জানবে, এমন কোনও কিছুই নেই ওর কাছে। না আছে ঘড়ি, না অন্যকিছু। এমনকী চাঁদ কিংবা সূর্যের চেহারা দেখারও কোনও উপায় নেই। কতসময় ধরে এই স্পেসশিপে আছে সে? প্রাণপণে চেষ্টা করল ক্লেটন মনে করতে। কিন্তু পারল না।

আচ্ছা সে কি প্রতি ছয় ঘণ্টা অন্তর খাবার খেয়েছে নাকি দশ ঘণ্টা অন্তর? অথবা বিশ ঘণ্টা পরপর? প্রতিদিন কি সে একবার করে ঘুমিয়েছে নাকি তিন অথবা চারদিনে মাত্র একবার ঘুমিয়েছে? সে ক'বার হাঁটাহাঁটি করেছে মেঝেতে?

ব্যাপারটা খুব ভয়াবহ। সে যদি সত্যি সত্যি সময়ের হিসেব গুলিয়ে ফেলে তা হলে তো মহাসর্বনাশ হবে। এই মহাশূন্যে, স্পেসশিপে যেখানে অজানার উদ্দেশে উড়ে চলেছে, সেখানে তো সে অচিরেই পাগল হয়ে উঠবে। একা, এই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তাকে কিছু না কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকতেই হবে। আবার ভাবনটা ফিরে এল ওর মধ্যে।

এখন সময় কত?

কিন্তু এই পাগল করা চিন্তা নিয়ে আর ভাবতে চায় না ক্লেটন। সে এখন

অন্যকিছু ভাবতে চায়। অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চায়। যে পৃথিবী ছেড়ে ও চলে এসেছে সেই দুনিয়া এখন সে ভুলে থাকতে চায়। নয়তো পেছনের স্মৃতি ওকে আরও চরমে পৌঁছে দেবে।

'আমি ভয় পাচ্ছি,' ফিসফিস করে বলল ক্লেটন। 'মহাশূন্যের এই অন্ধকারে একা থাকতে ভয় লাগছে আমার। হয়তো আমি এতক্ষণে চাঁদকে পেছনে ফেলে এসেছি। হয়তো পৃথিবী থেকে এখন দশ লক্ষ মাইল দূরে চলে এসেছি।'

ক্লেটন হঠাৎ বুঝতে পারল, নিজের সাথে একা একা কথা বলে চলেছে সে। পাগলামির লক্ষণ! তবুও কথা বলে যাবে সে। থামবে না। এভাবে কথা বলে অন্তত ওর চারপাশ ঘিরে থাকা ভয়ঙ্কর গুঞ্জনের হাত থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পাবে।

'আমি ভয় পাচ্ছি' ক্লেটনের ফিসফিসানি ছোট্ট ঘরটিতে যেন প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল। আমি ভীষণ ভয় পাচ্ছি। আচ্ছা, এখন কটা বাজে? একনাগাড়ে এভাবে কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ক্লেটন। চোখ বুজে এল। আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙলে নিজেকে বেশ তাজা মনে হলো তার। 'আমি আসলে হঠাৎ বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম,' আপন মনে বলল সে। আসলে স্পেসশিপের ক্রমাগত, একঘেয়ে শব্দটা ওর স্নায়ুগুলোকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গেছে। ভেতরের অক্সিজেনের চাপে ওর মাথা ঝিমঝিম করছে, হতবুদ্ধি মনে হয়েছে নিজেকে। হয়তো ক্যাপসুলগুলো প্রয়োজনের তুলনায় বেশিই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে শরীর আর দুর্বল ঠেকছে না তার। হাসি ফুটল ক্লেটনের মুখে। পায়চারী শুরু করল মেঝের ওপর। আর পায়চারী করতে করতে সেই ভাবনাটা আবার পেয়ে বসল তাকে। আজ কী বার? যাত্রা শুরুর পর ক'সপ্তাহ কেটেছে? হতে পারে এক মাস চলে গেছে; কিংবা একবছর অথবা দু'বছর? পৃথিবী থেকে অনেক দূরে নিশ্চয়ই এসে পড়েছে সে? কেমন জানি স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হচ্ছে সবকিছু। ক্লেটনের মনে হলো ওর ফিউচার এখন মঙ্গলগ্রহের কাছাকাছি চলে এসেছে। পেছনের কথা বাদ দিয়ে সামনে কী ঘটতে পারে তাই নিয়ে ভাবতে লাগল ক্লেটন।

সময় যাবার সাথে সাথে সবকিছুর একটা রুটিনও স্থির হয়ে গেল। অভ্যাসমত পায়চারী করছে ক্লেটন। ক্লান্ত হয়ে পড়লে ক্যাপসুল খেয়ে শুয়ে পড়ছে। এক সময় ঘুমিয়েও পড়ছে, ঘুম থেকে জেগে আবার পায়চারী করছে।

রিচার্ড ক্লেটন ধীরে ধীরে পরিবেশ এবং নিজের শরীর সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে যেতে লাগল। মাথার ভেতর একঘেয়ে শব্দটা যেন ওর শরীরেরই একটা অংশ হয়ে উঠল। আর এই শব্দটাই যেন ওকে জানান দিয়ে চলল সে একটা

স্পেসশিপে ছুটে চলেছে মহাশূন্যের পথ ধরে। ক্লেটন এখন আর নিজের সাথে একা একা কথাও বলে না। নিজেকে সে যেন সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে। ওর চোখে এখন একটাই স্বপ্ন—মঙ্গলগ্রহ। স্পেসশিপটা যেন তার প্রতিটি ঝাঁকুনির সাথে একভাবে বলে চলেছে *মঙ্গল—মঙ্গল—মঙ্গল*।

হঠাৎ একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। রিচার্ড ক্লেটন বুঝতে পারল সে ল্যান্ড করতে চলেছে। ফিউচারের নাক নিচু হয়ে গেল, নীচের দিকে কাঁপতে কাঁপতে নামতে লাগল স্পেসশিপ। লালরঙের গ্রহটার সবুজ তৃণভূমির দিকে তার যন্ত্রযান এগিয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে। ক্লেটন টের পাচ্ছে তার যানের গতি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণের টানে ধীরে ধীরে নামছে।

অবতরণ করল ফিউচার। স্পেসশিপের দরজা খুলে ক্লেটন বেরিয়ে এল বাইরে, বেগুনি লাল রঙের ঘাসে আলতো করে পা ফেলল। শরীর বেশ ঝরঝরে আর হালকা লাগল। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দেয়া সূর্যালোক পৃথিবীর চেয়ে প্রখর ও উজ্জ্বল লাগল।

কিছু দূরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ বনভূমি। বড় বড় গাছে ঝুলে আছে লাল রঙের রসালো ফল। ক্লেটন জাহাজ ছেড়ে এগোল জঙ্গলের দিকে। কী চমৎকার ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। ওর খুব ভাল লাগল। ওকে দেখেই যেন সারির প্রথম গাছটি মাটির দিকে ঝুঁকে থাকা 'হাত' দুটো তুলে সম্ভাষণ জানাল।

হাত—এখানে গাছেরও হাত আছে! দুটো সবুজ হাত এগিয়ে এল ক্লেটনের দিকে। সাপের মত লম্বা আর মসৃণ হাত দুটো দিয়ে গাছটা ওকে আঁকড়ে ধরল, তুলে ফেলল শূন্যে। শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরেছে হাতদুটো। গুঁড়ির সাথে গাছটা চেপে ধরল তাকে। অসম্ভব বিস্ময়ে ক্লেটন দেখল দূর থেকে যেগুলোকে লালরঙের ফল মনে করেছিল সেগুলো আসলে ওদের মাথা। এবং রংটাও পুরোপুরি লাল নয়। বেগুনি ভাব আছে একটা।

বেগুনি লাল রঙের ভয়ঙ্কর মাথাগুলো মরা ছত্রাকের মত চোখ তুলে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে ক্লেটনের দিকে। প্রতিটি মুখে বাঁধাকপির মত ভাঁজ। থকথকে, নরম মাংসপিণ্ডের মত লাগছে দেখতে। বিশাল হাঁ করে আছে সব ক'টা। ক্ষুধার্ত ভঙ্গি। যেন ওকে চিবিয়ে খাবে। হঠাৎ সবুজ হাতগুলো ওকে জ্যান্ত, ঠাণ্ডা গুঁড়ির সাথে আরও শক্ত করে চেপে ধরল, ক্লেটন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল বেগুনি লাল রঙের একটা মুখ—মুখটা দেখতে অনেকটা মেয়েদের মত—নড়ে উঠেছে। মুখটা বাড়িয়ে দিচ্ছে চুম্বনের ভঙ্গিতে, যেন আগ্রাসী চুমু খাবে।

ভ্যাম্পায়ারের চুম্বন! রক্তাক্ত, ফাঁক করা ঠোঁট দুটো দেখে ক্লেটনের তাই মনে হলো। মুখটা এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ক্লেটন পাগলের মত ধস্তাধস্তি শুরু করল। কিন্তু হাতগুলো ওকে চেপে ধরে রইল। নেমে এল মুখটা ওর

মুখের ওপর। চুম্বন করল। প্রচণ্ড ছ্যাঁকা খেল ক্লেটন। মনে হলো কেউ বরফ ঠেসে ধরেছে মুখে। হিমশীতল স্পর্শে হঠাৎ ক্লেটনের দুনিয়া অন্ধকার হয়ে এল।

এ অবস্থা থেকে একসময় জেগে উঠল রিচার্ড ক্লেটন। জেগে উঠেই বুঝতে পারল আসলে স্বপ্ন দেখছিল সে এতক্ষণ। ঘামে ভিজে গেছে সমস্ত শরীর। মুখটা দেখার জন্য বাঙ্ক ছাড়ল। এগিয়ে গেল আয়নার দিকে। তাকাল। ভয়ানক চমকে উঠল। একী দেখছে সে? কাকে দেখছে? নাকি এখনও স্বপ্নই দেখছে!

বৃদ্ধ একটা লোক তাকিয়ে আছে আয়নায়। সারামুখে বলিরেখা, দাড়ির জঙ্গলে প্রায় ঢেকে আছে। ফুলোফুলো গাল ভেতরের দিকে ডেবে গেছে। চোখ দু'টোর অবস্থা সবচে' ভয়াবহ। চোখ দেখে ক্লেটনের বিশ্বাসই হতে চাইছে না ও দুটো তার নিজের চোখ! কোটরের মধ্য থেকে লাল টকটকে দুটো চোখ অসম্ভব ভয় পাওয়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। হাত দিয়ে মুখটা স্পর্শ করল সে, আয়নার মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পেল হাতে নীল নীল শিরা জেগে উঠেছে। মাথার চুল ধূসর। ক্লান্তভাবে সে চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিল।

রিচার্ড ক্লেটন বুড়ো হয়ে গেছে!

কতদিন! কে জানে কত বছর ধরে মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে সে। নিশ্চয়ই অনেক বছর হবে। নইলে শরীরের এত পরিবর্তন হয় কীভাবে? বর্তমানের এই অস্বাভাবিক জীবনই ওর বয়স বাড়িয়ে দিচ্ছে দ্রুত। এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দারুণ ব্যাকুলতা অনুভব করল ক্লেটন। আরও ভয়াবহ কোনও স্বপ্ন দেখার আগেই তাকে এই অশুভ যাত্রা শেষ করতে হবে। সময়ের অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সমস্ত মানসিক এবং দৈহিক শক্তি সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। টলতে টলতে বাঙ্কে ফিরে এল ক্লেটন। ভীষণভাবে কাঁপছে। নক্ষত্রলোকের অন্ধকার ভেদ করে ফিউচার তার নিজস্ব গতিতে ছুটে চলল।

হঠাৎ ক্লেটনের মনে হলো বিশাল হাতুড়ি দিয়ে কারা যেন দমাদম দরজায় আঘাত করছে। প্রচণ্ড শক্তিতে বাড়ি মেরেই চলেছে। হঠাৎ এক সময় ভেঙে পড়ল দরজাটা। ভীষণ চেহারার কয়েকটা মূর্তি ঢুকল ভেতরে। ধাতব মূর্তি। ওরা এসেই দু'দিক থেকে ক্লেটনকে বজ্রমুষ্ঠিতে আঁকড়ে ধরে টেনে নিয়ে চলল বাইরে। লোহার মেঝের ওপর দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে ওকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে দানবগুলো। ওদের ধাতব পায়ের আওয়াজ উঠছে লোহার মেঝেয়। ইস্পাতের তৈরি বিশাল এক যানের সামনে দানবগুলো নিয়ে এল ওকে। যানটা দেখতে মিনারের মত। লোহার ঘোরানো সিঁড়ি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠে গেছে ওপরে। ওরা ক্লেটনকে নিয়ে সেই ধাতব সিঁড়ি

বেয়ে উঠতে শুরু করল।

কিন্তু এ ওঠার যেন কোন শেষ নেই। উঠছে তো উঠছেই। সেই সাথে ধাতব পায়ের একটানা আওয়াজ উঠছে–ঢং, ঢং, ঢং। ধাতব মুখ কখনও ঘামে না। ধাতব মানুষ কখনও ক্লান্ত হয় না কিন্তু ক্রেটন তো ধাতব নয়, রক্তমাংসের মানুষ। প্রচণ্ড হাঁফিয়ে গেছে সে, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর। তবু তাকে টেনে নিয়ে চলল দানবগুলো। দীর্ঘসময় পরে অবশেষে শেষ হলো উত্থানপর্ব। চুড়োয় উঠে টাওয়ার রুমের ভেতরে ওরা ছুড়ে ফেলল তাকে। তারপর তাদের ধাতব কণ্ঠ খনখন করে উঠল, গ্রামোফোনের ভাঙা রেকর্ডের মত।

'হে–প্রভু–তাকে–আমরা–একটা–পাখির–মধ্যে–পেয়েছি।'

'তার–শরীর–নরম–বস্তু–দিয়ে–তৈরি।'

'সে কোনও–আশ্চর্য–উপায়ে–বেঁচে–আছে।'

'সে–একটা–প্রাণী।'

তারপর একটা গুমগুম শব্দ উঠে এল টাওয়ার রুমের মাঝখান থেকে।

'আমি ক্ষুধার্ত।'

মেঝে থেকে অকস্মাৎ উদয় হলো একটা লোহার সিংহাসন। এ হলো ধাতব দানবদের প্রভু। জিনিসটা বিরাট আকৃতির লোহার একটা চোরাগর্ত। গর্তের চারদিকে ঘিরে আছে বেলচা আকৃতির ভয়ঙ্কর দু'টো চোয়াল। চোয়াল দুটো ক্লিক করে ফাঁক হয়ে গেল, ঝকমক করে উঠল ক্ষুরধার দাঁতের সারি। গর্তের গভীর থেকে গমগমে কণ্ঠটা ভেসে এল, *'আমাকে খেতে দাও।'*

ধাতব দানবরা ক্রেটনকে ধরে ছুঁড়ে মারল সেই হাঁ করা বিশাল গর্তের মধ্যে। বিশাল চোয়াল দুটো তৎক্ষণাৎ সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল, তীক্ষ্ণধার দাঁতগুলো বসে গেল মাংসল দেহে...

প্রচণ্ড চিৎকার করে জেগে উঠল ক্রেটন। কাঁপা হাতে আলো জ্বালল, তাকাল আয়নায়। ওর বেশিরভাগ চুল সাদা হয়ে গেছে। আগের চেয়েও বুড়ো দেখাচ্ছে। ক্রেটন অবাক হয়ে ভাবল এভাবে একটার পর একটা দুঃস্বপ্নের ধাক্কা ওর মস্তিষ্ক আর কত সইতে পারবে।

ফুড ক্যাপসুল খাওয়া, কেবিনে হাঁটাহাঁটি, একঘেয়ে শব্দটা শোনা, আর বাঙ্কে শুয়ে পড়া–ব্যস, এ ছাড়া আর কিছু নেই রিচার্ড ক্রেটনের জীবনে, আর শুধু বসে বসে অপেক্ষার প্রহর গোনা। এভাবে কতযুগ অপেক্ষার প্রহর গুনতে হবে জানে না সে।

দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে–দিনের হিসেব রাখে না ক্রেটন। আর ঘোরের মধ্যে একটার পর একটা দুঃস্বপ্ন দেখে যেতে লাগল। প্রতিটি দুঃস্বপ্নের পর জেগে উঠে আতঙ্কিত চোখে সে লক্ষ করে বয়স আরও বেড়ে

গেছে তার। শরীর দুর্বল হয়ে পড়ছে দ্রুত। কখনও কখনও সে ভীত হয়ে ভাবে যাত্রা শুরুর আগে যে হিসেব নিকেশ সে করেছিল তাতে নিশ্চয়ই মারাত্মক কোনও ভুল থেকে গিয়েছিল। হয়তো সে সৌরমণ্ডলের চারদিকেই ক্রমাগত ধীর গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয়তো সে জীবনেও মঙ্গলে পৌঁছুতে পারবে না। পরক্ষণে মনে অশুভ চিন্তাটা খেলে যায়–যদি এমন হয়, সে মঙ্গলও পার হয়ে এসেছে, সৌরজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখন মহাশূন্যের অনির্দিষ্ট গন্তব্যে ছুটে বেড়াচ্ছে!

চিন্তা করতে করতে মাথা গুলিয়ে আসে ক্লেটনের। আর ভাবতে পারে না সে, ক্যাপসুল খেয়ে শুয়ে পড়ে বাঙ্কে। মাঝে মাঝে পৃথিবীর কথা মনে পড়ে তার, শঙ্কিত হয়ে পড়ে। পৃথিবী কি এখনও বেঁচে আছে? অস্তিত্ব লোপ পায়নি তো তার? এমনও হতে পারে পারমাণবিক যুদ্ধে পুরো পৃথিবী এক বিরাট ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছে। অথবা বিরাট কোনও উল্কার আঘাতে শেষ হয়ে গেছে সাধের ধরিত্রী। কিংবা এমনও ঘটা বিচিত্র নয় নক্ষত্রলোক থেকে ছুটে আসা মৃত্যুরশ্মির আঘাতে ধ্বংস হয়ে গেছে দুনিয়া। ভয়াবহ সব আশঙ্কা ঘিরে রাখে ক্লেটনকে। কখনও ভাবে গ্রহান্তরের প্রাণীরা পৃথিবী দখল করে নেয়নি তো? কিন্তু এসব তার ক্ষণিকের ভাবনা। সবসময় তার মন জুড়ে থাকে কীভাবে, কবে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছুবে। স্বপ্নের মঙ্গলকে না দেখে মরেও তো শান্তি পাবে না সে। তাকে বেঁচে থাকতেই হবে।

এমনি করে কেটে যেতে লাগল সময়। ক্লেটনের প্রায়ই মনে হত স্পেসশিপের বাইরে থেকে কারও যেন কণ্ঠ ভেসে আসছে। মহাশূন্যের বিকট অন্ধকার থেকে ভেসে আসছে ভৌতিক আর্তনাদ। দুঃস্বপ্নেরা ফিরে ফিরে এল তার কাছে। এরমধ্যে কতদিন, কতঘণ্টা পেরিয়ে গেছে জানে না ক্লেটন। কিন্তু যখনি আয়নার দিকে তাকায়, ক্লেটন দেখতে পায় তার বয়স আরও দ্রুত বেড়ে চলছে। চুল বরফের মত সাদা, মুখ ভরে গেছে বলিরেখায়। সুস্থভাবে কিছু চিন্তা করারও শক্তি পাচ্ছে না সে। স্পেসশিপের একঘেয়ে, যন্ত্রণাদায়ক কাঁপুনি ও শব্দের মধ্যে মড়ার মত পড়ে আছে সে। কিন্তু এখনও বেঁচে আছে।

ঘটনাটা যে কী ঘটল প্রথমে ভাল করে বুঝতে পারেনি ক্লেটন। চোখ বুজে নিশ্চল শুয়েছিল সে। হঠাৎ অনুভব করল অবিশ্রাম কাঁপুনিটা আর নেই। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! ক্লেটন ভাবল, এবারও সে নির্ঘাত স্বপ্নই দেখছে। চোখ ঘষতে ঘষতে কোনমতে বিছানায় উঠে বসল ক্লেটন। ভাল করে তাকিয়ে বুঝল–না, ফিউচার নড়ছে না। নিশ্চয়ই সে ল্যান্ড করেছে।

ফিউচারের কম্পন থেমে গেলেও ক্লেটনের শরীরের কাঁপুনি থামেনি। বছরের পর বছর একাধারে কম্পনের ফল এটা। উঠে দাঁড়াতে ভয়ানক কষ্ট

হলো ক্লেটনের। কিন্তু এখন যে তাকে উঠতেই হবে। সময় এসেছে। এ মুহূর্তটির জন্য সে এতগুলো বছর অপেক্ষা করেছে। তার স্বপ্ন এখন সফল হয়েছে। তার ফিউচার ল্যান্ড করেছে। অসম্ভবকে সম্ভব করেছে সে।

টলতে টলতে দরজার দিকে এগোল ক্লেটন। দরজার হাতলটা প্রবল উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ওপরের দিকে তুলল। খুলে গেছে দরজা। ঝকঝকে সূর্যের আলো এসে চোখে বাড়ি মারল। শরীর ছুঁয়ে গেল বাতাস। আলোতে চোখ যেন ঝলসে গেল ক্লেটনের। বুক ভরে শ্বাস টানল–পা বাড়াল বাইরে–

ক্লেটন সোজা গিয়ে বাধা পড়ল তার সহকারী জেরী চেজের আলিঙ্গনের মধ্যে। চেজ বিস্মিত দৃষ্টিতে ক্লেটনের অসম্ভব রোগা, নিস্তেজ চেহারার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কে? মি. ক্লেটন কোথায়?' তারপর ভাল করে মুখের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল সে। 'আ...হায়...মি. ক্লেটন...। কিন্তু আপনার একী দশা, সার? আপনি যখন যাত্রা শুরু করলেন তখনই বিস্ফোরণটা ঘটল। স্পেসশিপ এই জায়গা ছেড়ে নড়তেই পারেনি। কিন্তু ভয়ানক কাঁপছিল বলে আপনাকে উদ্ধার করতে যেতে পারছিলাম না আমরা। এই একটু আগে কাঁপুনি থেমেছে। কিন্তু আপনার কী হয়েছে, সার? এমন লাগছে কেন আপনাকে?'

ফ্যাকাসে নীল চোখ জোড়া খুলে গেল ক্লেটনের। কথা বলার সময় ঝাঁকি খেল শরীর, ফিসফিসিয়ে অস্ফুটে বলল, 'আ–আমি সময়ের হিসেব হারিয়ে ফেলেছিলাম, কত–কতদিন আমি ফিউচারে ছিলাম?'

বৃদ্ধ লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে জেরী চেজের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। আস্তে করে বলল, 'মাত্র এক সপ্তাহ; সার।'

আস্তে চোখ দু'টো বন্ধ হয়ে এল, সামান্য কেঁপে স্থির হয়ে গেল দেহটা। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে রিচার্ড ক্লেটন তার অশুভ যাত্রার সমাপ্তি ঘটিয়ে।

শূন্য

সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে একঠায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ক্রামার, কিছু শোনার চেষ্টা করল, তার পেছনের রাস্তাটা খালি এবং নির্জন, মিশে গেছে দিগন্তরেখার সাথে। যেন কার্ডবোর্ডের ওপর চকখড়ির একটা হালকা দাগ। মাথার ওপরে শুকনো, স্থির বাতাসে নিঃসঙ্গ একটা কিলোটা চক্কর দিচ্ছে, খুঁজছে শিকার। নেই, ওকে কেউ অনুসরণ করার কোনও চিহ্ন নেই।

ক্রামার ওর জিনিসপত্রগুলো আবার চেক করলঃ ক্যান্টিন, খাবারের ট্যাবলেট, স্যান্ড মাস্ক, আর সবচে' মূল্যবান বস্তুটি–ম্যাপ। ছোট অয়েলস্কিন থলের মধ্যে রাখা প্রাচীন ম্যাপটার দিকে চোখ বুলাতেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সে।

সোমবার। সকাল ১১:১৪। ঘড়ি দেখল ক্রামার। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ঠিক এগারো দিনের দিন সে 'ক্যানাল টোয়েন্টি এইট নর্থ ওয়েস্ট'-এ পৌঁছুবে। তারপর আর অসুবিধে নেই। জাল পাসপোর্ট দেখিয়ে সহজেই ক্রেটার সিটি পোর্টে ঢুকে যাবে ক্রামার। প্রতিদিন দুপুরের নিয়মিত 'আর্থ এক্সপ্রেস'-এ চড়ে সে পগার পার হবে। ব্লানচার্ডের বাপেরও সাধ্য নেই বুঝতে পারে ওই পথে সে পালিয়েছে। মাসখানেক আগে যখন প্ল্যানটা করল ক্রামার তখনই প্রতিটি ডিটেইল সে পরীক্ষা করেছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, ঘড়ির কাঁটা ধরে এগিয়েছে সমস্ত কাজ।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল ক্রামার, আনমনে গুণছেঃ ছাপ্পান্ন, সাতান্ন, আটান্ন। লেভেল ওয়ান। কালের আঁচড়ে মলিন, অস্পষ্ট সাইনবোর্ডটা হঠাৎ চোখে পড়লঃ

এই খালে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ
আদেশক্রমে
জারা

নামটা পড়ে অবাক হলো ক্রামার। জারা, ইতিহাস বইতেই শুধু এই নামটা দেখেছে সে। জারা, মার্শিয়ান রাজত্বের শেষ সম্রাট, বিস্মৃত হয়েছে কবে। ক্রামার মনে করার চেষ্টা করল তৃতীয় নাকি চতুর্থ সম্রাটের সময় এই খালগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

একশো আটাশ, একশো উনত্রিশ। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম লেভেল। আরেলিয়াম স্টীলের তৈরি প্রকাণ্ড এক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ক্রামার। টর্চের আলোতে দ্বিতীয় সাইনবোর্ডটা যেন ভেঙচি কাটল ওকেঃ

পকেট থেকে একটা চাবি বের করল ক্রামার। খুব সাবধানে রাজকীয় সীলটা তুলল, চাবি তালায় ঢুকিয়ে মোচড় দিল। আস্তে খুলে গেল দরজা।

ভেতরে ঢুকল ক্রামার। সতর্কতার সাথে সীলটাকে আবার আগের জায়গায় লাগাল। ওর অনুপ্রবেশের কোনও চিহ্নই আর থাকল না। নিঃশব্দ হাসিতে ভরে উঠল ক্রামারের মুখ।

ক্যানাল গ্র্যান্ড–উত্তর আর দক্ষিণ মঙ্গলগ্রহের মধ্যে যোগসূত্রতার প্রধান ধমনী। ক্যানাল গ্র্যান্ড মিশেছে শূন্যে, ওর পলায়নের উৎকৃষ্ট পথ। ক্রামার জানে পৃথিবীর কোনও মানুষ কিংবা মার্শিয়ান কখনও শূন্যে অভিযানে বেরোয়নি, ওখানে গেলেও কেউ ফিরে আসেনি কোনওদিন। শূন্য যেন এক বিশাল দানব। গ্রাস করে সবাইকে। আজও শূন্যকে নিয়ে বহু গল্পকথা প্রচলিত, বেশিরভাগই হয়তো কুসংস্কার থেকে উদ্ভূত, কিন্তু এটা ঠিক শূন্যে এ পর্যন্ত যে-সব অভিযান চালানো হয়েছে, পাঠানো হয়েছে রকেট শিপ, প্লেন ইত্যাদি–কোনটারই আর সন্ধান মেলেনি। শূন্য, একা এবং বিশাল, লাল রঙের গ্রহটাকে দুই ভাগে ভাগ করে অবিচল দাঁড়িয়ে আছে।

দ্রুত সামনে পা বাড়াল ক্রামার। ওর পরনে গরম, আরামদায়ক স্পেসসুট, মাথায় হেক্সটার হেলমেট। হাঁটতে হাঁটতে খালের মাঝখানে চলে এল। মাটি এখানে শক্ত, ফুটপাথের মত সমতল। দু'পাশের দেয়ালগুলো উঁচু এবং অন্ধকার।

হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে ক্রামার। ভাবছে মানুষের জীবনে কত অদ্ভুত ঘটনাই না ঘটে। মাসখানেক আগেও সে ফাগান্ডা-র মেট্রোপলিটান পাওয়ার ইউনিটের সাধারণ একজন রেশিও ক্লার্ক ছিল। ছকে বাঁধা জীবনটা ছিল একঘেয়ে। মাঝে মধ্যে দু'একটা চুরিচামারির ঘটনা খানিকটা উত্তেজনার খোরাক যোগাত। তারপর একদিন হঠাৎ করেই প্ল্যানটা মাথায় এল ওর।

প্ল্যানটা করেছিল সে শূন্যের গোপনীয়তা জানার জন্য, যে গোপনীয়তা সহস্র বছর ধরে মানব জাতিকে হতবুদ্ধি করে রেখেছে। ৩০৯১ সালে ইতিহাসবিদ স্টোলা লিখেছিলেন:

আমি নিশ্চিত যে ভয়ঙ্কর কোনও বিপর্যয়ের কারণে খালগুলো সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে এবং পূর্ববর্তী মার্শিয়ান রাজবংশের যে পতন শুরু হয়েছিল তার পেছনে ওই করিডর যাকে আমরা শূন্য বলে জানি, তার বিশেষ ভূমিকা ছিল।

আমরা নিশ্চিতভাবে এটাও জানি, ক্যানাল গ্র্যান্ড বহু আগেই ওই করিডরকে গ্রাস করে চলে গেছে, এবং বর্ণালিবীক্ষণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যায় মহাখালটির কোথাও জমা আছে মহামূল্যবান রেটনাইট যার বৈজ্ঞানিক নাম কেমিক্যাল এক্স। কেমিক্যাল এক্স আজও মানব জাতির সর্বাধিক প্রত্যাশার বস্তু। আমার কোনই সন্দেহ নেই একদিন অবশ্যই এই

মহামূল্যবান বস্তুটি আবিষ্কার হবে এবং জানা যাবে শূন্যের সকল রহস্য।

ক্রামার জানে ইন্টারপ্ল্যানাটেরী কাউন্সিলে নয়জন সদস্যের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে চোদ্দ কিলোগ্রাম রেটনাইট সংরক্ষিত আছে। রেটনাইট এক ধরনের ড্রাগ, মেন্টালস্টিমুল্যান্ট, ঠিকমত ডোজ নিলে মস্তিষ্কের চিন্তা শক্তি বাড়িয়ে দেয় হাজার গুণ। রেটনাইট-এর ডোজ যে নিতে পারে সে পরিণত হয় সুপার ইন্টেলেকচুয়ালে।

ক্রামার এই পরশমণির সন্ধানই চায়। চায় কারণ রেটনাইট তার জন্য সাফল্যের দ্বার খুলে দেবে। তাকে আর ছোটখাট চুরি বা ঠগবাজী করতে হবে না, পুলিশের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতেও হবে না।

হেলমেটের চিবুকের দিকে একটা বোতামে চাপ দিল ক্রামার। স্বয়ংক্রিয়ভাবে মার্শিয়ান চুরুট বেরিয়ে এল একটা র‍্যাক থেকে, টুপ করে ওর ঠোঁটের ওপর পড়ল। খুদে একটা তাপপ্রবাহ ওটাকে ছুঁয়ে গেল, জ্বলে উঠল চুরুট। ঘাড়ের পেছনের এগজস্ট বালব্ ফুলে উঠল ধোঁয়া বের করে দেয়ার জন্য। চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে হেঁটে চলল ক্রামার।

প্ল্যানের সূচনাপর্ব ক্রামারের মাথায় এসেছিল অদ্ভুত উপায়ে। ফাগান্ডার ছোট এক কিউরিও শপে সে পুরানো একটা ফুলদানি কিনেছিল। ফুলদানিটার একপাশে ছিল কিছু বর্ণমালা, অন্যপাশে ছন্দহীন একটা কবিতা।

আশ্চর্য হয়ে ক্রামার আবিষ্কার করল বর্ণমালা আর কবিতা দুই মিলে ইঙ্গিত করছে 'ব্যুরো অভ স্ট্যান্ডার্ডস'-এর প্রাচীন এক পার্চমেন্টকে।

ক্রামার পরদিন রাতে লুকিয়ে থাকল গ্যালারিতে। একশো ছাব্বিশটা গ্লাসকেস থেকে বাছাই করে একটা বিশেষ বই চুরি করল সে। ওটার মধ্যেই শূন্যের সকল রহস্য নিহিত, জানত ও। কিন্তু বই চুরির ব্যাপারটা শিগগিরই জানাজানি হয়ে যাবে যদি হোম ভাল্লাকে চিরতরে সরিয়ে না দেয় সে। হোম ভাল্লা মার্শিয়ান ভাষাবিজ্ঞানী। বহুবছর গবেষণায় নিয়োজিত থাকার পর কিছুদিন আগে ঘোষণা দিয়েছে অচিরেই সে প্রাচীন মার্শিয়ানদের সকল পুস্তকের মর্মার্থ উদ্ধার করবে।

সুযোগের সন্ধানে থাকল ক্রামার। জানল হোম ভাল্লা ছুটি কাটাতে কিছুদিনের জন্য গ্রামের বাড়িতে যাবে। তারপর সে একদিন ভাল্লার বাড়িতে ঢুকে হিট গানের আঘাতে ভাল্লাকে মেরে লাশটাকে লুকিয়ে ফেলল নগরীর পরিত্যক্ত টিউবগুলোর একটাতে।

কিন্তু ব্ল্যানচার্ড? হ্যাঁ, ব্ল্যানচার্ড সম্ভবত তিনটে ঘটনার মধ্যে কোনও ক্লু খুঁজে পাবে: চুরি যাওয়া বই, হোম ভাল্লার মৃত্যু এবং ক্রামারের অন্তর্ধান। কিন্তু সব জানতে ওরও সময় লাগবে। ইতিমধ্যে ক্রামার আইনের নাগালের বাইরে চলে যাবে।

হাঁটার সময় খালটাকে ভাল করে লক্ষ করল ক্রামার। ধারাল ব্লেডের মত সোজা চলে গেছে গ্র্যান্ড ক্যানাল সামনের দিকে। দেয়ালগুলো খাড়া, লাল পাথরের। করাতের মত কালো, খাঁজকাটা দাগ দেখল সে মাটিতে। শুকিয়ে যাওয়া পানির দাগ, জানে ক্রামার।

শূন্যের রহস্য জানার জন্য কত অভিযাত্রী এই পথ পাড়ি দিয়েছে কে জানে, কিন্তু সবাই শেষ পর্যন্ত নিখোঁজ থেকেছে। যদি শূন্যের গর্ভে রেটনাইট থেকেই থাকে তা হলে কোন্ সেই শক্তি সকল অনুপ্রবেশকারীদের গ্রাস করে নিচ্ছে?

চুরি করা বইটা ক্রামারকে হতাশই করেছে। গোলক ধাঁধার মত অসংখ্য খাল আঁকা আছে বইয়ের মানচিত্রে, কিন্তু আসল রহস্য সম্পর্কে একটা কথাও উল্লেখ নেই।

দুপুরের দিকে বিশ্রাম নেয়ার জন্য থামল ক্রামার। আধঘণ্টা পর আবার যাত্রা শুরু করল। কিছুদূর এগোবার পর ওর চোখের ওপর 'ভিশন প্লেট'-এ ম্লান একটা আলো জ্বলে উঠল।

ভয়ের ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল ক্রামারের শিরদাঁড়া বেয়ে। ভিশন প্লেটে একটা লাল দেয়াল আর বড় একটা দরজা দেখতে পেল সে। ওই দরজা পেরিয়ে এসেছে সে বহুক্ষণ আগে। ক্রামার দেখল খুলে গেল দরজাটা, স্পেসসুট পরিহিত এক লোক আবির্ভূত হলো। ক্রিস্টাল হেলমেট মাথায় তার, চেহারা স্পষ্ট চেনা গেল। ব্ল্যানচার্ড!

পুলিশ ইন্সপেক্টর ব্ল্যানচার্ড মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল, বালু পরীক্ষা করছে। হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল সে, দ্রুত পা বাড়াল সামনে।

গালি দিল ক্রামার। দু'ঘণ্টাও হয়নি হোম ভাল্লাকে সে খুন করে এসেছে, এরই মধ্যে ধূর্ত লোকটা ওর পিছু লেগে গেল? এত দ্রুত সে কী করে এখানে হাজির হলো! ক্রামার নিশ্চয়ই কোনও চিহ্ন ফেলে এসেছে।

আতঙ্কের একটা ঢেউ মুহূর্তের জন্য গ্রাস করল ক্রামারকে। পরক্ষণে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনল সে। শুয়ে পড়ল বালুতে, খাবার ট্যাবলেট চিবাতে চিবাতে ঘুমিয়ে পড়ল একটু পরই।

ভোরের আগে ঘুম ভেঙে গেল ক্রামারের। আবার এগোতে শুরু করল অন্ধকারে। কিন্তু সূর্যের প্রথম আলো গ্র্যান্ড ক্যানালে প্রবেশ করতেই তিনটে কোয়ানথ্র ওকে আক্রমণ করে বসল।

কোয়ানথ্রগুলোর বছরের এই সময় দক্ষিণ মণ্ডলে থাকার কথা। এগুলো কোত্থেকে এল? সোর্ড ফিশ চেহারার তিনটে কিম্ভূত কোয়ানথ্র-র পাখার আওয়াজ প্রবল আঘাত হানল ক্রামারের ইয়ার ফোনে।

এক গুলিতে প্রথমটাকে মেরে ফেলল ক্রামার, হিট পিস্তলের ডাবল চার্জে দ্বিতীয় পাখিটা মারাত্মক আহত হলো, কিন্তু তৃতীয়টা ইস্পাত কঠিন

দাঁত বের করে ভয়ঙ্কর গতিতে তেড়ে এল ওর গলা লক্ষ্য করে।

ঝট করে মাথা সরাল ক্রামার। একটুর জন্য ধারাল দাঁত বসল না গলায়। পকেট থেকে ছুরি বের করার আগেই ভয়ঙ্করদর্শন পাখিটা কামড় দিল ওর কাঁধে। একই সঙ্গে ওটার বুকে চকচকে ব্লেড ঢুকিয়ে দিল ক্রামার। প্রাণহীন দেহটা ছিটকে পড়ল দূরে।

অনেকক্ষণ হাঁপরের মত হাঁপাল ক্রামার। একটু সুস্থির হতেই চিন্তাটা মাথায় এল ওর।

তিনটে কোয়ানথ্রকে মেরেছে সে। তার মানে বাকি সাতানব্বইটা কাছে পিঠেই আছে। কোয়ানথ্ররা সবসময় একশোর একটা ঝাঁক মেলে ওড়ে। কাঁধের যন্ত্রণা সত্ত্বেও ক্রামারের মুখে চওড়া হাসি ফুটল, মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে ওর।

হ্যাভারস্যাক খুলল ক্রামার, তিনটে মৃতদেহের গায়ে লবণ ছিটাতে শুরু করল। লবণ খেতে খুব পছন্দ করে কোয়ানথ্ররা। তা ছাড়া শিগগিরই ওরা টের পেয়ে যাবে ঝাঁক থেকে তিনজন নিখোঁজ। সঙ্গীদের খুঁজতে বেরুবে ওরা। লবণের গন্ধে গোটা ঝাঁকটা হাজির হবে এখানে, থাকবেও অনেকক্ষণ। আর তখন যদি ব্ল্যানচার্ড এসে হাজির হয়...! নতুন উদ্যমে হাঁটা দিল ক্রামার।

ডুরেসিলেন্ট টেপ লাগাতেই কাঁধের কাটা দাগটা মিলিয়ে গেল। কিন্তু বেজার হয়ে ক্রামার আবিষ্কার করল কোয়ানথ্রর আক্রমণে ওর ভিশন সেটের ক্ষতি হয়েছে। ব্ল্যানচার্ডকে দেখার জন্য যতবার সুইচ টিপল সে, প্রতিবারই ভিশন প্লেট ঝাপসা হয়ে থাকল।

দ্বিতীয় দিন রাতে ফার্স্ট ওয়ে স্টেশনে পৌঁছুল ক্রামার। দরজাহীন খুদে একটা ঘরে ঢুকল, মেঝেতে আবর্জনা বোঝাই। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল সে। এদিক ওদিক তাকাতেই এক দেয়ালের গায়ে অক্ষত একটা স্প্যানার গ্লাস চোখে পড়ল ক্রামারের। গ্লাসটা পরীক্ষা করে খুশি হয়ে উঠল ও। গ্লাসটার ব্যাটারির সঙ্গে নিজের সুটের ডিভাইসের কানেকশন লাগিয়ে বোতাম টিপতেই গ্লাসের গায়ে হিজিবিজি রেখা ফুটে উঠল। কয়েক সেকেন্ড পরেই পরিষ্কার হয়ে গেল পর্দা। ব্ল্যানচার্ডকে স্পষ্ট দেখা গেল, নাছোড়বান্দার মত এগিয়ে আসছে। যা দেখার দেখা হয়ে গেছে। কানেকশন খুলল ক্রামার। আরেকটা চুরুট ধরাল। ধোঁয়া ফুঁকতে ফুঁকতে সতর্ক চোখে চারদিক লক্ষ করতে লাগল। নাহ্, ধূর্ত ইন্সপেক্টরটাকে ফাঁদে ফেলা যায় তেমন কিছু নেই এই ঘরে। বেরিয়ে এল ক্রামার, সরু রাস্তা দিয়ে হাঁটা ধরল।

রাস্তার ডানধারে একটা গম্বুজাকৃতির বাড়ি চোখে পড়ল ক্রামারের। খাল শ্রমিকরা এখানে বহু আগে রাত্রিযাপন করত। রাস্তার বাঁ পাশে উঁচু একটা টাওয়ার। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মার্শিয়ান রাজবংশ টাওয়ারটাকে ক্যানাল

গ্র্যান্ডে ঢোকা এবং বেরুবার সময় ট্রাফিক সিগন্যাল হিসেবে ব্যবহার করত।

সর্বশেষ বিল্ডিংটার চেহারা এখনও ভাল। বিল্ডিংটায় দরজাও নেই। বালুর একটা স্তূপ জমে আছে ওখানে। ফুট পাঁচেক উঁচু। ভেতরে ঢুকল ক্রামার। তনুভূত বায়ু (rare-fied air) ভেতরের জিনিসগুলো এখনও ঠিকঠাক রেখেছে।

লম্বা ডেমডেম বারটা এক দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে আছে এখনও। ছোট কয়েকটা চোরা-কুঠুরি দেখতে পেল ও। ওগুলোর মধ্যে লুকিয়ে আছে ভয়ঙ্কর ইলেকট্রো হিপনোটিক মেশিন।

একটা ভাঙাচোরা মেশিনের সামনে এসে দাঁড়াল ক্রামার। আগের শতাব্দীর মার্শিয়ানরা সেল্ফ অ্যাপ্লাইড হিপনোটিজম-এর দক্ষতা অর্জন করেছিল। মেশিনটা তুলে নিল ক্রামার, দরজার কাছে চলে এল। বালির স্তূপের ওপর বসাল ওটাকে, তারপর দ্রুত হাতে কাজ শুরু করল। এসব মেশিন কী করে সচল করা যায় জানা আছে ক্রামারের। আর হাতের কাছে তো ইন্সট্রুমেন্ট রয়েইছে। অল্প সময়ের মধ্যে জিনিসটাকে আগের অবস্থায় রূপ দিল ক্রামার। সন্তুষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়াল। ইলেকট্রিক স্টাইলাসটা বের করে সম্মোহন যন্ত্রের রিফ্রাক্টো গ্লাস প্যানেলে গোটা গোটা অক্ষরে লিখল:

'ব্ল্যানচার্ড আমি জানি তুমি আমার পিছু নিয়েছ, কিন্তু এখান থেকে আমাদের পথ আলাদা হয়ে যাচ্ছে। তুমি যদি জানতে চাও আমি কোন্ খাল দিয়ে গিয়েছি, তা হলে জবাবটা গ্লাসের মধ্যে থেকে খুঁজে নাও।'

নিজের নাম দস্তখত করে নিঃশব্দে হাসল ক্রামার, এই ফাঁদটা বেশ জটিল। কিন্তু ব্ল্যানচার্ডও কম ধুরন্ধর নয়, জানে সে, তবে ব্ল্যানচার্ডকে এই পথে অবশ্যই আসতে হবে, ক্লু খুঁজবে। হিপনোটিজম মেশিনটাকে চোখেও পড়বে, এবং তারপর লেখাটার দিকে তাকাবে সে।

রিফ্রাক্টো গ্লাসের দিকে তাকানো মাত্র কাজ শুরু করে দেবে যন্ত্র। দ্রুত এবং গভীর ঘুমে তলিয়ে যাবে সে, আর জাগবে না। আর যদি সে পিছু হটে আসতে চায়, তা হলে ধাক্কা খাবে দেয়ালের সঙ্গে। ভারী গার্ডারটা ওখানে জায়গামত ঝুলিয়ে রেখেছে ক্রামার। ওকে একেবারে পিষে ফেলবে।

এই ওয়ে স্টেশনে পাঁচটি খুদে খাল এসে মিশেছে গ্র্যান্ড ক্যানালের সঙ্গে। কিন্তু ক্রামার কোনও খালের দিকেই যাবে না। কথাটা সে লিখেছে স্রেফ তার অনুসরণকারীকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে। উৎফুল্লচিত্তে ক্রামার ক্যানাল গ্রান্ড ধরে হাঁটতে লাগল।

যেতে যেতে ক্রামার বার কয়েক চেষ্টা করল তার ভিশন সেটটাকে ঠিক করতে। একবার প্রায় ঠিক হয়ে এসেছিল কিন্তু পরক্ষণে ঝাপসা হয়ে গেল ছবি, তারপর কন্ট্রোল থেকে আর সাড়াশব্দই এল না। কাঁধের যন্ত্রণাটা আবার ফিরে এসেছে, বাঁ হাতটা অবশ ঠেকছে। ক্রামার টের পেল বগলের

নীচের গ্ল্যান্ড ফুলে উঠেছে।

দুপুরের দিকে ক্রামার লক্ষ করল চারপাশের দৃশ্যপটের খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। ক্যানালের দেয়ালগুলো যেন আরও গভীর, আরও চেপে আসছে। বড়বড় পরিখাগুলোর রঙ টকটকে লাল, ঝলসে দিচ্ছে চোখ।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ক্রামার, চোখ বড় হয়ে গেল বিস্ময়ে। সিকিমাইল দূরে ওর পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে কালো রঙের বিশাল এক পাথরের ঢিবি।

পাহাড়! কাছে যেতেই বড়বড় বোল্ডারগুলো স্পষ্ট দেখতে পেল ক্রামার, একটার ওপর আরেকটা স্তূপ হয়ে আছে, কেমন ভয় ধরানো একটা ভাব আছে ওগুলোতে। এগুলো এখানে এল কোত্থেকে? ক্যানালের মাথার ওপর দিয়ে নিশ্চয়ই গড়িয়ে আসেনি, আর শিলাস্তূপের আকৃতিটা এত নিখুঁত যে ক্রামারের বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল না এটা প্রকৃতির কোনও সৃষ্টি।

সাবধানে আগে বাড়ল ক্রামার। বিশ গজ দূরত্ব থাকতে সে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল, ভয়ের একটা ঢেউ ওকে নাড়া দিয়ে গেল। পাথরগুলোর মধ্যে জ্যান্ত কী যেন একটা আছে। ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে ওর দিকে যেন তাকিয়ে আছে পাথরগুলো।

হঠাৎ গলা চিরে ভয়ার্ত একটা চিৎকার বেরুল ক্রামারের, ঘুরেই দৌড় দিল। দৌড়াতে দৌড়াতে এক সেকেন্ডের জন্য পেছন ফিরে চাইল ও, অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা দেখে ছানাবড়া হয়ে গেল চোখ। 'পাথরগুলো' ঢিবি থেকে নেমে এসেছে, ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল শক্ত মাটিতে। ধীরে, তবে নির্ভুল নিশানায় ওকে অনুসরণ শুরু করল 'ওরা'।

ক্রামারের চকিতে মনে পড়ে গেল কথাটা। বুঝতে পারল কীসের পাল্লায় পড়েছে। গ্র্যান্ড ক্যানালের মূর্তিমান আতঙ্ক ওগুলো—ক্যানালব্রাস।

প্রথমদিকে সহজেই দৌড়ে ওদের পেছন ফেলে দিল ক্রামার। কিন্তু ওরাও গতি বাড়ালে দিশেহারা বোধ করল সে। বালির ওপর দিয়ে গড়িয়ে আসছে ক্যানালব্রাসেরা, যেন ওজন শূন্য। পেছন ফিরলেই ওগুলোর গুহার মত মুখ আর অসংখ্য চোখ দেখতে পাবে ভেবে ওদিকে তাকাল না ক্রামার।

ওদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে সে। ক্যানালব্রাসরা অজৈব, তবে সর্বভুক। ওরা জৈব পদার্থ বা প্রাণী থেকে খাবার সংগ্রহ করে। কিন্তু মাটির ওপর এমনভাবে পড়ে থাকে যেন কয়লার একটা ডিপো।

ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে ক্রামার। কীভাবে দানবগুলোর হাত থেকে নিস্তার পাবে জানে না। হঠাৎ অনেকদিন আগে একটা বইতে পড়া তথ্যটা মনে পড়ে গেল ওর। ক্যানালব্রাসরা সব-সনিক কম্পন সহ্য করতে পারে না। একমাত্র এই জিনিসটাই ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু ক্রামারের কাছে এই মুহূর্তে ভাইব্রেটর নেই, তবে হিট পিস্তল আছে। উন্মাদের মত হোলস্টার থেকে একটানে অস্ত্রটাকে বের করল ক্রামার, ঘুরে দাঁড়াল, এবং গুলি করল।

রেজাল্ট কী হবে জানা ছিল না ক্রামারের। নল থেকে আগুনের একটা ঝলক বেরুল শুধু, যেন ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল ক্যানালব্রাসদের দলটা। স্লো মোশন ছবির মত একসঙ্গে ঘুরে গেল সব ক'টা, রণেভঙ্গ দিল। আগের জায়গায় ফিরে গেল ওরা, একটা আরেকটার ওপর চড়ে বসল, ঠিক আগের পজিশনে ফিরে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ক্রামার, এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না একটু আগের ঘটনাটাকে। তারপর সাহসের সঙ্গে পরীক্ষাটা করল।

ক্রামারের হিট পিস্তলটা লেটেস্ট গান-লারকিটন টাইপের, বিদ্যুৎপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ছোট্ট যন্ত্রটা কম্পন নিয়ন্ত্রণে ওস্তাদ। খুব কম অস্ত্রেই সুপার-সনিক চার্জ থাকে। ক্রামারের পিস্তলটা সেগুলোর মধ্যে একটা।

সাব-সনিক চার্জ দিয়ে যদি ক্যানালব্রাসদের সাময়িকভাবে স্থির করে দেয়া যায়, তা হলে সুপার-সনিক কিংবা আলট্রা-সনিক ওয়েভ দিয়ে ওদের সচল করা কি সম্ভব নয়?

সেই চেষ্টাই চালাল ক্রামার, অস্ত্রটা অ্যাডজাস্ট করল, গুলি ছুঁড়তেই পাথুরে আকৃতিগুলো যেন জীবন ফিরে পেল। সাব-সনিক আগুনের একটা গোলা ওদেরকে আগের মত আগ্রাসী হামলা চালানোর পর্যায়ে নিয়ে গেল।

আবিষ্কারের আনন্দে একটা সিগার ধরাল ক্রামার। পনেরো মিনিটের মধ্যে সে তৃতীয় ফাঁদটা পাতল। যদিও এই ফাঁদ পাতার কোনওই দরকার ছিল না। কিন্তু কোন রকম ঝুঁকি নিতে রাজি নয় ক্রামার।

হিট গানটা বালুতে পুঁতল সে, শুধু ব্যারেল আর ট্রিগারটা বেরিয়ে থাকল। একটা দড়ি শক্ত করে আড়াআড়ি বাঁধল ক্যানাল ফ্লোরের বিশগজ জায়গা জুড়ে। দড়ির একটা গিঁট বাঁধা থাকল ট্রিগারের সঙ্গে। ব্যারেলটা সোজা তাক করে রাখল ক্রামার ক্যানালব্রাসদের দিকে।

'এখন,' বিড়বিড় করে বলল সে, 'যদি এই পথে ব্ল্যানচার্ড ওয়ে স্টেশনের দিকে আসে তা হলে সে মস্ত একটা সারপ্রাইজ পাবে। আসলে আজকালকার যুগে মস্তিষ্ক না থাকলে কোনও কাজ করা সম্ভব না।'

আত্মতুষ্টিতে বলীয়ান ক্রামার জ্যান্ত পাথরগুলোকে পেছনে রেখে লম্বা পায়ে ক্যানালের দিকে এগোল।

সিকি মাইল এগোবার পর ও চুরি করা ম্যাপটা বের করে চোখ বোলাতে লাগল। ম্যাপ আঁকা বইটা হাতে নিয়ে চারদিকে লক্ষ করতে করতে হাঁটতে লাগল।

প্রতি একশো গজ যাওয়ার পর একবার করে থামল ক্রামার, গ্র্যান্ড ক্যানালের শাখা মুখগুলোকে পরীক্ষা করে দেখল। কোনও কোনওটা গ্র্যান্ড ক্যানালের মতই বড়। একবার সন্দেহ হলো ক্রামারের, পথ ভুল ধরেছে

কিনা। কিন্তু হাল ছাড়ল না সে। চলার গতি একটুও শ্লথ হলো না। গ্র্যান্ড ক্যানালের মূল ধমনীতে ঘুরপাক খেলেও একসময় ঠিকই আসল জায়গায় পৌঁছে যাবে, শপথ করল ক্রামার।

এদিকটাতে, গ্র্যান্ড ক্যানালের দেয়ালের গায়ে অসংখ্য চিত্রলিপি চোখে পড়ল ক্রামারের। অনেক লেখাই মুছে গেছে, কিছু অস্পষ্ট। তবুও চেষ্টা করল যদি পড়া যায়। একটা চিত্রলিপি পড়তে গিয়ে ধাক্কা খেল, ভ্রূ কুঁচকে উঠল। অনুবাদ করল ক্রামার: *'প্রতিধ্বনি থেকে সাবধান।'*

কিন্তু চিত্রলিপির কথা একটু পরই সে ভুলে গেল। ব্ল্যানচার্ডের অবস্থান জানার জন্য ভিসা সেটে হাত লাগাল। যন্ত্রটা কর্কশ শব্দ তুলল, গুঞ্জন ধ্বনি শোনা গেল, এক সেকেন্ডের জন্য কাজ শুরু করে দিয়েই আবার নষ্ট হয়ে গেল।

ওই এক সেকেন্ডেই যা দেখার দেখে নিয়েছে ক্রামার। বালুর সমুদ্র ভেঙে অপ্রতিরোধ্য গতিতে থপথপ করে এগিয়ে আসছে ব্ল্যানচার্ড। দুটো ফাঁদকেই সে ফাঁকি দিয়ে এসেছে। চমকে উঠল ক্রামার। লোকটাকে কি কিছুতেই থামানো যাবে না?

অজান্তেই হাঁটার গতি দ্রুততর হলো ক্রামারের, প্রতিটি পদক্ষেপে মুখ বিকৃত হয়ে উঠল ওর। কাঁধের ব্যথাটা বেড়ে গেছে খুব।

লক্ষ করল ক্রামার ক্যানালের লাল রঙের দুই তীরের দ্যুতি অনেকটাই ম্লান হয়ে আসছে, কেমন ধাতব রঙের লাগছে। এদিকের তীরের দেয়ালের রঙ ক্রমশ স্লেটরঙা হয়ে উঠল, আরও উঁচু, যেন টানেলের মত মাথায় সমকেন্দ্রী হয়ে আছে। হঠাৎ টের পেল ক্রামার একটা অস্বস্তিবোধ ঘিরে ধরছে ওকে, ইচ্ছে করল চিৎকার করে এই ভয়াবহ নৈঃশব্দ ভেঙে খান খান করে দেয়।

আরও হাত বিশেক এগোবার পর ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠল মনে। যেন শব্দহীন এই নীরবতা চেপে বসছে কানে। ইচ্ছের বিরুদ্ধেই ক্রামার এগিয়ে গেল কাছের দেয়ালটার দিকে। একটা বড় পাথরের টুকরো হাতে নিয়ে পাগলের মত ধাতব দেয়ালটায় আঘাত করতে লাগল। কিন্তু কোনও শব্দ হলো না। যেন কাঠের হাতুড়ি দিয়ে সে তুলোর বস্তা পিটাচ্ছে। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল ক্রামার। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল পাথরের টুকরোটা থেকে কী যেন একটা বেরিয়ে অবিশ্বাস্য গতিতে ছুট দিল ক্যানালের পথ ধরে। ছায়ার মত জিনিসটা, কিন্তু হাত-পা আছে, বোতামের মত ছোট্ট একটা মাথাও চোখে পড়ল।

টুকরোটা দিয়ে আবারও আঘাত হানল ক্রামার। আবারও একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এসে সবেগে ছুটে গেল সামনে। ক্রামার শুয়ে পড়ল বালুতে, যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। বিপরীত দিকের দেয়াল থেকে এবার আবির্ভূত

হলো ওরা, বারোজনের একটা দল। গুঞ্জনের শব্দ উঠল, ধীরে বেড়ে চলল আওয়াজটা। ভয়ঙ্কর শব্দটা প্রায় পাগল করার জোগাড় করল ক্রামারকে। হেডসেটের সুইচ অফ করে দিল সে। কিন্তু শব্দের কম্পনটা যেন ঢুকে গেল ওর স্পেসসুটের ভেতরে, হেক্সটার হেলমেটের মধ্যে। যেন ছোট ছোট হাতুড়ি দিয়ে ছায়ামূর্তিগুলো ক্রমাগত বাড়ি মেরে চলেছে ওর মাথায়।

এগুলোই কি সেই প্রতিধ্বনি তোলা ছায়ামূর্তি যাদের কথা কিছুক্ষণ আগে এক চিত্রলিপিতে দেখে এসেছে ক্রামার? নাকি গোটা ব্যাপারটাই ওর মস্তিষ্কের উদ্ভট কল্পনা, আহত হাতের আঘাতজনিত জ্বরের ফল? জানে না সে।

ক্রামার ওখানেই তালগোল পাকিয়ে বসে থাকল। এক সময় প্রতিধ্বনিটা পুরোপুরি থেমে গেল। ক্রামার ভাবল এটাকেও ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করা যায় কিনা। শেষ একটা ফাঁদ, যেটা ব্ল্যানচার্ডকে থামিয়ে দিতে পারবে চিরতরে।

কিন্তু ভাবনা চিন্তার বেশি সময় নেই ওর হাতে। পেছন ফিরে তাকাল ও, সঙ্গে সঙ্গে চোয়াল ঝুলে পড়ল প্রবল অবিশ্বাসে।

একটা লোক বালুর ওপর দিয়ে ধীরগতিতে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ব্ল্যানচার্ড!

লাফিয়ে উঠল ক্রামার, যেন ভূতে তাড়া করেছে এমন ভাবে দৌড় দিল সে, এক মুহূর্তের জন্যেও আর কোথাও থামল না। প্রাণভয়ে দৌড়ে চলল সে।

দিন ছয় পরে ক্রামার তার অভিযানের শেষ পর্বে চলে এল। ক্রামারের বিশ্বাস এখন যে কোনও মুহূর্তে রেটনাইট ডিপোজিটের গুহামুখটা তার চোখে পড়তে পারে। আর তারপরই সকল দুশ্চিন্তা আর টেনশনের অবসান হবে। প্রচুর পরিমাণে রেটনাইট নেবে সে। বইতে লেখা আছে ওটাকে পরিশুদ্ধ করার নিয়ম। ক্যানাল টুয়েন্টি এইট নর্থ-ওয়েস্টের পথ ধরে এগোলে যেভাবেই হোক সে পৌঁছে যাবে ক্রেটার সিটিতে। ব্ল্যানচার্ড যদিও এখন তার খুব কাছে চলে এসেছে, কিন্তু সে ওর একটা ব্যবস্থা করতে পারবে।

তাকে এক বছর–বড় জোর ছয় মাস সময় দাও, সাফল্য হাতের মুঠোয় নিয়ে আসবে ক্রামার। মনের দরজা খুলে যাবে ওর, সকল দুশ্চিন্তা তাড়িয়ে দেবে সে। আর আইনকে নিজের হাতে তুলে নেয়ার ক্ষমতা অর্জন করবে সে তখন।

কিন্তু তারপরও একটা প্রশ্নের জবাব অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে–ওই শূন্য। ক্যানাল গ্র্যান্ডে প্রবেশ করার পর থেকে চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে চেয়েছে ক্রামার। কিন্তু জোঁকের মত সেঁটে আছে ওটা মস্তিষ্কে। কিন্তু ও যতই নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ততই চিন্তাটা ওকে আলোড়িত

করছে।

ওটা সামনে কোথাও হবে, হয়তো একটা উপসাগরের মত, যেটাকে তার পাড়ি দিতেই হবে। কিন্তু ওখানে না পৌঁছা পর্যন্ত প্রশ্নটার জবাব সে পাচ্ছে না।

ক্যানালের আশপাশ সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করতে লাগল ক্রামার। ওর গলা শুকিয়ে কাঠ, হাত আর বাহুতে কোনও সাড়া নেই, যেন শরীরের কোনও অঙ্গ নয় ও দুটো। বিশ্রামের সময় প্রতিবার ও চোখের সামনে লাল ফুটকি ফুটতে দেখল।

বেলা তিনটার দিকে ক্রামার বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল ক্যানালের বাঁ দিকের দেয়াল স্পর্শকের মত উঠে গেছে ওপরে, ওর সামনে সৃষ্টি করেছে এক বিশাল উপবৃত্ত। একই সঙ্গে বালুর মেঝে নেমে গেছে নীচের দিকে, গভীর থেকে গভীরে। এক সময় তীর আর চোখেই পড়ল না ওর।

ঘণ্টাখানেক পর একটা দৃশ্য দেখে সবিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল ক্রামার।

সিকি মাইল সামনে, ক্যানালের ফ্লোরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অদ্ভুত কিছু বস্তু। ক্রামার দেখল ওগুলোর মধ্যে রয়েছে আধুনিক রকেট শিপ, ত্রিশ শতাব্দীর বিশাল ডানাওয়ালা স্টেপটো বিমান। সবগুলো চুপচাপ পড়ে আছে, দরজা খোলা। যেন ক্রুরা বাইরে গেছে কিছুক্ষণের জন্য, এখুনি ফিরবে।

কিন্তু কাছে আসতে ক্রামার বুঝল উড়ুক্কু যানগুলো বহুদিন থেকে এভাবে পড়ে আছে। কাঠামোর অর্ধেক ডুবে আছে বালুতে। জীর্ণ চেহারা, কাঁচের রঙ হলদেটে।

মোট বিশটা যান, গুণল ক্রামার, এর মধ্যে একটার নাম পড়ে যানটাকে চিনতে পারল সে। গোলিয়াথ। বহু আগে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। পুরানো বাহনগুলোর বেশিরভাগই সে ইতিহাস বইতে দেখেছে।

ক্রামার বুঝতে পারল বিমানগুলোর শেষ গন্তব্য ছিল এখানেই। ওরা হয়তো শূন্যকে আবিষ্কারের আশায় এতদূর এসেছিল। কিন্তু ক্রুদের কী হলো? তারা আর ফেরেনি কেন?

শেষ বিমানটা পার হয়ে খানিক এগোবার পর দাঁড়িয়ে পড়ল ক্রামার। অস্বস্তিবোধ হচ্ছে। অয়েলস্কিনের খুদে বটুয়াটা খুলে বইটা বের করে মনোযোগ দিয়ে একটা জায়গায় চোখ বোলাতে শুরু করল সে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উল্লাস ধ্বনি বেরিয়ে এল ক্রামারের গলা থেকে। আরি, জিনিসটা তো আগে চোখে পড়েনি ওর। কিন্তু ক্যানালের এই জায়গাটা ম্যাপে চিহ্নিত আছে। তার চেয়েও বেশি, মানচিত্র স্পষ্ট বলছে বিশাল এক বাটির মধ্যে জমা হয়ে আছে মহামূল্যবান সেই পরশমণি–রেটনাইট।

ক্যানালের মুখে দুটো ট্রেইল দেখা যাচ্ছে। একটা সরু, ডট লাইন দিয়ে

চিহ্নিত করা। অন্য ট্রেইলটা বড়, দুটি মাত্র শব্দে প্রাচীন মার্শিয়ানদের প্রবেশের কথা বলা হয়েছে। *এ-ক্রি মেনাগ্রা,* লেখা আছে ম্যাপে।

ক্রামার উঠে দাঁড়াল, পুব দিক লক্ষ্য করে শ'খানেক গজ হেঁটে গেল। কিন্তু কোনও ট্রেইল চোখে পড়ল না। ধু ধু বালু ছাড়া কিছু নেই। তারপর, অন্যমনস্কভাবে মাথা সামান্য ওপরে তুলতেই ওটাকে দেখতে পেল সে।

ওর সামনে একটা সরু করিডর, ম্যাপে বর্ণিত ট্রেইলটার মত। বালুর মেঝে ওখানে ঢালু হয়ে আছে বিচিত্র ভঙ্গিতে। কিন্তু করিডরের মুখে একটা চকচকে ভাব। যেন ডাবল গ্লাসের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

দুটো ট্রেইলের একটাকে আবিষ্কার করেও এবার আর লাফিয়ে উঠল না ক্রামার। সরু ট্রেইলটার তো খোঁজ পাওয়া গেল, কিন্তু বড়টা কোথায়? ওটা হয়তো আরও সামনে হবে। ম্যাপটাকে ফেলে দিল সে বালুতে, মাড়িয়ে গেল। যেন ভুলে ফেলে গেছে ওটাকে।

পুবদিক ধরে হাঁটতে থাকল ক্রামার। অল্পক্ষণের মধ্যেই পেয়ে গেল যা খুঁজছিল। দ্বিতীয় ট্রেইলটা বড়, বেশ বড়। বালু থেকে একটা পাথুরে দেয়াল উঠে গেছে ওর সামনে। এখানেও, ট্রেইলের মুখে গ্লাসের মত জিনিসটাকে দেখতে পেল ও।

তবে ইতস্তত না করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ক্রামার। সঙ্গে সঙ্গে উল্লাস বোধ করল সে। পেছনের পথটা বন্ধ হয়ে গেছে, এরকম একটা অনুভূতি একই সঙ্গে কাজ করল ওর ভেতরে।

এ-ক্রি মেনাগ্রা? কী মানে ওই শব্দগুলোর? মেনার, জানে ক্রামার, প্রাচীন একটি মার্শিয়ান শব্দ। মানে হচ্ছে কুঞ্চিত বা বক্র হওয়া। আর ক্রি শব্দের অর্থও তার জানা—উন্মুক্ত, ফাঁকা জায়গা।

দাঁড়িয়ে গেল ক্রামার, শীতল একটা স্রোত নামল মেরুদণ্ড বেয়ে। শব্দগুলোর সম্পূর্ণ অর্থ এখন ওর কাছে পরিষ্কার। তা হলে শূন্যের আসল রহস্য হচ্ছে এই! কেন অভিযাত্রীরা শূন্যে যাত্রা করেও আর ফিরে আসেনি বুঝতে পেরে গা ঠাণ্ডা হয়ে এল ক্রামারের, কেন গ্র্যান্ড ক্যানাল শুকিয়ে গেছে তার জবাবও পেয়ে গেছে সে ইতিমধ্যে। এ আলাদা এক জগৎ—আলাদা ডাইমেনশন—এখানে যে একবার প্রবেশ করে সে আর ফেরে না, নিখোঁজ হয়ে যায় চিরদিনের জন্য। শূন্য তাকে গ্রাস করে।

খুব আস্তে আবার হাঁটতে শুরু করল ক্রামার। জোর করে চোখ দুটো সামনের দিকে নিবদ্ধ রাখল সে। কিন্তু একসময় আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না, ঘুরে দাঁড়াল।

নেই! ওর পেছনে কিচ্ছু নেই। যেন যাদুমন্ত্রে অদৃশ্য হয়ে গেছে গ্র্যান্ড ক্যানাল। আছে শুধু বিশাল এক অন্ধকার কালো পর্দা। আর সামনে সীমাহীন এক দূরত্ব।

পূর্বাভাস

তার কোনও নাম নেই। তার বাড়ি এক সূর্যের এক গ্রহে, পৃথিবী থেকে ৮০ আলোকবর্ষ দূরে, অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জের কাছে, এত দূরে যে ওখানকার সূর্য পৃথিবী থেকে দেখা যায় না। তাই ওই গ্রহের নাম জানে না মানুষ।

যাকে নিয়ে আমাদের গল্পের শুরু সে তার গ্রহের এক ভয়ংকর অপরাধী। সে একদিন এমন একটি অপরাধ করে বসল, সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো নির্বাসনে। আর তার নির্বাসন ঘটল পৃথিবীতে। তবে স্পেসশিপে চড়ে আসেনি সে, তাকে পাঠানো হয়েছে প্রচণ্ড শক্তিশালী এক ফোর্স বিমের সাহায্যে। পৃথিবীতে পৌঁছুতে তার মাইক্রো সেকেন্ড সময় লেগেছে মাত্র। পৃথিবীর মানুষ জানে না কী নিষ্ঠুর এবং নির্দয় এক হন্তারক তাদের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে আছে। সময় হলেই স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করবে সে। শুরু হলো দুঃস্বপ্নকে হার মানানো এক হরর কাহিনি...

এক

তার নাম না থাকলেও রয়েছে অসাধারণ 'উপলব্ধি' ক্ষমতা। এই ক্ষমতার সাহায্যে সহজেই সে অচেনা এই গ্রহের অজানা পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে। তার নির্দিষ্ট কোনও আকার নেই, নেই চোখ বা কান। তবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা এত প্রখর যে সহজেই আশপাশের সবকিছু 'দেখতে' পায়, তার সীমানার মধ্যে পড়ে, এমন কোনও শব্দ তার অদৃশ্য 'কান' এড়িয়ে যেতে পারে না। মোটামুটি বিশ গজের মত জায়গা সে বেশ পরিষ্কার দেখার ক্ষমতা রাখে, আরও বিশ গজ দূরে তার নজর যায় বটে, তবে ঝাপসা দেখে। এই তো পাশের গাছের ছাল বাকল সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে মাটির নীচে পোকাদের নড়াচড়ার শব্দ। ব্যাপারটা তাকে অবাক করে তুলছে। কারণ, নিজের জগৎ ছাড়া অন্য কোথাও প্রাণের স্পন্দন থাকতে পারে তার জানা ছিল না। তবে উপলব্ধি ক্ষমতা বলছে পোকাগুলো তার জন্য বিপজ্জনক নয়। এমনকী মাথার ওপর, গাছের ডালে

ছোট ছোট কয়েকটি পাখি বসে আছে, ওরাও কোন বিপদ ডেকে আনবে না।

এ গ্রহের বিশাল সব গাছ দেখে সে অভিভূত। আর অবাক লাগছে চারপেয়ে একটি প্রাণীকে দেখে। ওটা প্রাকৃতিক একটা গুহার গর্তে ঘুমাচ্ছে, তার থেকে দশ গজ দূরে।

প্রাণীটা যেহেতু ঘুমাচ্ছে, তাই সে জানে সহজেই সে ওটার মনের ভেতর ঢুকে যেতে পারবে। তারপর ওকে দিয়ে যা খুশি করানো তার জন্যে কোনও ব্যাপারই নয়। তবে এসব ছোটখাট প্রাণী দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য কতটা সাধন করা যাবে, সে ব্যাপারে তার সন্দেহও রয়েছে।

সে 'পারসেপটর সেন্স' বা উপলব্ধি ক্ষমতার সাহায্যে স্ক্যানিং করে চলছিল চারপাশ। মনোযোগ কেড়ে নিল একটা ছুরি। জং ধরা, ভাঙা ব্লেডের একটা জ্যাকনাইফ। কেউ ফেলে দিয়েছে অনেক আগে। ওটাকে যে ছুরি বলে তাও জানে না সে। তার কাছে ওটা স্রেফ আর্টিফ্যাক্ট বা শিল্পকলা ছাড়া কিছু নয়। আর আর্টিফ্যাক্ট মানেই বুদ্ধিমান জীবন! তবে বুদ্ধিমান জীবন প্রতিকূল এবং বিপজ্জনকও হয়ে উঠতে পারে। কারণ সে ছোট এবং অসহায়। তাই তার উচিত বুদ্ধিমান জীবনের গঠনপ্রণালী সম্পর্কে আগে জেনে নেয়া, সেক্ষেত্রে ঘুমিয়ে থাকা প্রাণীটা হতে পারে পরীক্ষা করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। ঘুমন্ত প্রাণীটার মনের ভেতর প্রবেশ করে বরং সে পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে আরও বেশি কিছু জানার সুযোগ পাবে, এভাবে স্ক্যানিং করার চেয়ে।

সে একটা মেঠো পথের মাঝখানে পড়ে রয়েছে, কয়েক হাত দূরে লম্বা ঘাসের জঙ্গল, ওখানে লুকালে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। সে চেষ্টা করল এগোতে, পারল না। তবে অবাক হলো না। কারণ তার গ্রহের তুলনায় এ গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অনেক বেশি। তাদের গ্রহে চলাফেরার প্রয়োজন হলে, শূন্যে স্রেফ ভাসিয়ে তোলে নিজেদেরকে। কিন্তু এখানে সে এটা করতে পারছে না। কারণ এখানে কারও ওপর ভর করে তাকে চলতে হবে, কাউকে তার 'হোস্ট' বানাতে হবে। আর এমন 'হোস্ট' করার মত একজনকেই সে দেখতে পাচ্ছে–ঘুমিয়ে আছে গুহায়। তবে ওটা খুব ছোট, তার অর্ধেক ওজনও হবে না। তবু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?

হঠাৎ তার পারসেপটর সেন্সে কী যেন ধরা পড়ল। সে ওদিকে পুরো মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করল। বিপদ হলে খামোকা ওই ছোট প্রাণীটাকে নিয়ে মেতে থাকার মানে হয় না। আগে বিপদের মোকাবেলা করতে হবে।

প্রথমে শুধু কম্পন টের পেল সে, মাটি কাঁপছে, হেঁটে আসছে কেউ, বড় কিছু একটা। তারপর বাতাসে আরেকটা কম্পন ভেসে এল। কথা বলছে কেউ। কোনও বুদ্ধিমান প্রাণী। তবে একজন নয়, দু'জন। একজন বেশ উঁচু গলায় কথা বলছে, অপরজন খানিক নিচু গলায়। কথা বুঝতে পারছে না সে,

বোঝার কথাও নয়। সে ওদের চিন্তা-চেতনার মাঝে ঢুকতে পারল না, তার গ্রহের জীবরা শব্দ উচ্চারণ করে না, পরস্পরের মাঝে যোগাযোগ রক্ষা হয় টেলিপ্যাথির মাধ্যমে।

এক সময় ওরা দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে এল। দু'জনই বটে। একজন তার সঙ্গীর চেয়ে সামান্য লম্বা, তবে দু'জনেই পরিণত বয়স্ক। সন্দেহ নেই দু'জনেই বুদ্ধিমান প্রজাতির, ওদের পরনে পোশাক–শুধু বুদ্ধিমান প্রাণীরাই পোশাক পরে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা। দু'জোড়া হাত এবং দু'জোড়া পা দেখা যাচ্ছে। বাহ্, এরা তার চমৎকার 'হোস্ট' হতে পারবে। তবে এ মুহূর্তে এ নিয়ে ভাবার সময় নেই তার। তার এখন অস্তিত্বের প্রশ্ন। নিজেকে বাঁচাতে হবে।

ওরা দু'জন দুই লিঙ্গের। একটি মেয়ে, অপরটি ছেলে। হাত ধরাধরি করে হেঁটে আসছে এদিকেই। সর্বনাশ! এখনই তো দেখে ফেলবে ওকে। তা হলেই কম্ম সারা।

মরিয়া হয়ে সে তার একমাত্র অবলম্বন ঘুমন্ত, চারপেয়ে প্রাণীটার ওপর সওয়ার হলো, তার মনের ভেতর ঢুকে তাকে হোস্ট বানিয়ে ফেলল। তারপর ওটাকে জাগিয়ে তুলে বেরিয়ে এল গর্ত থেকে। আপাতত এটার ওপরেই সে ভর করে থাকবে। সে ছেলে মেয়ে দুটোকে ভাল করে দেখতে চায়। ওদের সম্পর্কে জানতে চায়। অবশ্য তার ভয়ও আছে। সে যে প্রাণীটার শরীরে ঢুকে পড়েছে, ওটা যদি ওদের চোখে পড়ে যায় তা হলে বিপদ হতে পারে। ওরা তার হোস্টকে মেরে ফেলতে পারে। হোস্টকে মেরে ফেললেও তার অসুবিধে নেই। অসুবিধা হবে ঘুমন্ত কোনও প্রাণীর ওপর সওয়ার হবার আগেই সে যদি ধরা পড়ে যায়, তা হলে। অবশ্য সুযোগ বুঝে হোস্টকে নিজেই হত্যা করবে সে বা মরতে বাধ্য করবে। তা হলেই তার পক্ষে সম্ভব হবে অন্য কোনও ঘুমন্ত প্রাণীর শরীরে ঢুকে পড়ে তাকে হোস্ট বানিয়ে ফেলা। বর্তমান হোস্টটি এত ছোট এবং ভঙ্গুর যে, এর ওপর ভর করে থাকলে নিজের উদ্দেশ্য পূরণ করা কখনোই সম্ভব হয়ে উঠবে না তার পক্ষে।

ওই ছেলেটির নাম রনি বেরেট, মেয়েটি শার্লি রকফিল্ড। পরস্পরকে ভালবাসে ওরা, বিয়ে করবে শীঘ্রি। জঙ্গলে ঘুরতে বেরিয়েছে ওরা, ফুর্তি করবে।

রনির বাঁ হাত নিজের ডান হাতের মুঠোয় চেপে হাঁটছিল শার্লি, হঠাৎ ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল রনি, দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। অবাক দৃষ্টিতে তাকাল শার্লির দিকে। শার্লি উঁকি মেরে কী যেন দেখছে।

'দেখ, রনি,' বলল সে। 'একটা মেঠো ইঁদুর। কী করছে দেখ!'

'দূর, ইঁদুর দেখলেই গা ঘিনঘিন করে আমার।' মুখ বাঁকাল রনি।

ইঁদুরটা, ওদের কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে, রাস্তায় বসে আছে, প্রেইরি কুকুরের মত। সামনের ছোট ছোট পা দুটো দ্রুত নাড়ছে, যেন ওদের সঙ্কেত দিতে চাইছে। খুদে, তীক্ষ্ণ চোখজোড়া স্থির হয়ে আছে ওদের ওপর।

'কোনও ইঁদুরকে এমন অদ্ভুত কাজ করতে দেখিনি কোনদিন,' মন্তব্য করল শার্লি, 'মোটেও ভয় পাচ্ছে না আমাদেরকে, লক্ষ করেছ? এটাকে বাড়ি নিয়ে গেলে কেমন হয়, বলো তো? পুষব!'

রনি বাধা দেয়ার আগেই উবু হলো শার্লি, হাত বাড়িয়ে খপ করে ধরে ফেলল ইঁদুরটাকে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে খুদে প্রাণীটাকে দেখতে দেখতে বলল, 'ইস, রনি। কী সুন্দর!'

'মানলাম সুন্দর,' বলল টমি, 'এখন ওটাকে ছেড়ে দাও। বাড়ি নিয়ে যেতে হবে না।'

'আচ্ছা বাবা, নেব না। এমনি দেখলাম ওকে ধরতে পারি কিনা। উহ্!' ছুড়ে ফেলল সে ইঁদুরটাকে, যন্ত্রণায় মুখ বাঁকাল। 'খুদে শয়তানটা আমাকে কামড়ে দিয়েছে।'

ইঁদুরটা ফুড়ুৎ করে দৌড় দিল, খানিক দূরে গিয়ে থেমে দাঁড়াল, পেছন ফিরে দেখল ওরা ধাওয়া করেছে কি-না। না, ধাওয়া করছে না। ওরা এমনকী তার দিকে তাকাচ্ছেও না। ওরা ব্যস্ত রয়েছে নিজেদেরকে নিয়ে।

'বেশি লেগেছে, সোনা?' উদ্বিগ্ন দেখাল রনিকে।

'না, তেমন না, আরে, দেখ!' শার্লি তাকাল রাস্তায়।

দৌড়ে আসছে ইঁদুরটা রনির দিকে। ট্রাউজার বেয়ে উঠতে শুরু করল, এক ঝাপটা মেরে ওটাকে পাঁচ হাত দূরে পাঠিয়ে দিল রনি। আবার এল ওটা–প্রতিহিংসা নিয়ে হামলা চালাল। এবার প্রস্তুত ছিল রনি। সজোরে পা নামিয়ে আনল ছোট্ট, জ্যান্ত প্রাণীটার ওপর, পিষে ভর্তা করে ফেলল। তারপর ছিন্নভিন্ন দেহটা কিক মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে।

'রনি, তুমি ওটাকে--'

গম্ভীর চেহারা নিয়ে বান্ধবীর দিকে ফিরল রনি। 'শার্লি, ওটা আমার ওপর দু'বার হামলা চালিয়েছে। যাকগে, তোমাকে কোথায় কামড়েছে বল। রক্ত বের হলে ইঁদুরটাকে নিয়ে শহরে যেতে হবে, র‍্যাবিস আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। কোথায় কামড় দিয়েছে, শার্লি?'

'বা-বাম বুকে, মুখের কাছে আনার সময় কামড় দিয়েছে। তবে রক্ত বের হয়নি। সোয়েটার আর ব্রা ছিল–

'তবু চেক করে দেখতে হবে। তোমার জামা–না থাক এখানে খুলতে হবে না। লোকজন এসে পড়তে পারে, চলো, এগোই। অন্য কোথাও গিয়ে পরীক্ষা করে দেখব।'

শার্লির হাত ধরে পা বাড়াল রনি। এত জোরে হাঁটা দিল, ওর সাথে

তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে প্রায় দৌড়াতে হলো শার্লিকে।

'দেখ একটা কচ্ছপ,' কয়েক কদম যাবার পর বলে উঠল শার্লি।

হাঁটার গতি কমাল না রনি, 'প্রাণী নিয়ে অনেক খেলা হয়েছে। এবার চলো তো!'

খানিকটা এগোবার পর মোড় ঘুরল ওরা, এখানে প্রচুর ঝোপঝাড়, তারপর টলটলে একটা পুকুর। বেশ নির্জন পরিবেশ। এখানে লোকজন আসে বলে মনে হয় না। ওরা এসেছে পুকুরে মজা করে সাঁতার কাটবে।

রনির বয়স আঠারো, শার্লি সতেরোয় পা দিয়েছে। ছোটবেলা থেকে দুটিতে বন্ধুত্ব। একই স্কুলে পড়ত ওরা, একই ক্লাসে। বছর দুই আগে হাইস্কুলের পড়া শেষ করেছে ওরা। পড়াশোনার প্রতি তেমন আগ্রহ নেই রনির। বাপের খামারে কাজ করে। বাপবেটা দু'জনের খেয়ে পরে চমৎকার চলে যায়। দু'পরিবারই ওদের সখ্যর কথা জানে। টমির বাবা, মি. বেরেট শার্লিকে পুত্রবধূ করে ঘরে নেয়ার জন্যে মুখিয়ে আছেন। শার্লির বাবা মারও আপত্তি নেই রনির মত সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান এবং সৎ পাত্রের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে। জানেন রনির ঘরে শার্লি সুখেই থাকবে। কারণ রনি খুবই ভালবাসে শার্লিকে।

রনি আর শার্লি মাঝে মাঝে ঘুরতে বেরোয়। রনির কাজই হলো নতুন জায়গা খুঁজে বের করা, যেখানে শার্লিকে নিয়ে মজা করে গল্প করা যাবে। সে সম্প্রতি এই জঙ্গলের মধ্যে চমৎকার এই পুকুরটির খোঁজ পেয়েছে। সাঁতারের কথা বলতেই লাফিয়ে উঠেছে শার্লি, তারপর দুজনে মিলে চলে এসেছে এখানে।

পুকুরে নামার আগে শার্লির ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে দেখল রনি। সোয়েটার ভেদ করে ইঁদুরের দাঁত কামড় বসাতে পারেনি মাংসে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রনি। হাসল, 'যাক, বাবা। বাঁচা গেল! চলো, সাঁতার কাটি।'

ওরা জামাকাপড় ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাকচক্ষু কালো দীঘির পানিতে। ঠাণ্ডা স্পর্শে জুড়িয়ে গেল গা। দু'জন পরস্পরের দিকে পানি ছুঁড়ছে, হাসছে, জানে না ঝোপের আড়াল থেকে কিছু একটা দেখছে ওদেরকে। এমন কিছু একটা যা শীঘ্রি ওদের জীবন নরকের চেয়েও দুঃস্বপ্নময় করে তুলবে।

দুই

ওটা সাঁতার কাটতে দেখছে রনি এবং শার্লিকে। অস্থির হয়ে আছে কখন ওরা ক্লান্ত হয়ে তীরে উঠবে, তারপর ঘুমিয়ে পড়বে। ওরা ঘুমুলেই ওদের যে

কাউকে নিজের হোস্ট বানাতে পারবে সে। তবে ছেলেটাকেই প্রথম পছন্দ তার। কারণ মেয়েটার চেয়ে ছেলেটা লম্বায় বড়, গায়ে গতরেও শক্তিশালী মনে হচ্ছে এবং সম্ভবত বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান, শক্তিশালী প্রাণীই তার দরকার।

অনেকক্ষণ সাঁতার কাটার পর ওরা উঠে পড়ল তীরে, তোয়ালে দিয়ে গা মুছল। ছেলেটা কী যেন বলল মেয়েটাকে, মেয়েটা মাথা দুলিয়ে সায় দিল। ছেলেটা তোয়ালে বিছাল মাটিতে। তারপর দু'জনেই শুয়ে পড়ল। একটু পরেই নাক ডাকতে শুরু করল ছেলেটার। মেয়েটা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তার দিকে, আস্তে আস্তে চোখ বুজে এল তারও। সাঁতার কেটে বেজায় ক্লান্ত দু'জনেই। ঘুমিয়ে পড়েছে।

এতক্ষণ এ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল ওটা। রনি গভীর ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেছে, সে ওর শরীরের ভেতর প্রবেশ করল। তবে ঢুকতে একটু কসরত করতে হলো। রনির অবচেতন মন তাকে ঢুকতে দিতে চাইছিল না। বুদ্ধিমান প্রাণীদের হোস্ট করতে গিয়ে এমন সমস্যায় আগেও পড়েছে সে। চার পেয়ে প্রাণীটার ভেতরে ঢুকতে তার মাইক্রো সেকেন্ড সময়ও লাগেনি। কিন্তু যে প্রজাতি যত বুদ্ধিমান তার কাছ থেকে প্রতিরোধটা আসে তত বেশি। তবে রনির অবচেতন মনকে অবশ করে ফেলতে তার সময় লাগল না। একবার ঘুমের গভীরে চলে গেলে যে কাউকে কাবু করে ফেলতে পারে সে। এবারও তাই করল। এখন রনির শরীরটা তার একান্ত নিজের, রনির মনকে সে নিজের ইচ্ছামত চালাতে পারবে, ওকে দিয়ে যা খুশি করানোর ক্ষমতা এখন সে রাখে। রনি তার কাছে সম্পূর্ণ অসহায় এক বন্দী। তার বন্দীত্বের অবসান ঘটবে একমাত্র মৃত্যুর মাধ্যমে।

রনির সমস্ত স্মৃতি বা জ্ঞান নিজের মধ্যে ধারণ করল সে। এই জ্ঞান কাজে লাগাবে সে নিজের প্রয়োজনে, তবে আস্তে ধীরে, রয়ে-সয়ে।

প্রথমেই যে কাজটা করা দরকার তা হলো নিজেকে বা নিজের শরীরটাকে নিরাপদ কোনও জায়গায় লুকিয়ে রাখতে হবে। যাতে কেউ এসে তাকে ধ্বংস করতে না পারে।

রনির জ্ঞান এবং স্মৃতির ভাণ্ডার এ কাজে ব্যয় করল সে। খুঁজতে লাগল লুকোবার ভাল জায়গা। এক সময় পেয়েও গেল। আধা মাইল দূরে, গভীর জঙ্গলে, পাহাড়ের ধারে একটা গুহা আছে। ছোট গুহা, তবে এটার কথা কেউ জানে না। নয় বছর বয়সে রনি এটা আবিষ্কার করছে। ধরেই নিয়েছে প্রথম আবিষ্কর্তা হিসেবে এ গুহার মালিকও সে। কাউকে এ গুহার কথা বলেনি সে। গুহার মেঝে খটখটে, পাথুরে নয়—বালুময়।

যেন জেগে না ওঠে, এভাবে আস্তে উঠে পড়ল সে শার্লির পাশ থেকে (ইচ্ছে করলে মেয়েটার গলা টিপে মেরে ফেলতে পারে সে। কিন্তু তাতে

জটিলতা খামোকা বাড়বে; আর কম শক্তিসম্পন্ন প্রাণীর প্রতি তার তেমন আকর্ষণও নেই)। হাঁটা শুরু করল। রনির পরনে কিছু নেই। তার জুতো, শর্টস, ট্রাউজার, শার্ট—সব পড়ে রইল যেখানে একটু আগে সে শুয়েছিল, সে জায়গায়। ওটা মনে করেছে জামাকাপড় পরার দরকার নেই। কারণ যে কেউ এখানে যে কোনও সময় চলে আসতে পারে। কাজেই যত দ্রুত সম্ভব কেটে পড়তে হবে।

ঝোপ ঠেলে রাস্তার ওপাশে যাবার আগ মুহূর্তে পেছন ফিরে তাকাল সে। মেয়েটা এখনও অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ঘুরল সে। দুলকি চালে ছুটল গুহার দিকে।

রনির মনের ভেতর ঢুকে বসে আছে সে, ওর মনের কথা পড়তে পারছে। জেনে অবাক হয়েছে রনি এবং মেয়েটা তাকে রাস্তায় দেখেও কেন থেমে পড়েনি। তাদের দৃষ্টিতে সে সামান্য একটা কচ্ছপ ছাড়া কিছুই নয়। পাঁচ ইঞ্চি লম্বা একটা কচ্ছপের খোলসের মধ্যে তার বাস। কচ্ছপ সম্পর্কে সে জানে এটা ধীরগতি একটা প্রাণী, বোকাসোকা, কারও সাতে পাঁচে নেই। কচ্ছপটার ওজন আর তার ওজন প্রায় একই—দুই পাউন্ড। তার জানা আছে কচ্ছপ মানুষের কাছে একটি সুখাদ্য বলে বিবেচিত। তবে সচরাচর ক্ষুধার্ত মানুষ ছাড়া কেউ কচ্ছপ ধরতে যায় না। ভাগ্যিস, ওরা ক্ষুধার্ত ছিল না। মেঠো ইঁদুরটাকে সে তার হোস্ট বানিয়েছিল। পরে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ওটাকে ত্যাগ করেছে। বলা যায় ইঁদুরটাকে বাধ্য করেছে সে রনির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। জানত রনি তাকে মেরে ফেলবে এবং সে ইঁদুরের দেহের বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে, ঢুকে যেতে পারবে নিজের খোলসে।

শুরুতে বলেছিলাম তার সুনির্দিষ্ট কোনও আকার নেই। কথাটি সম্পূর্ণ সত্যি নয়। তার আকার একটা আছে—অনেকটা কচ্ছপের মত দেখতে সে। তবে পৃথিবীর কচ্ছপের মত নয়। মেয়েটা যখন বলল, 'দেখো, একটা কচ্ছপ!' তার আত্মা উড়ে গিয়েছিল ভয়ে। ভাগ্যিস, ছেলেটা তার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি। তা হলেই সর্বনাশ হত। ওরা টের পেয়ে যেত আদৌ সে কচ্ছপ নয়। কচ্ছপের খোলসের নীচে হাত, পা, মাথা কিছুই নেই। ওরা যদি আরও বেশি কৌতূহলী হয়ে খোলটা ভেঙে ফেলত বা ফাটিয়ে ফেলত, ভেতরে কী আছে দেখার জন্যে, তা হলে কোনও হোস্টের ওপর আশ্রয় করেও বাঁচতে পারত না সে, মারা যেত সাথে সাথে। কারণ কাউকে মানসিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার সময় সেই জিনিস বা প্রাণীর নিজস্ব অস্তিত্ব বা সত্তা বলে কিছু থাকে না।

ছুটতে ছুটতে রনির সেই গুহায় চলে এল সে। গুহাটা ছোট, ভেতরে ঢুকতে হয় হামাগুড়ি দিয়ে। চারপাশে ঝোপঝাড় ওটাকে ঢেকে রেখেছে দেখে সন্তুষ্ট বোধ করল সে।

ভেতরটা প্রায় অন্ধকার, তবে রনির চোখ দিয়ে সে ভালই দেখতে পাচ্ছে। রনির স্মৃতি থেকে চমৎকার একটা ছবি পাচ্ছে সে জায়গাটার। (এখানে একটা কথা বলা দরকার, সে যখন কারও ওপর সিন্দবাদের ভূতের ওপর সওয়ার হয়, তখন হোস্টের উপলব্ধি ক্ষমতা দিয়েই সে সব কিছু দেখে এবং শোনে। কাজেই হোস্ট যদি ক্ষীণ দৃষ্টির হয় তারও দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।) গুহাটা তেমন বড় নয়, ফুট বিশেক হবে লম্বায়, সবচেয়ে চওড়া জায়গা হচ্ছে মাঝখানটা, ছয় ফুটের মত। এখানে একজন মানুষ মোটামুটি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

গুহার মাঝখানে এসে ওটা রনিকে দিয়ে মাটি খোঁড়াল। মাটি মানে বালু। নয় ইঞ্চি মত গর্ত করার পর রনি কচ্ছপরূপী ভিনগ্রহের প্রাণীটাকে ওখানে কবর দিল। গর্তের বালু এমনভাবে বুজিয়ে দিল বোঝার উপায় থাকল না এখানে কিছু একটা আছে। তারপর রনি সাবধানে বেরিয়ে এল গুহা থেকে সমস্ত চিহ্ন মুছতে মুছতে। সবশেষে, গুহা মুখের বাইরে, ঝোপের আড়ালে বসে রইল চুপচাপ।

তাড়াহুড়ার কিছু নেই। নিজেকে নিরাপদেই লুকিয়ে রেখেছে সে। এখন রনির জ্ঞানভাণ্ডার শুষে নেবে সে। যদিও রনির আই কিউ তেমন প্রখর নয়, ইতিমধ্যে বুঝে গেছে সে, তারপরও রনি আশপাশের পরিবেশ সম্পর্কে যতটুকু জানে, ওটুকু জানলেও তার চলে যাবে। কারণ তার দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনায় রনির এই জ্ঞানটুকু অল্পসময়ের জন্য হলেও কাজে লাগানোর মত।

তিন

ঘুম ভেঙে শার্লি রকফিল্ড দেখল রোদের তেজ মরে গেছে, আবছা আঁধার নামছে জঙ্গলে। কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল ছ'টা বাজে। তার মানে টানা তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছে সে। এখান থেকে ওর বাড়ি আধ-ঘণ্টার হাঁটা পথ। বাপ-মা হয়তো চিন্তায় পড়ে গেছে আদরের মেয়ে এখনও আসছে না কেন ভেবে।

পাশ ফিরল সে, রনিকে জাগাবে। কিন্তু রনি নেই পাশে। জামা-কাপড় এলোমেলো পড়ে আছে। হয়তো প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেছে কাছে কোথাও, ভাবল শার্লি। ওর ফেরার অপেক্ষায় বসে রইল সে।

কিন্তু আধ ঘণ্টা পরেও রনি ফিরল না দেখে উদ্বেগ বোধ করল শার্লি। পায়ে স্যান্ডেল চাপিয়ে উঠে দাঁড়াল। নাম ধরে ডাকল, 'রনি! কোথায় তুমি?'

কোনও সাড়া নেই। শুধু মাটিতে পাতা পড়ার খসখস শব্দ ছাড়া আশ্চর্য

নীরব প্রকৃতি। আচ্ছা, রনি ওকে ভয় দেখাবার জন্যে কোথাও লুকিয়ে নেই তো? হঠাৎ, 'হাউ' করে বেরিয়ে আসবে ঝোপের আড়াল থেকে। নাহ্, রনি অমন করবে না।

কিন্তু ছেলেটা গেল কোথায়? জামা-কাপড় ছাড়া যাবেই বা কতদূর? নাকি কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে? কোনও কারণে অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে পড়ল না তো? রনির স্বাস্থ্য খুব ভাল। মৃগীরোগ নেই ওর। আর যদি অ্যাকসিডেন্ট হয়—তা হলে হয়তো অজ্ঞান হয়ে গেছে (মারাও যেতে পারে রনি, এ কথা ভাবলেও বুকে কাঁপন ধরে)। ওর যদি গোড়ালি মচকে যায় বা পা ভেঙে গিয়ে থাকে, তা হলেও তো শার্লির ডাকে সাড়া দেয়ার কথা। কিন্তু কোনও সাড়া নেই কেন?

টেনশনের চোটে মুখ শুকিয়ে গেল শার্লির, বুকের ভেতর পাঁজরের গায়ে দমাদম হাতুড়ির মত পিটছে হৃৎপিণ্ড। সে ঝোপঝাড় মারিয়ে বেরিয়ে এল চারপাশে তাকাতে তাকাতে। হাঁটছে, সেই সাথে উঁচু গলায় ডাকছে রনির নাম ধরে। আধ-ঘণ্টা পরে, আশপাশের প্রায় একশো গজ জায়গা খুব ভালভাবে খুঁজেও রনির টিকিটিও চোখে না পড়ায়, এবার সত্যি ভয় পেয়ে গেল শার্লি। এতদূরে রনি হয়তো আসেওনি।

ওর সাহায্য দরকার, বুঝতে পারল শার্লি। এবার বাড়ির পথ ধরে প্রায় দৌড় শুরু করল। তিন মাইল রাস্তা একটানা দৌড়াবার পর, পরিশ্রম এবং টেনশনে প্রায় নেতিয়ে পড়ল মেয়েটা। ওর চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন ওর বাবা। ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'কী হয়েছে, শার্লি?'

কেঁদে ফেলল শার্লি। ফোঁপাতে ফোঁপাতে পুরো ঘটনা খুলে বলল।

সব শুনে উঠে দাঁড়ালেন র‍্যালফ রকফিল্ড। বললেন, 'কাঁদিস না, মা। দেখছি কী করা যায়।'

তিনি তখুনি ফোন করলেন রনির বাবা, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু জন বেরেটকে। সবকথা শুনে মুখ অন্ধকার করে ফেললেন বেরেট। শুধু বললেন, 'তুমি থাক বাড়িতে, আসছি আমি।'

ফোন ছেড়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন জন বেরেট। তারপর ওয়ারড্রোব খুলে রনির পুরানো একজোড়া মোজা বের করে পকেটে ঢোকালেন। তাঁর কুকুর টাইগারকে মোজার গন্ধ শুকিয়ে রনির খোঁজে বেরুবেন। তারপর লণ্ঠন, দেশলাই ইত্যাদি নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন।

ডগ হাউসের সামনে ঘুমাচ্ছে টাইগার। আস্তানাটা রনিই ওর জন্যে বানিয়ে দিয়েছিল। টাইগারের বয়স সাত, সাদায় কালোয় মেশানো রং, বিশাল আকারের এক হাউন্ড। সে শিকারের গায়ের গন্ধ শুঁকে তাকে খুঁজে বের করতে ওস্তাদ। তার সবই ভাল, শুধু গাড়িঘোড়া ভয় পায়। বলা যায়, যান্ত্রিক বাহনটার প্রতি তার প্রচুর অ্যালার্জি আছে।

'চলরে, টাইগার,' ডাক দিলেন জন। 'কাজ আছে।'

লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল হাউন্ড। তারপর মনিবের পিছু পিছু এগোল রকফিল্ডের খামার বাড়ির দিকে। ততক্ষণে সাঁঝ নেমে গেছে পুরোপুরি।

র‍্যালফ রকফিল্ড লণ্ঠন আর শটগান নিয়ে রেডি ছিলেন, বন্ধুকে দেখে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন। তাঁর সাথে শার্লিও আছে।

কোনও শুভেচ্ছা বিনিময় হলো না। জন জিজ্ঞেস করলেন শার্লিকে, 'এই রাস্তাটা মোড় ঘুরে ব্রিজের পাশ দিয়ে উত্তর দিকে চলে গেছে না?'

'জ্বী, আংকেল, আমি আপনাদের সঙ্গে যাব। দেখিয়ে দেব রনির জামা কাপড়গুলো কোথায় পড়ে আছে।'

'তোমাকে যেতে হবে না, শার্লি,' শান্ত গলায় বললেন তার বাবা, 'তুমি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও। টাইগারই আমাদের ওখানে নিয়ে যেতে পারবে।'

বাপের মুখের ওপর কথা বলার সাহস নেই শার্লির। সে বাধ্য মেয়ের মত ঘরে ঢুকল। ওঁরা দুজন কুকুরটাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন।

ঝকঝকে চাঁদ উঠেছে আকাশে। দিনের আলোর মত পরিষ্কার চারদিক। লণ্ঠন না আনলেও চলত।

'বন্দুক কেন, র‍্যালফ?' প্রশ্ন করলেন জন। 'শটগান কী কাজে লাগবে?'

'রাতের বেলা জঙ্গলে বন্দুক ছাড়া পথ চলতে আমি ভরসা পাই না,' জবাব দিলেন র‍্যালফ। 'কে বলতে পারে কখন কী ঝাঁপিয়ে পড়বে গায়ের ওপর। এক মুহূর্ত পরে আবার বললেন, 'আমি রনির কথা ভাবছি, ওকে যদি খুঁজে পাই।'

'অবশ্যই খুঁজে পাব।'

'ভাবছি ওদের বিয়েটা দিয়ে দিলেই হয়। এভাবে লুকোচুরি করে বনে-বাদাড়ে দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না আমার। তুমি কী বল?'

'আমার কোনও আপত্তি নেই,' সায় দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন জন। চুপচাপ হেঁটে চললেন তাঁরা। হঠাৎ দেখলেন দূর থেকে একজোড়া আলো দ্রুত এগিয়ে আসছে, গাড়ির হেড লাইট। জন চট করে টাইগারের কলার চেপে ধরলেন, রাস্তা থেকে টান মেরে সরিয়ে দিলেন। আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে জানোয়ারটা, কাঁপছে থর থর করে। গাড়িটা চলে যাওয়া পর্যন্ত ওকে শক্ত হাতে ধরে রইলেন জন, তারপর আবার হাঁটা ধরলেন।

টাইগারকে আগেই রাস্তা বাতলে দিয়েছিল শার্লি, ওখানে পৌঁছুতে তেমন বেগ পেতে হলো না। শুধু জঙ্গলে ঢোকার পর লণ্ঠন জ্বালাতে হলো। এদিকে গাছপালা এত ঘন যে চাঁদের আলো ডালপালা আর পাতার প্রাচীর ভেদ করে ভেতরে ঢোকার সুযোগ পায় না। ফলে আঁধার হয়ে থাকে জঙ্গল।

রনির জামাকাপড় আগের জায়গাতেই আছে। ওগুলো দেখে মনে মনে হতাশ হয়ে উঠলেন জন। ভেবেছিলেন এসে দেখবেন রনি ফিরে এসেছে,

পোশাক পরে বাড়ি ফিরে গেছে। ওকে আর খুঁজতে হবে না। এবার ভয় লাগল তাঁর। ছেলেটার কিছু হয়নি তো?

টাইগার রনির জামা-কাপড় শুঁকছে, তারপর এগিয়ে গেল রনি যেখানে শুয়ে ছিল, সেখানে। জায়গাটা এক চক্কর দিয়ে ছুটল ঝোপের দিকে। জন দ্রুত রনির জামা-কাপড় নিয়ে ওর পিছু পিছু দৌড় দিলেন। বুঝতে পেরেছেন তিনি, টাইগার রনির ট্রেইল খুঁজে পেয়েছে, সেদিকেই যাচ্ছে এখন।

চার

ভিনগ্রহের হন্তারক এখন বিশ্রাম নিচ্ছে। ইতিমধ্যে রনির জ্ঞানভাণ্ডার থেকে সব শুষে নিয়েছে। সে এখন জানে এ গ্রহের নাম পৃথিবী। পৃথিবী সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণাও পেয়ে গেছে সে। জানে এ গ্রহের বেশির ভাগ জুড়ে রয়েছে লবণ পানির সমুদ্র, তবে ডাঙাও কম নেই, সেগুলো সব দেশ আর মহাদেশ।

এ মুহূর্তে যেখানে সে আছে এ জায়গা সম্পর্কেও মোটামুটি একটা ধারণা তার হয়েছে। সে জানে সে একটা গ্রামে চলে এসেছে, সবচেয়ে কাছের শহর চার মাইল উত্তরে। তার জানা আছে জায়গাটির নাম বার্টলসভিল, সাকুল্যে হাজার তিনেক লোকের বাস। এটা উইসকনসিন নামে এক রাজ্যে অবস্থিত, রাজ্যটা আমেরিকা নামের একটি দেশের অংশ। এখান থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল দক্ষিণ পূর্বে বড় একটা শহর আছে, গ্রীনবে। গ্রীনবের একশো মাইল দক্ষিণে মিলওয়াকি, আরেকটি বড় শহর। মিলওয়াকির নব্বুই মাইল দূরে রয়েছে আরও একটি বড় শহর–শিকাগো। এ সব শহরের নাম সে জানে, কারণ রনি ওই শহরগুলোতে গিয়েছিল। তবে বার্টলসভিল এবং তার আশপাশের এলাকা সে ভালই চেনে। এটা তার খুব কাজে লাগবে। তার মনের ছবিতে এ এলাকার বুনো এবং সব ধরনের প্রাণীর ছবি ফুটে আছে। প্রাণীগুলোর ক্ষমতা এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সে অজ্ঞাত নয়। আবার কাউকে হোস্ট হিসেবে ব্যবহার করতে হলে কার ওপর সওয়ার হতে হবে ভালই জানা আছে তার।

তবে সমস্যা হলো, যার ওপর সে এ মুহূর্তে ভর করে আছে বিজ্ঞান সম্পর্কে তার ধারণা বা পড়াশোনা নেই বললেই চলে। অথচ তার সবচেয়ে দরকার ইলেকট্রনিক্স ভাল জানে এমন কাউকে। তার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে কোনও ইলেকট্রনিক্সের ওপর ভর করা। তবে সে লোকের ইলেকট্রনিক্সের পুঁথিগত বিদ্যা থাকলেই চলবে না, জানতে হবে কী ভাবে এ জ্ঞান কাজে

লাগিয়ে নানা যন্ত্রপাতি তৈরি করা যায়। কাজটা কঠিন, হয়তো মূল লক্ষ্যে পৌঁছুতে তাকে অনেকগুলো পদক্ষেপ নিতে হবে, সওয়ার হতে হবে অনেকের ওপর। তবে প্ল্যান মাফিক এগোতে পারলে এ কাজে সফলও একশোভাগ। সে তাই করবে। কারণ তাকে বাড়ি ফিরতে হবে।

পৃথিবীতে তাকে পাঠানো হবে এমন ধারণাও তার ছিল না। আসলে কর্তৃপক্ষ তাঁদের মর্জি মত ভয়ংকর অপরাধীদের যেখানে খুশি পাঠিয়ে দেন। গ্যালাক্সিতে গ্রহের অভাব নেই। কিন্তু ভিনগ্রহের অপরাধীটির পৃথিবীতে থাকার কোনও ইচ্ছে নেই, সে নিজের বাসভূমে ফিরে যেতে চায়। এখান থেকে ফিরে যেতে পারলে তাকে ক্ষমা তো করা হবেই, বীরের মর্যাদা পাবে সে। কারণ, নির্বাসনে যারা যায়, তাদের একশোভাগের একভাগও বাড়ি ফিরতে পারে কিনা সন্দেহ। সে ফিরতে পারলে নতুন এই গ্রহ সম্পর্কে প্রচুর তথ্য দিতে পারবে তার লোকদের। তার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে। সম্ভব হলে সে এখানকার কোনও মানুষ হোস্টকে নিয়ে যাবে সঙ্গে করে। তা হলে তার খাতির দেখে কে? অবশ্য নিজের দেশে ফেরা সম্ভব যদি কাজগুলো করা হয় সাবধানে। ধীরে এবং কোনও ভুল না হলে। অবশ্য ইতিমধ্যে সে একটা ভুল করে বসেছে। রনিকে ন্যাংটা অবস্থায় এখানে নিয়ে আসা উচিত হয়নি। রনিকে সাময়িকভাবে সম্মোহন করলেও চলত–লম্বা ঘাসের মধ্যে তাকে লুকিয়ে রেখে সে চলে যেত ঘুমন্ত মেয়েটার কাছে। তারপর ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকত তার পাশে। তারপর মেয়েটির ঘুম ভাঙলে ওরা চলে যেত যে যার বাড়িতে। পরদিন সকালে রনিকে আবার নিয়ে আসত সে এখানে। রনি তাকে ঘাসের জঙ্গল থেকে তুলে নিয়ে গুহার মধ্যে আরও ভাল কোনও জায়গায় রেখে দিত। তারপর সুবোধ ছেলের মত ফিরে যেত বাড়িতে, কারও মনে কোনও সন্দেহ না জাগিয়ে।

এ কাজটা করলেই ভাল হত। কিন্তু 'ভাল'টা বুঝতে পেরেছে সে অনেক দেরিতে। অবশ্য কাজ একটা এখনও করা যায়। রনির স্মৃতি লোপ করে দিতে পারে সে। কাল সকালে রনিকে পাঠিয়ে দিতে পারে বাড়িতে। তার আত্মীয়স্বজন নিশ্চয়ই জানতে চাইবে কী হয়েছিল তার। রনির স্মৃতি সাময়িক ভাবে লোপ করে দেওয়ার কারণে সে কিছুই মনে করতে পারবে না। তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। ডাক্তার পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন ওটা অ্যামনেসিয়া বা স্মৃতিভ্রংশ। হয়তো রনিকে নিয়ে দু'একদিন হৈচৈ হবে। তারপর সব থিতু হয়ে গেলে রনিকে সে আবার নিয়ে আসবে নিজের কাছে। নিজের কাজ ফুরোলে রনিকে হত্যা করবে সে। তবে মৃত্যুটা এমনভাবে দেখাতে হবে যেন দুর্ঘটনায় মারা গেছে রনি। তাতে কারও মনে কোনও সন্দেহ জাগার অবকাশ থাকবে না।

ভিনগ্রহের প্রাণীটার পরিকল্পনায় ছেদ ঘটাল কুকুরের ডাক। রনির চোখ

দিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে সে তাকিয়ে দেখল দুটো আলো, হেলতে দুলতে আসছে এদিকেই, সেই সাথে শোনা যাচ্ছে ঘেউ ঘেউ। ডাক শুনেই বুঝে ফেলল সে ওটা টাইগার, রনির বাবার কুকুর।

দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিতে দেরি হলো না ভিনগ্রহের প্রাণীর। রনির বাবা ছেলের চিন্তায় কুকুর নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। নির্ঘাত সেই মেয়েটা বলে দিয়েছে রনিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ সে ভেবেছিল (বলা যায় রনি ভেবেছে) কাল সকালের আগে তার খোঁজ পড়বে না। বাবা যে কুকুর নিয়ে রাতের বেলাতেই হারানো ছেলের খোঁজে বেরিয়ে পড়বেন কে জানত?

আসছে ওরা, দু'জন পুরুষ, একটা কুকুর। একজন রনির বাবা, অপরজন সম্ভবত শার্লির বাবা। আর কুকুরটা সরাসরি গুহার দিকেই ছুটে আসছে!

ওদের এখান থেকে ভাগাতে হবে, সরিয়ে দিতে হবে। কোনওভাবেই গুহার ভেতর ঢুকতে দেয়া যাবে না। আর একশো গজ দূরে ওরাও নেই, সোজা এগিয়ে আসছে, কুকুরটা অনুসরণ করছে রনির ট্রেইল।

রনি, বা বলা যায় রনির শরীর, উঠে দাঁড়াল লাফ মেরে, ঝোপ ঘুরে ছুট দিল আলোকিত লণ্ঠনের দিকে।

ওকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন দুজনে। টাইগার আনন্দে গরগর করে উঠল, ঝাঁকি খেল শরীর, গলায় বাঁধা চামড়ার বেল্ট ছেড়ে দিতে বলছে মনিবকে। জন বেরেট চেঁচিয়ে উঠলেন—'রনি! কী ব্যাপার?'

নাহ্! গুহার বড্ড কাছে ওরা। ঘুরে দাঁড়াল, রনি আবার দৌড়াতে লাগল, ক্রমে সরে যাচ্ছে গুহার কাছ থেকে, পেছন থেকে জন গলার রগ ফুলিয়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'রনি, রনি, দাঁড়াও।'

রকফিল্ড বললেন, 'কুকুরটাকে ছেড়ে দাও। ওকে ধরে নিয়ে আসুক।'

বেরেটের গলা শুনল রনি, 'হ্যাঁ, ছেড়ে দিই। আর দু'জনকেই এক সাথে হারাই আর কী!'

ঝড়ের বেগে দৌড়ে ওদের পেছনে ফেলে দিল রনি। আসলে তো আর ও দৌড়াচ্ছে না, ওকে দৌড় করাচ্ছে ভিনগ্রহের প্রাণীটা। নিজের ওপর কোনই নিয়ন্ত্রণ নেই রনির। ওর শরীরের ভেতর ঘাপটি মেরে বসে থাকা অদৃশ্য জিনিসটা ওকে দিয়ে যা খুশি করাচ্ছে।

দৌড়াতে দৌড়াতে রনি সেই আর্টিফ্যাক্ট বা ছুরিটার কাছে চলে এল। ঘন ঘাসের আড়াল থেকে ওটা খুঁজে বেরও করল। তারপর বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে ঘ্যাঁচ করে বসিয়ে দিল নিজের কব্জিতে। বাইরেটা জং ধরা হলেও ব্লেডটা যথেষ্ট ধারাল। ডান হাতের পর বাঁ হাতের কব্জিও কেটে ফেলল রনি। দু'হাতের শিরাই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, স্রোতের বেগে রক্ত বেরুচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে দুনিয়া আঁধার হয়ে এল, দড়াম করে পড়ে গেল ও।

কুকুরটাকে নিয়ে ওরা দু'জন যখন রনির কাছে পৌঁছুলেন ততক্ষণে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরপারে যাত্রা করেছে সে। আর ওদিকে মৃত রনিকে ছেড়ে গুহায়, নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে এল ভিনগ্রহের হন্তারক।

পাঁচ

রাতটা দুঃস্বপ্নের মত কাটল জন বেরেটের। পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ–এরচে' করুণ ব্যাপার কী হতে পারে? আচ্ছন্নের মত বাড়ি ফিরেছেন তিনি। ফোন করে খবরটা দিয়েছেন শার্লিকে। শার্লি যেন মনে মনে প্রস্তুত হয়েই ছিল এরকম একটা দুঃসংবাদ শুনবে। তার মন বলছিল রনিকে আর কোনদিন জীবিত দেখতে পাবে না সে। খবরটা শোনার পর থেকে পাথর হয়ে গেছে শার্লি।

এদিকে র‍্যালফ রকফিল্ড খবর দিয়েছেন উইলকক্সের শেরিফকে। বিশ মাইল দূর থেকে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এলেন তিনি, সাথে করোনার। ঝোপের আড়াল থেকে শেরিফের লোক রনির লাশ উদ্ধার করল, স্ট্রেচারে তুলে অ্যাম্বুলেন্সে ঢোকাল। শহরে আবার ছুটে চলল অ্যাম্বুলেন্স মরদেহ নিয়ে।

বার্টলসভিলের শবাগারে লাশ পরীক্ষা করে করোনার ঘোষণা করল–কাটা কব্জি থেকে অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণের কারণেই মারা গেছে রনি। এটা স্পষ্ট আত্মহত্যা। কিন্তু প্রশ্ন হলো–রনির মত প্রাণ চঞ্চল, স্বাস্থ্যবান ছেলে আত্মহত্যা করবে কেন? আর অবাক ব্যাপার রনি আত্মহত্যা করেছে ভাঙা, জং ধরা পকেট নাইফ দিয়ে। শেরিফকে জন জানালেন তিনি জীবনেও রনির কাছে ভাঙা ছুরি দেখেননি। তা ছাড়া রনি যখন তাদের সামনে দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিল, শপথ করে বললেন র‍্যালফ এবং জন, রনির হাতে কিছুই ছিল না। যেখানে বসে কাজটা করেছে ছুরিটা ওখান থেকেই নিয়েছিল রনি। কিন্তু ও কি আসলেই জানত যে ছুরিটা ওখানেই থাকবে। আর অন্ধকারে ওটার খোঁজই বা পেল কীভাবে সে?

'ঠিক আছে,' বললেন শেরিফ। 'কাল দুটোর দিকে আমি অনুসন্ধান দল পাঠিয়ে দেব।' র‍্যালফের দিকে ঘুরলেন তিনি। 'ভালকথা র‍্যালফ। আপনার মেয়ের সাথে কথা বলতে হবে আমার। শুনলাম বিকেলে সে রনির সাথেই ছিল। ওরা একসাথে নাকি সাঁতারও কেটেছে। তার একটা সাক্ষ্য দরকার।'

র‍্যালফ মাথা চুলকে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আমার মনে হয় তার দরকার নেই, শেরিফ। সবার সামনে সেদিনের ঘটনা নিয়ে সাক্ষ্য দিতে বিব্রত বোধ করবে মেয়েটা। সবাই ব্যাপারটা নিয়ে এমনভাবে কথা

বলছে যেন ঘটনাটার জন্যে শার্লি দায়ী। আমার মেয়েকে আদালতে হাজির করতে পারব না, শেরিফ। সে লজ্জায় মরে যাবে শত শত মানুষের সামনে। ঠিক করেছি এখানে আর নয়। খামার বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া চলে যাব সপরিবারে।'

এসব ঝামেলা সেরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত একটা বেজে গেছে। বাড়িটাকে এত নির্জন আর নিজেকে কখনও এত একাকী, নিঃসঙ্গ এবং অসহায় মনে হয়নি জন বেরেটের। রনিকে নিয়েই ছিল তাঁর সমস্ত স্বপ্ন। ভেবেছিলেন ছেলেটার বিয়ে দেবেন, নাতি-নাতনীর দাদু হবেন, চাঁদের হাট হয়ে উঠবে তাঁর সংসার। হায়, মানুষ যা ভাবে, সবসময় উল্টোটা ঘটে কেন?

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বেরেট। চোখ ছাপিয়ে কান্না আসছে। নাহ্, র‍্যালফের মত তিনিও আর থাকবেন না এখানে। রনি নেই। আপনজন বলতে আর কে রইল তাঁর? এত বড় খামার বাড়ি দিয়ে কী হবে? তিনিও চলে যাবেন সব বিক্রি করে, যেদিকে দু'চোখ যায়।

রাতটা নির্ঘুম কাটল তাঁর চেয়ারে ঠায় বসে। পরদিন সকালে হঠাৎ কী মনে পড়তে মুখ হাত কোনমতে ধুয়েই ছুটলেন র‍্যালফ রকফিল্ডের বাড়িতে।

র‍্যালফ তাঁর বাড়ির পেছনে, ছোট্ট বাগানে মর্নিং ওয়াক করছিলেন, জনকে দেখে ছুটে গেলেন।

'শার্লি কেমন আছে, র‍্যালফ?' ম্লান হেসে জিজ্ঞেস করলেন জন।

'কাল সারারাত ঘুমায়নি। দেখে এলাম ঘুমাচ্ছে। তোমারও দেখছি একই দশা। কিন্তু এত সকালে কী মনে করে?'

'তোমাকে বলতে এসেছি আমি আবার ওখানে যাচ্ছি।'

'কোথায়?'

'কাল রাতে যেখানে গিয়েছিলাম।'

'কেন?'

দিনের আলোতে জায়গাটাতে ভাল করে চোখ বুলাতে চাই। আমার মন বলছে আমরা কিছু একটা মিস করে এসেছি। জিনিসটা কী জানি না, তবে শেরিফ অনুসন্ধান চালাবার আগেই একবার ওখানে ঢুঁ মারতে চাই।'

'চলো, আমিও তোমার সাথে যাব।'

টাইগারকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন জন। অপেক্ষা করলেন র‍্যালফ পোশাক বদলে আসা পর্যন্ত। তারপর তিনজনে মিলে আবার যাত্রা শুরু হলো।

নিজের ওপর বিরক্ত লাগছে ভিনগ্রহের হন্তারকের। হোস্টকে তার হত্যা না করলেও চলত। ওকে স্রেফ অজ্ঞান করে রাখলেই হত। জ্ঞান ফিরে আসার পর রনির কিছুই মনে পড়ত না। ওরা হয়তো তখন রনিকে নিয়ে ডাক্তারের

কাছে যেত। ডাক্তার রনির আকস্মিক স্মৃতি ভ্রংশের ব্যাপারটা ধরতে না পারলে যেত মনোবিজ্ঞানীর কাছে। এতে ভিনগ্রহের হন্তারকের ভাল হত। সে জানে বার্টলসভিল বা উইলকক্সে কোনও সাইকিয়াট্রিস্ট নেই। রনিকে নিয়ে যেতে হবে গ্রীনবে বা মিলওয়াকিতে। তাতে ওসব জায়গা সম্পর্কে জানতে পারত ভিনগ্রহের প্রাণীটি। ওখানে নতুন, রনির চেয়ে বুদ্ধিমান হোস্ট পেয়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু ছিল না।

তবে নিজেকে কৃতকর্মের জন্যে বেশি দোষ দেয়াও যায় না। কারণ পৃথিবী নামের এ গ্রহে একেবারেই নতুন সে। সবকিছু বুঝে উঠতেও তো সময়ের প্রয়োজন।

এখন যে জায়গায় আছে সে, এখানকার সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এদিকে মানুষ হোস্ট পাওয়া তার জন্যে খুবই কষ্টের হবে। এসব জঙ্গলে লোকজন কদাচিৎ আসে শিকার করতে। তবে সে যেখানে আস্তানা গেড়েছে, তার রেঞ্জের চল্লিশ গজের মধ্যে তারা যে এসে সুখে নিদ্রা যাবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? কাজেই নতুন কোনও মানুষ হোস্ট পেতে হলে প্রথমে তাকে জানোয়ার হোস্ট ব্যবহার করতে হবে। সেই জানোয়ারটাকে পাঠাতে হবে ঘুমন্ত মানুষের কাছে। তবে এতে ঝুঁকি আছে। অবশ্য এ ধরনের ঝুঁকি নিতে সে অভ্যস্ত। রনির স্মৃতি ঘেঁটে সে দেখেছে এদিকে হরিণের আনাগোনা প্রচুর। হোস্ট হিসেবে পাখিদেরকেও ব্যবহার করা যেতে পারে। হতে পারে সেটা চিকেন হক বা পেঁচা। তবে পেঁচা তার ওজন নিয়ে উড়তে পারবে কিনা সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই তার।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল সে হোস্ট হিসেবে পাখিই হবে তার উপযুক্ত। হরিণ-টরিণ পথ চলতে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে পারে। কিন্তু পাখিদের এসব ঝামেলা কম। পাখি হয়ে উড়ে, সুযোগ বুঝে ঘুমন্ত মানুষের ওপর সওয়ার হবে সে, তারপর পাখিটাকে মেরে ফেলবে। আর নতুন হোস্টের কাজ হবে তাকে এখান থেকে নিরাপদ কোনও জায়গায় সরিয়ে ফেলা।

তবে তাড়াহুড়োর কিছু নেই। এবার সে আস্তে-ধীরে ভেবেচিন্তে কাজ করবে। যাতে আর কোনও ভুল করে না বসে। তার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। মোটামুটি দশ মাইল দূরত্ব থেকেও সে মানুষ বা যে কোনও প্রাণীর হাঁটা-চলা বা নড়াচড়া টের পায়। যেমন এই মুহূর্তে সে মাটিতে কম্পন টের পাচ্ছে—বুঝতে পারছে বড় ধরনের কিছু একটা এগিয়ে আসছে তার আস্তানার দিকে। একটা নয়, দুটো। একটু পর সে বুঝতে পারল দুটোও নয়, আসলে তিনটে প্রাণী হেঁটে আসছে। সে তার উপলব্ধি ক্ষমতা প্রয়োগ করল। এরা সেই তিনজন, গত রাতে টমির খোঁজে যারা এসেছিল। রনির বাবা, সেই মেয়েটির বাবা আর কুকুরটা। সোজা এগিয়ে আসছে গুহার দিকে। ওদের কথা শুনে বোঝা গেল রনির ট্রেইল ধরে আসার কারণ। ওরা জানতে চায়

রনি কালরাতে দৌড়ে আসার আগে আসলে কোথায় ছিল।

কিন্তু কেন? এটা জেনে ওদের কী লাভ? কিন্তু ওরা যেভাবে গন্ধ শুঁকে আসছে তাতে সে ধরা পড়ে যাবে। বিশেষ করে যদি গুহার মেঝে খুঁড়ে ফেলে। ভিনগ্রহের প্রাণী রীতিমত অসহায় বোধ করল দেখে কুকুরটা ওদেরকে টেনে নিয়ে এসেছে ঠিক গুহামুখে। সে শুনতে পেল মেয়েটার বাবা অর্থাৎ র‍্যালফ বলছে, 'গুহাটা দেখে মনে হচ্ছে রনি এর মধ্যে ঢুকেছিল।'

রনির বাবা জন বললেন, 'আমারও তাই ধারণা। আমিও ঢুকে দেখতে চাই ভেতরে কী আছে।'

'এক মিনিট, জন,' বাধা দিলেন র‍্যালফ। 'গুহার ভেতর কী আছে আমরা কেউ জানি না। আগে টাইগারকে পাঠাই। ভিতরে কিছু থাকলে ও আমাদের সাবধান করে দেবে।'

'ঠিক বলেছ,' সায় দিলেন জন। টাইগারের বাঁধন খুলে দিলেন। কুকুরটা এক লাফে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

এক মিনিট পর, টাইগারের তরফ থেকে কোনও সাবধান বাণী এল না দেখে দুই বুড়ো হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়লেন গুহায়। গুহার মাঝামাঝি জায়গায় এসে থামলেন। এখানে শুয়ে আছে টাইগার। গুহার এ জায়গাটা বেশ প্রশস্ত এবং উঁচু, দাঁড়ানো যায়। আলো কম হলেও মোটামুটি দেখতে পাচ্ছেন তাঁরা।

'বোঝাই যায় রনি এ গুহায় ঢুকেছিল,' বললেন র‍্যালফ, 'এ পর্যন্ত এসেও ছিল। কারণ টাইগার ওর গায়ের গন্ধেই এখানে এসেছে। জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা আর নীরব। এসো, দু'মিনিট জিরিয়ে নিই, তারপর ফিরব।'

ওরা বসে পড়লেন গুহার মেঝেতে, ভিনগ্রহের হন্তারক নজর দিল কুকুরটার ওপর। ক্লান্ত টাইগার আরাম পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে এবার কাজে লাগাতে হবে। তবে এখন না, একটু পরে।

'ভাবছি, রনি এখানে এসেছিল কেন?' নীরবতা ভেঙে বললেন জন।

'এটা তো সহজ যুক্তি, জন। অবচেতন মনে এখানে চলে এসেছিল ও। হয়তো ছোটবেলায় এ গুহাটা আবিষ্কার করেছিল রনি, হঠাৎ কোনও কারণে লুকোতে এসে পড়েছিল। অবচেতন মনে মানুষ কত কিছুই তো করে।'

'হয়তোবা। কিন্তু ওর লুকোবার দরকার পড়েছিল কেন? নাকি কোনও লুকানো জিনিস খুঁড়ে বের করতে এসেছিল রনি। কী জিনিস জানতে চেয়ো না, তবে এ গুহার নরম বালি কিন্তু হাত দিয়ে খোঁড়া যায়।'

'কিন্তু লুকোবেটা কী সে? আর খুঁড়তেই বা যাবে কেন?'

'জানি না আমি। তবে তেমন কিছু যদি আমাদের চোখে পড়ত–'

আর সময় নেই। লোকগুলো যেভাবে সন্দিহান হয়ে উঠেছে এখনই হয়তো মেঝে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে দেবে। তা হলেই সর্বনাশ। ভিনগ্রহের

হন্তারক মনোযোগ দিল ঘুমন্ত টাইগারের ওপর। দু'জনকে হয়তো খুন করা সম্ভব হবে না টাইগারের পক্ষে, তবে আকস্মিক হামলায় ওরা নিশ্চয়ই অপ্রস্তুত হয়ে যাবে, মেঝে খোঁড়ার কথা আর মনে থাকবে না। উল্টো দৌড়াতে হবে ডাক্তারের কাছে টাইগারের কামড়ের কারণে সৃষ্ট ক্ষতের চিকিৎসা করতে।

টাইগারের ওপর সওয়ার হলো ভিনগ্রহের প্রাণী। ঘুম থেকে জেগে উঠল জানোয়ারটা, মাথা তুলল। সেই মুহূর্তে র‍্যালফ বললেন, 'এখন খোঁড়াখুঁড়িতে কাজ নেই, জন। মেঝে খুঁড়ে কিছু পাব বলেও মনে হয় না। আর পরিষ্কার কিছু দেখাও যাচ্ছে না। আমাদের না আছে ফ্লাশলাইট না কোদাল বা বেলচা। আর এখন মেঝে খুঁড়তে গেলে লাঞ্চের আগে বাড়ি ফিরতে পারব না। তারচে' এখন বাড়ি যাই চলো। খোঁড়াখুঁড়ি যদি করতেই চাও, পরে রেডি হয়ে আসব'খন।'

বন্ধুর কথায় সায় দিলেন জন। টাইগার আবার মাথা নামিয়ে নিল। দু'বন্ধুর পেছন পেছন বেরিয়ে এল গুহা থেকে। ওদের সাথে বেশ খানিকটা পথ এক সাথে হাঁটল, হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পুবে, বাড়ি থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ছুটতে শুরু করল সে। জন কত ডাকাডাকি করলেন, কিন্তু কান দিল না টাইগার। আপন মনে দৌড়াতে লাগল।

মনিবের দৃষ্টির আড়াল হতেই লাফ মেরে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল টাইগার, তারপর এগোল গুহা অভিমুখে।

গুহায় ঢুকে নরম বালু খুঁড়ল টাইগার, কচ্ছপের খোলস বা ভিনগ্রহের হন্তারককে মুখে তুলে নিল। বেরিয়ে এল গুহা থেকে, খোলসটাকে সাবধানে নামিয়ে রাখল জমিনে। তারপর আবার গুহায় ঢুকল সে, একটু আগে খোঁড়া গর্তটাকে বুজিয়ে দিল সতর্কতার সঙ্গে। তারপর বোজানো গর্তের ওপর গড়াগড়ি খেল কয়েকবার। বোঝার উপায় রইল না এখানে কোনও গর্ত আছে। তারপর আবার কচ্ছপের খোলসটাকে মুখে তুলে নিল টাইগার। প্যাট্রিজ পাখির চেয়ে ভারি নয় ওটার শরীর, আর এত আলতোভাবে ধরে রেখেছে টাইগার যেন আহত পাখি মুখে করে নিয়ে চলেছে।

জঙ্গলে ঢুকল কুকুর, রাস্তা এমনকী গেম ট্রেইলও এড়িয়ে চলল, অত্যন্ত নির্জন জায়গা খুঁজছে। ঘন, লম্বা ঘাস, চারদিকে ঝোপের বেড়ার আড়ালে ছোট, ফাঁপা একটা কাঠের গুঁড়ি পেয়ে গেল। অন্তত কিছু সময়ের জন্যে এখানে লুকিয়ে থাকার কাজ চলবে। মুখ থেকে কচ্ছপের খোলটাকে ফাঁপা কাঠের গর্তে রাখল টাইগার, থাবা দিয়ে ধাক্কা মেরে ওটাকে ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। কারও বোঝার সাধ্য নেই এখানে গুঁড়ি আছে।

তারপর যে পথে এসেছিল সে পথে ফিরে চলল টাইগার। একশো গজ যাবার পর বসে পড়ল। ভিনগ্রহের হন্তারক তখন ভাবছে কী করা যায়।

ভিনগ্রহের প্রাণী এখন নিরাপদেই আছে। ওই লোকগুলো এখন সমস্ত

গুহা খুঁড়ে ফেললেও তার কিছু এসে যাবে না। কিন্তু কথা হলো, কুকুরটাকে সে কি আরও কিছুক্ষণের জন্যে নিজের হোস্ট করে রাখবে? ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল সে। তারপর সিদ্ধান্তে পৌঁছল–জানোয়ারটা তার উদ্দেশ্য পূরণ করেছে। এখনও ওটাকে বাঁচিয়ে রাখলে সে অন্য কারও ওপর সওয়ার হতে পারবে না। এখন তার দরকার অন্য কোনও হোস্ট। হতে পারে সেটা বাজ, পেঁচা বা হরিণ। কিন্তু এগুলোকে ভালমত পর্যবেক্ষণ করার সময় সে পাবে না যতক্ষণ টাইগারের ওপর সওয়ার হয়ে থাকবে। কাজেই ওর মরে যাওয়াই ভাল।

টাইগার এবার রাস্তায় উঠে এল। দাঁড়িয়ে থাকল এক কোণে। দূর থেকে একটা গাড়ি আসছে। ড্রাইভার কিছু বুঝে ওঠার আগেই, গাড়িটা তার সামনে আসতেই, চাকা লক্ষ্য করে লাফ দিল টাইগার। সাথে সাথে পিষে ভর্তা হয়ে গেল কুকুরটা।

টাইগারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভিনগ্রহের হন্তারক, আশ্রয় নিল নিজের খোলের মধ্যে। ভেবে আমোদিত হলো এবার সে আর কোন ভুল করেনি।

হ্যাঁ, ভুল তার হত না, যদি গাড়িটার আরোহী ড. সি. আর. আবরার না হয়ে অন্য কেউ হত। তার আসলে অপেক্ষা করা উচিত ছিল অন্য গাড়ির জন্য। কারণ, ভিনগ্রহের হন্তারকের জানা নেই টাইগারকে ড. সি. আর. আবরারের গাড়ির নীচে ফেলে দিয়ে আসলে সে নিজের নিয়তিকেই ডেকে এনেছে।

ছয়

ড. সি. আর. আবরার ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অভ টেকনোলজি'র পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন। পিএইচডি করতে আমেরিকায় আসার পরে আর দেশে ফিরে যাননি। ডক্টরেট নেয়ার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই থেকে গেছেন। অসম্ভব মেধাবী, পঞ্চাশোর্ধ্ব মানুষটিকে বেঁটেই বলা যায়–টেনেটুনে পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি হবেন। তাঁর কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল রাতের মত কালো, মাঝেমধ্যে ঝিলিক দেয় দু'একটি রুপোলি কেশ। চিরকুমার এই ভদ্রলোকের চেহারার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো বুদ্ধিদীপ্ত চোখ জোড়া। কোনও কারণে রেগে গেলে বা অবাক হলে ও দুটো বাদামী হিরের মত ঝকঝক করে জ্বলতে থাকে।

এ মুহূর্তে তিনি ছুটিতে আছেন। তাঁর পরনে ঢিলেঢালা পোশাক, মুখে কয়েকদিনের না কামানো দাড়ি। দেখে বোঝার উপায় নেই এ মানুষটি

দেশের সবচে' পণ্ডিত ব্যক্তিদের একজন।

টাইগার যে তাঁর গাড়ির নীচে চাপা পড়ল, এ জন্যে আবরারকে মোটেই দোষ দেয়া যায় না। কুকুরটা যেন শূন্য থেকে উদয় হয়েছিল তাঁর সামনে। তিনি ব্রেকও কষেছিলেন। কিন্তু তাঁর আগেই দফারফা হয়ে গেল টাইগারের।

পশুপ্রেমী প্রফেসরের জানোয়ারটার দশা দেখে বেশ মন খারাপ হলো। কার কুকুর এটা? প্রফেসর ঠিক করলেন শহরে নিয়ে যাবেন লাশ। খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করবেন কুকুরের মালিকের। তারপুলিন দিয়ে টাইগারের লাশ ভালভাবে জড়িয়ে নিয়ে গাড়িতে আবার স্টার্ট দিলেন আবরার।

বার্টলসভিলে পৌঁছে দু'এক জায়গায় খোঁজ নেয়ার পর জানা গেল এটা জন বেরেটের কুকুর। তবে জন বাড়ি নেই। আদালতে গেছেন ইনকোয়েস্টে। আবরার ওখানেই রনির কথা জানতে পারলেন। শুনলেন জনের একমাত্র ছেলে রনি আত্মহত্যা করেছে।

আদালতে গিয়েও জনকে পাওয়া গেল না। শুনানি শেষে মরচুয়ারিতে গেছেন ছেলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে কথা বলতে। আবরার তখন শেরিফের সাথে কথা বললেন। কুকুরটা হঠাৎ আবরারের গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলেন শেরিফ। বললেন, 'যদ্দূর জানি জনের কুকুরটা ছিল কারশাই জাতের। গাড়ি দেখলে এক মাইল দূর থেকে ছুটে পালাত।'

'তাই নাকি?' অবাক হলেন আবরারও। 'তা হলে কুকুরটার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নইলে ওভাবে ছুটে আসবে কেন আমার গাড়ি লক্ষ্য করে। ভাল কথা—আপনাদের এলাকায় র‍্যাবিস রোগের কোনও কেস আছে?'

'বহুদিন হলো আমরা ও রোগটার কবল থেকে মুক্ত, মি. আবরার,' নীরস গলায় জবাব দিলেন শেরিফ। একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন ডক্টর, তারপর বললেন, 'শুনলাম রনি নামে একটা ছেলে মারা গেছে। ওর কি অটোপসি করা হয়েছে?'

'অটোপসি? কেন, কীসের জন্য? ও তো আত্মহত্যা করেছে।' ভুরু কুঁচকে জবাব দিলেন শেরিফ।

'এখানে আর কোনও অদ্ভুত মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, শেরিফ?'

কৌতুকের দৃষ্টিতে ডক্টরের দিকে তাকালেন শেরিফ।

'অদ্ভুত বলতে কী বোঝাতে চাইছেন বুঝতে পারছি না। এখানে গত কয়েক বছরে কিছু হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। ওগুলো এখনও অমীমাংসিতই রয়ে গেছে। তবে সেগুলো ছিল স্রেফ ডাকাতির জন্যে খুন। ওসবের মধ্যে অদ্ভুত কোনও ব্যাপার ছিল না। কিছু মনে করবেন না, মি. আবরার, আপনি কি ভার্সিটিতে অপরাধ বিজ্ঞান পড়ান?'

'না,' মৃদু হেসে জবাব দিলেন আবরার। 'আমি পদার্থ বিজ্ঞান পড়াই।

বিশেষ করে ইলেক্ট্রনিক্স নিয়ে নাড়াচাড়া করি। আমি স্যাটেলাইট প্রোগ্রামের ওপরেও কিছু কাজ করেছি।'

'তার মানে রকেট?' শেরিফের গলার স্বরে সম্ভ্রম ফুটল।

'না, রকেট না। বেশিরভাগই স্যাটেলাইটের ডিটেকটর এবং ট্রান্সমিটিং সেট নিয়ে কাজকারবার। আমি প্যাডলহুইল স্যাটেলাইটের ডিজাইনও করে থাকি। তবে এ মুহূর্তে মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত।'

'বেশ, বেশ! কোথায় উঠেছেন আপনি?'

'এখান থেকে মাইল দশেক দূরে এক খামার বাড়িতে। জায়গাটার নাম ওল্ড বার্টন প্লেস...'

'হেস্টিংস-এর খামার বাড়ি তো? চিনেছি। হেস্টিংস-এর সাথে আগে দু'একবার মোলাকাত হয়েছে। তা একা নাকি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন?'

'বিয়ে-থা করিনি এখনও। একা থাকতেই ভাল লাগে। যাকগে, শেরিফ। আজ উঠি। জনের কুকুরের লাশটা নিয়ে গেলাম। ওকে বলবেন আমি লাশ কবর দিয়ে দেব।'

শেরিফের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের গাড়িতে উঠলেন ড. আবরার। মনটা খচখচ করছে। রনি আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু আত্মহত্যার ব্যাপারটা মেনে নিতে চাইছে না তাঁর যুক্তিবাদী মন। মানুষ প্রাথমিক কোনও লক্ষণ ছাড়াই হঠাৎ পাগল হয়ে যেতে পারে না বা আত্মহত্যাও করে না। আর কুকুরটা নিশ্চয়ই র‍্যাবিস আক্রান্ত ছিল। নইলে অমন উন্মাদের মত আচরণ করবে কেন? শেরিফ বললেন ওটা গাড়ি-ঘোড়া ভয় পেত। তা হলে, আবরারের গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কেন? ওটাও আত্মহত্যা? কিন্তু লেমিং ছাড়া অন্য কোনও পশু আত্মহত্যা করে বলে শোনেননি আবরার।

হঠাৎই সিদ্ধান্ত নিলেন ডক্টর গ্রীনবে-র গবেষণাগারে কুকুরটার লাশ পাঠাবেন পরীক্ষার জন্যে তা হলে জানা যাবে টাইগারের র‍্যাবিস ছিল কি না। গ্রীনবে এখান থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে। আর এখন বাজে মাত্র তিনটা। তিনি গ্রীনবের হাসপাতালে টাইগারের লাশ পরীক্ষার জন্যে রেখে আসার প্রচুর সময় পাচ্ছেন হাতে। সন্ধ্যেটা ভাল কোনও রেস্টুরেন্টে ডিনার খেয়ে, তারপর ছবি দেখে সকাল সকাল ফিরে আসা যাবে বাড়িতে।

তাই করলেন আবরার। গ্রীনবের হাসপাতালে গেলেন টাইগারের লাশ নিয়ে। ডিনার খেলেন, ব্রিজিত বার্দোর একটি সিনেমা দেখলেন, তারপর সাড়ে দশটা নাগাদ, উইলকক্সে, তাঁর বন্ধুর হেস্টিংস-এর খামার বাড়িতে ফিরে এলেন।

বাড়িটি বেশ বড়, ওপর তলায় তিনটি বেডরুম, যদিও দুটো রুম শুধু ফার্নিশড করা। একটা বাথ। নীচতলায়ও তিনটে ঘর, বড় একটা কিচেন, লিভিং রুমটাও বেশ বড়সড়, আর বাড়তি একটা কামরা আছে, স্টোররুম

হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ ঘরে আবরার তাঁর বন্দুক এবং মাছ ধরার সরঞ্জাম রেখে দিয়েছেন। বেজমেন্টে ছোট গ্যাসোলিন ইঞ্জিনচালিত জেনারেটর আছে, বিরতিহীন বিদ্যুৎ উৎপাদন করে চলেছে। একই ইঞ্জিনের সাহায্যে পাম্প করে ছাদের ট্যাঙ্কিতে পানি তোলার ব্যবস্থা আছে। এ বাড়িতে ফোন নেই, তবে প্রফেসরের তাতে কোনও অসুবিধেও নেই। বরং তিনি খুশি ফোন নামের মূর্তিমান যন্ত্রণাটার হাত থেকে রেহাই পেয়ে। এ বাড়ির দক্ষিণ দিকে একসময় খামার ছিল, কোনও কারণে ওটা এখন পরিত্যক্ত। বাড়ির চারপাশে উঠোন, মিশেছে ঝোপঝাড় আর জঙ্গলের সাথে, জায়গাটাকে রহস্যময় এবং বুনো করে তুলেছে। উত্তর দিকে শুধু একটা রাস্তা, শহরের সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। তবে ওদিকেও ঘন জঙ্গল।

সবমিলে জায়গাটা ডক্টরের এতদিন ভালই লাগছিল, শুধু আজকের রাতটা ছাড়া।

আবরার ফ্রিজ খুলে বিয়ারের ক্যান বের করে একটা রহস্য উপন্যাস নিয়ে বসলেন। কিন্তু পড়ায় মন দিতে পারলেন না। কেন জানি অস্বস্তি লাগছে তাঁর। এখানে আসার পর এই প্রথম খুব একা এবং নিঃসঙ্গ লাগছে। জানালার পর্দা নামিয়ে দেয়ার একটা দুরন্ত ইচ্ছে অনেক কষ্টে দমিয়ে রাখলেন তিনি। কারণ তাঁর মনে হচ্ছিল কেউ বুঝি তাঁকে বাইরে থেকে লক্ষ করছে। কিন্তু জানালায় দাঁড়িয়ে কে তাঁকে লক্ষ করবে? কোনও জানোয়ার? জানোয়ার হলেই বা কি এসে যায়? কেউ তাঁকে দেখছে, ভাবনাটা নিজের কাছেই এক সময় হাস্যকর ঠেকল। তিনি জোর করে পড়ায় মন দিলেন। খানিক পর খেয়াল করলেন বইয়ের পাতায় চোখ বোলাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু একটা লাইনও পড়ছেন না। বারবার রনি আর কুকুরটার কথা মনে পড়ছে। শেষে নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠলেন আবরার। কাল তো টাইগারের রিপোর্ট পাওয়াই যাবে। যদি দেখেন কুকুরটার সত্যি সত্যি র‍্যাবিস হয়েছিল, তা হলে ব্যাপারটা চুকে গেল। এ নিয়ে আর ভাববেন না। ছুটি কাটাতে এসেছেন। মজা করে ছুটি কাটিয়ে চলে যাবেন...কিন্তু টাইগারের যদি র‍্যাবিস ধরা না পড়ে...

আরও এক ক্যান বিয়ার গলায় ঢাললেন প্রফেসর, একসময় ঝিমুনি ভাব এল। বিছানায় গেলেন তিনি। খানিক পর ঘুমিয়েও পড়লেন।

সাত

ভিনগ্রহের হন্তারক এখনও সেই ফাঁপা কাঠের গুঁড়ির মধ্যেই ঘাপটি মেরে আছে। টাইগার তাকে এখানে রেখে যাবার পর থেকে সে আস্তানা ছেড়ে একপাও নড়েনি। শুধু একবারের জন্যে একটা কাকের ওপর ভর করেছিল। আশপাশের এলাকা দেখার ইচ্ছে জেগেছিল তার। রাতের বেলা ঘুমন্ত এক কাকের ওপর সওয়ার হয় সে। কিন্তু কাক রাতে ভাল দেখতে পায় না বলে ওই সময় আর বেরোয়নি সে। বেরিয়েছে সকালে। কাকের চোখ দিয়ে আশপাশের অনেকটা এলাকা মোটামুটি জরিপ করে এসেছে। দেখেছে কোন্ ধরনের লোকজনের বাস এখানে। রাস্তার একেবারে শেষ মাথায় উড়ে গিয়েছিল কাক। ওখানে একটা স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সে। বার্টলসভিলের ওপরে চক্কর দিয়েছে বারকয়েক। তাকে সবচে' আকর্ষণ করেছে রেডিও-টিভি মেরামতের একটি দোকান। এ দোকান যে লোক চালায় তার নিশ্চয়ই ইলেক্ট্রনিক্স সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান আছে। কাজেই এ লোক তার ভাল হোস্ট হতে পারবে। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও। কিন্তু রনির স্মৃতি যেটুকু ধারণ করে আছে সে, তাতে রিপেয়ারম্যানের নাম পরিচয় নেই তার। এসব জানতে হলে আরও ব্যাপক অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

বার্টলসভিল পরিক্রমা মোটামুটি শেষ হলে সে কাকটাকে পেভমেন্টের ওপর ডাইভ দিতে বাধ্য করে তাকে হত্যা করেছে। কাকের কাজ শেষ। কাজেই ওটাকে আর জঙ্গলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজন বোধ করেনি সে। কাকের মৃত্যুর সাথে সাথে ভিনগ্রহের হন্তারক ফিরে গেছে নিজের নিরাপদ আশ্রয়ে।

ওই আশ্রয়স্থলটি আগেরটার চেয়ে ভাল জঙ্গলের একেবারে গভীরে বলে নানা পশুপাখি চেনার সুযোগ তার হয়েছে। প্রাণীগুলো প্রায়ই তার আস্তানার সামনে দিয়ে হাঁটা চলা করছে: হরিণ, ভালুক, ভোঁদর আরও কত কী। কত রকম পাখিও দেখেছে সে। এর মধ্যে দুটো পাখি পছন্দ হয়েছে তার হোস্ট হিসেবে—পেঁচা এবং চিকেন হক। এসব প্রাণীর যে কোনওটার ওপর যে কোনও সময় সে ভর করতে পারে। দশ মাইলের মধ্যে এগুলোর একটাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলেই হলো।

ছোট ছোট প্রাণীও পরীক্ষা করে দেখেছে সে। যেমন সাপ। তবে হোস্ট হিসেবে সাপ পছন্দ হয়নি তার। এগুলোর গতি ধীর—আর মরতেও সময় নেয় বেশি। দেখা গেল রাস্তায় উঠেছে মরতে, গাড়ির জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা

করার পর একটাতে চাপা পড়ে গেলেও সাপ যে সত্যি সত্যি মারা যাবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? পিঠ ভেঙে যাবার পরেও অনেকক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে সাপ।

কাজেই সে চুপচাপ বসে আছে। কাকে হোস্ট বানানো যায় তাই ভাবছে। এমন সময় তার খিদে পেল। ভিনগ্রহের এই প্রাণীটির খিদেও পায়। তারও পুষ্টির প্রয়োজন। সে যে গ্রহ থেকে এসেছে, ওখানকার অধিবাসীদের জন্ম মূলত পানি থেকে। পানি থেকে সরাসরি মাইক্রোঅর্গানিজম শুষে নিয়েছে নিজেদের মধ্যে। প্রটেকশন বা নিরাপত্তার জন্যে তারা শরীরের ওপর কচ্ছপের খোলের মত খোলস পেয়েছে। অন্যদের হোস্ট বানানো বা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তারা পেয়েছে অনেক পরে, নিজেদের বুদ্ধিমত্তার সমৃদ্ধি ঘটার সঙ্গে। তারপর তারা পানি ছেড়ে ডাঙায় উঠে এসেছে। ডাঙায় যে সব প্রাণী ঘুমাচ্ছিল, তাদের ওপর তারা সওয়ার হয়েছে। ডাঙার প্রাণীদের মেরে তারা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার শুরু করে কয়েকশো কোটি বছর আগে, তাদের গ্রহে। মানুষের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান এবং শক্তিশালী হলেও এদের পুষ্টি প্রয়োজন হয় মানুষের মতই। তবে মোটামুটি একবার খাওয়ার পর কয়েকমাস না খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারে তারা। পানির বাসিন্দা বলে তরল খাদ্যই এদের প্রিয়। আর খিদে পেলে, খাবার না জুটলে এরা দুর্বল হয়ে পড়ে। যেমন, ভিনগ্রহের হন্তারকের এখন খুব খিদে পেয়েছে। কীভাবে খাবার জোগাড় করা যায় তাই ভাবছে। সুপ বা দুধ পেলেই তার চলে যাবে। কিন্তু খাবারটা জোগাড় করে দেবে কে? এ ক্ষেত্রে মানুষ হোস্টকেই তার পছন্দ হলো। আর তার আশপাশে এরকম হোস্ট আছে এক বৃদ্ধ জার্মান দম্পতি হেলমুট এবং নিকোল কোহ্‌ল। ওরা কাছের এক ফার্ম হাউজে থাকে। ওদের কাউকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলেই হলো। খাবার সমস্যা মিটে যাবে। কিন্তু আগে তো খামার বাড়িতে তাকে পৌঁছতে হবে।

ভিনগ্রহের প্রাণী খামার বাড়িতে যাবার জন্য বেছে নিল এক ঘুমন্ত পেঁচাকে। ওটাকে উড়িয়ে নিয়ে এল কোহ্‌লদের খামার বাড়ির ওপর।

পেঁচাটা ভিনগ্রহের হন্তারক অর্থাৎ কচ্ছপের খোলাটাকে নখে বাধিয়ে নিয়ে এসেছে। সে বাড়ি ঘিরে একবার চক্কর দিল। ফার্ম হাউজটা অন্ধকার, নীরব। সম্ভবত কুকুর-টুকুর নেই। ভিনগ্রহের অপরাধীর ইচ্ছে এ বাড়ির কোথাও লুকিয়ে থাকবে। লুকোবার চমৎকার জায়গাও পাওয়া গেল–কাঠের সিঁড়ির নীচে, যেটা মিশেছে ব্যাকডোরের সাথে। পাশেই খড়ের গাদা। এখানে আসার কারণ একটাই–এখন থেকে মানুষকে হোস্ট বানানো সহজ হবে তার জন্যে। তা ছাড়া খড়ের গাদার আশপাশে কী ধরনের প্রাণীর বাস তাও দেখা যাবে। প্রয়োজনে গৃহপালিত কোনও প্রাণীর ওপর সওয়ার হবে সে।

পেঁচাটা সিঁড়ির নীচে ভিনগ্রহের প্রাণীটাকে লুকিয়ে ফেলল। এখন আর ওকে প্রয়োজন নেই। পেঁচাটাকে ডাইভ দেওয়াল সে বাড়ির শক্ত দেয়াল লক্ষ্য করে। তবে ভুল হয়ে গেল। পেঁচাটা ডাইভ দেয়ার সময় চোখ বুজে ছিল। তাই দেয়ালে না লেগে আছড়ে পড়ল জানালার ওপর। ভেঙে গেল জানালার কাঁচ। ঝনঝন শব্দে জেগে উঠল কোহ্‌ল দম্পতি। তাড়াতাড়ি নেমে এল বাইরে। একটা পেঁচা মাটিতে পড়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে দেখে অবাক হয়ে গেল ওরা। বুড়ো হেলমুট বন্দুকের এক গুলিতে পেঁচাটাকে যন্ত্রণার হাত থেকে চিরতরে রেহাই দিয়ে দিল। বলল, 'বেচারা বোধ হয় অন্ধ। দেখতে পায়নি। তাই ওড়ার সময় জানালায় ধাক্কা খেয়েছে।'

'এটাকে নিয়ে কী করবে এখন?' জানতে চাইল বুড়ি। 'এভাবে ফেলে রাখবে?'

'কাল সকালে কবর দেব,' গরগর করল হেলমুট। 'ব্যাটার জন্য কাল আবার আমাকে শহরে যেতে হবে গ্লাস কিনতে।'

'কাল যেতে হবে না,' বলল তার স্ত্রী। 'শনিবার গেলেই চলবে। আমি ফাঁকা জায়গায় কাপড় টাঙিয়ে দেব। এখন চলো শোবে।'

বুড়ো-বুড়ি ঢুকে পড়ল নিজেদের বেডরুমে। খানিকপর আগের মত আবার নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল গোটা বাড়ি। ভিনগ্রহের প্রাণী দেখল বুড়ো-বুড়ি এখনও ঘুমায়নি। সে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা কখন ঘুমিয়ে পড়বে। এই ফাঁকে সে খামার বাড়ির গৃহপালিত প্রাণীগুলোর ওপর নজর বোলাতে লাগল। জানতে চায় হোস্ট হিসেবে কোনটাকে ভবিষ্যতে কাজে লাগানো যাবে।

এই বাড়িতে শুয়োর আছে একটা, একটা ঘোড়া, তিনটে গরু, কতগুলো ইঁদুর আর একটা বেড়াল। শুয়োর আর ইঁদুরগুলোকে প্রথমেই বাতিল করে দিল সে ওরা কোনও কাজে লাগবে না ভেবে। গরু বরং ওদের চেয়ে ভাল। গায়ে শক্তিও আছে বেশ। ধারাল শিং নিয়ে গরুগুলো যখন তখন কিলিং-মেশিনে পরিণত হতে পারে। ঘোড়াও তাই। গরুর চেয়েও এরা কাজের। দ্রুত দৌড়াতে পারে, সহজে টপকে যেতে পারে ছোটখাট বেড়া। আর ওদের খুরের লাথি শিং-এর গুঁতোর চেয়েও ভয়ঙ্কর।

সবশেষে রইল বেড়াল। এ প্রাণীটাকেই ভিনগ্রহের খুনের পছন্দ হয়ে গেল সবচে' বেশি। রনির ধার করা স্মৃতি থেকে সে জানে চার পেয়ে এই প্রাণীটা বেশ বুদ্ধিমান, রাতের আঁধারে এদের চোখ জ্বলে। এরা গুপ্তচর বৃত্তিতে খুবই পটু, তা ছাড়া বেশিরভাগ সময় ওরা ঘুমিয়ে কাটায় বলে এদের হোস্ট বানানো ভারী সোজা। স্রেফ পরীক্ষা করার জন্য সে একটা ঘুমন্ত বেড়ালের ওপর সওয়ার হলো। জেগে উঠল বেড়াল। সম্মোহিত অবস্থায় হাঁটা দিল। নাহ্, আঁধারে সত্যি চোখ জ্বলে এই প্রাণীটার। সব কিছু দিনের মত দেখতে পাচ্ছে। সে বেড়ালটাকে বাড়ির চারপাশে কয়েকবার চক্কর

দেওয়াল। নিঃশব্দে, সামান্য শব্দও না করে বেড়ালটার এই পরিভ্রমণ চমৎকৃত করে তুলল ভিনগ্রহের হন্তারককে। বেড়াল কেমন গাছ বাইতে পারে দেখার জন্য খড়ের গাদার পেছনে একটা গাছে ওটাকে তুলল সে। সরসর করে গাছের মাথায় উঠে গেল বেড়াল। মগডাল থেকে উঁকি দিল। আরেকটা খামার বাড়ি চোখে পড়ল, মুখ ফিরিয়ে আছে শহরের দিকে। এখন দেখা যাক বেড়াল কেমন গুপ্তচরের কাজ করতে পারে। গাছ থেকে বেড়ালটাকে নামাল সে, মাঠ ধরে ছোটাল পাশের খামার বাড়ির দিকে। রাতের আঁধারে ছায়ার মত ছুটে চলল বেড়াল।

ফার্ম হাউজে পৌঁছে দেখল দোতলার দুটো কাঁচের জানালায় আলো জ্বলছে। জানালার পাশে একটা গাছ। বেড়ালটা গাছে উঠল। তারপর উঁকি দিল জানালায়।

ঘরে, খাটের উপর একটা বাচ্চা শুয়ে আছে, কাশছে বেদম। বাথরোব পরা, স্লিপার পায়ে এক মহিলা করুণ মুখ করে ঝুঁকে আছে বাচ্চাটার ওপর। আর পাজামা পরা মোটা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। জানালা বন্ধ থাকলেও বেড়াল ওদের কথা পরিষ্কার শুনতে পেল। লোকটা মহিলার কাছে জানতে চাইছে ডাক্তারকে ফোন করবে কিনা।

দৃশ্যটা ভিনগ্রহের প্রাণীর মনে কোনও কৌতূহলের সৃষ্টি করল না। তবে সে সন্তুষ্ট হয়েছে বেড়ালের গুপ্তচর বৃত্তিতে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে সে বেড়ালকেই হোস্ট বানাবে। আপাতত এটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাক।

রেহাই মিলল সহজেই। এ খামার বাড়িতে ভয়ানক হিংস্র স্বভাবের একটা কুকুর বাঁধা ছিল শিকল দিয়ে। সে সম্মোহিত বেড়ালটাকে গাছ থেকে নামিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল গোলাবাড়ির কোণার দিকে, ওখানেই বাঁধা কুকুরটা, বেড়ালটাকে দেখেই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গর্জন ছাড়তে লাগল কুকুরটা। গোলাবাড়ির জানালায় এসে দাঁড়াল বেড়াল, ঘন অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিল। তারপর লাফ দিল কুকুরটার হাঁ করা ধারাল চোয়াল লক্ষ্য করে।

আট

ভিনগ্রহের হন্তারক কোহলদের গোলাবাড়ির সিঁড়ির নীচে, নিজের শরীরের মধ্যে আবার ফিরে এল। সতর্ক হয়ে লক্ষ করল বাড়িতে কোহ্ল আর তার স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ আছে কিনা। কুকুর থাকলে ঘেউ ঘেউ করে উঠে ওদের জাগিয়ে দিতে পারে। নাহ্, কুকুর নেই, শুধু নীচের ঘরে, সম্ভবত লিভিংরুমে

খাঁচায় পোরা একটা ক্যানারি পাখি আছে। ওই ঘরে তার হোস্টের যাবার প্রয়োজন হবে না।

দোতলার বেডরুমে হেলমুট এবং নিকল কোহল ইতোমধ্যে নাক ডাকার প্রতিযোগিতা শুরু করেছে।

হেলমুটের মনের ভেতর ঢুকে গেল ভিনগ্রহের প্রাণী। এক লহমায় জেনে ফেলল অনেক কিছুই।

হেলমুট ক্লাস সিক্স পাস, বাইরের জগৎ সম্পর্কে তার জ্ঞান খুবই কম। তবে দুটো জিনিস জেনে উপকার হলো ওটার। জানল, হেলমুটের স্ত্রী'র ঘুম অত্যন্ত গাঢ়, কানের পাশে বোমা ফাটলেও সে ঘুম থেকে জাগবে না। আর আসল ব্যাপার হলো-ভিনগ্রহের প্রাণী এতক্ষণ যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেছে। ওদের বাড়ির ফ্রিজে অনেক খাবার আছে। বিশেষ করে সুপ আর গরুর ঝোলের কথা জেনে খিদেটা চাগিয়ে উঠল। ওর পুষ্টির অভাব ঘোচাতে পারবে দুটো জিনিসই। এই দম্পতি ওখানে না থাকলে হয়তো তাকে ফ্রিজ খুলে মাংস রেঁধে ঝোল খেতে হত। তবে সেটা কতটুকু পুষ্টিকর হত সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে ভিনগ্রহের খুনীর।

তার নির্দেশে বিছানা ছেড়ে নিঃশব্দে উঠে পড়ল হেলমুট। পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল বেডরুমের দরজার দিকে। সাবধানে খুলল, তারপর সতর্কতার সাথে ভিজিয়ে দিল। এরপর এগোল কিচেনের দিকে।

ফ্রিজ খুলে সুপের জার আর মাংসের বাটি বের করল হেলমুট, দুটো একসাথে ঢালল একটা প্যানে, ভিনগ্রহের প্রাণীটা পেটপুরে যতটুকু খেতে পারে ততটুকু। দুটো তরল পদার্থ এক সাথে মিশিয়ে সে গ্যাসের স্টোভ জ্বালল। অল্প আঁচে গরম করল সুপ আর ঝোলের মিশ্রণটা। তারপর প্যান নিয়ে চলে এল বাইরে, গোলাবাড়ির সিঁড়ির সামনে। ঘন ঝোলের প্যান সিঁড়ির নীচে রেখে কচ্ছপের খোলটাকে বের করে আনল, ছেড়ে দিল তরলটার মধ্যে। তারপর দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

ঝোল খেতে খেতে ভিনগ্রহের প্রাণী হেলমুটের মনের আরও গভীরে ঢুকে তার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য বের করে আনতে লাগল।

হেলমুটের বয়স পঁয়ষট্টি। সে একাচোরা স্বভাবের মানুষ। তার কোনও বন্ধু নেই। সে কাউকে পছন্দ করে না। অন্যরাও তাকে পছন্দ করে না। এমনকী তার স্ত্রীও নয়। একে অন্যের প্রতি কারও বিন্দুমাত্র টান নেই। তারপরও দু'জনে একই ছাদের নীচে আছে স্রেফ ভিন্ন কারণে। নিকোল কোহলের যাবার কোন জায়গা নেই, নিজের রোজগার করার সামর্থ্যও নেই। আর হেলমুটের তাকে দরকার সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজ করে দেয়ার জন্যে।

তাদের দুই ছেলেমেয়ে। তবে কেউই তাদের সাথে থাকে না, হেলমুটের

অত্যাচারে তারা বাড়ি ছেড়েছে অনেক আগেই। তারা শহরে থাকে। মাঝে মাঝে মাকে চিঠি লিখত। কিন্তু হেলমুট স্ত্রীকে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছে চিঠির জবাব দিতে। তারপর থেকে দু'পক্ষের কারও সঙ্গেই কোনও যোগাযোগ নেই। নিকল কোহ্‌ল জানেও না তার ছেলেমেয়েরা এখন কোথায় আছে, কেমন আছে।

হেলমুট বাতের রোগী। দিন দিন রোগটা বেড়েই চলেছে। কিন্তু সে ডাক্তার দেখাবে না। কারণ ডাক্তারের ওপর তার বিশ্বাস নেই। কারও সঙ্গেই সে মেশে না। তার বাড়িতে ফোন নেই, সে কাউকে চিঠি লেখে না, কোনও ব্যক্তিগত চিঠিও আসে না তার নামে। বার্টলসভিলে হেলমুট যায় ঘোড়ায় টানা গাড়িতে—শুধু শনিবার মুদি সদায় কিনতে। গাড়ি কেনেনি সে প্রয়োজন নেই বলে। দোকানে গেলেও কারও সাথে 'হাই, হ্যালো' বলার প্রয়োজন বোধ করে না হেলমুট, স্রেফ মাল কিনে চলে আসে। গত পনেরো বছরে নিজের খামার বাড়িতে থেকে বার্টলসভিলের বাইরে একপাও যায়নি সে। একেবারে নিঃসঙ্গচারী, অসামাজিক মানুষ বলতে যা বোঝায়, ঠিক তাই হেলমুট।

হেলমুটের মনের ভেতর ডুব দিয়ে কোনও লাভ হলো না ভিনগ্রহের হন্তারকের। এর কাছ থেকে কাজে লাগে, এমন কিছুই জানা গেল না। তথ্য সংগ্রহের জন্যে বরং বেড়ালের ওপর ভরসা করা চলে। কিন্তু হেলমুটের ওপর যতক্ষণ সে ভর করে আছে, ততক্ষণ অন্য কোনও প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করতে পারছে না সে। কাজেই ওকে পথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তার আগে দরকার ঝোলের বাটি থেকে উঠে পড়া এবং আগের আস্তানায় গর্ত খুঁড়ে লুকানো। কারণ ঝোল মেখে তার গায়ে গন্ধ হয়ে গেছে। কোনও প্রাণী গন্ধ শুঁকে অতি উৎসাহী হয়ে সিঁড়ির নীচে উঁকি মারলেই তাকে দেখতে পাবে। তখন তার বারোটা বেজে যাবে।

হেলমুট তাকে ঝোলের পাত্র থেকে তুলে নিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় চলে এল। মোটামুটি গভীর একটা গর্ত খুঁড়ল সে, তারপর সাবধানে কচ্ছপের খোলটাকে ভেতরে রেখে মাটি চাপা দিল। এখন আর কারও চোখে পড়ার সম্ভাবনা রইল না।

হেলমুট এবার ঘরে ঢুকল। প্রথমেই প্যানের অবশিষ্ট ঝোলটুকু ঢেলে ফেলে দিল ড্রেনে। তারপর যে জিনিসগুলো সে ব্যবহার করেছে, প্রতিটি জিনিস ভাল করে ধুয়ে ফেলল। প্যান, বাটি, জার ইত্যাদি ঠিকঠাক জায়গায় রেখে দিল। সব কাজ শেষে বসে পড়ল রান্নাঘরের টেবিলে। ভিনগ্রহের হন্তারক ওকেও আত্মহত্যায় বাধ্য করবে। তবে এবারের হত্যাকাণ্ড যাতে কারও মনে সন্দেহ জাগাতে না পারে সে জন্য হেলমুটকে দিয়ে একটা চিরকুট লেখাবে বলে ঠিক করেছে সে। রনি'র মৃত্যু থেকে এ শিক্ষাটা

পেয়েছে সে। রনি যদি লিখে যেতে পারত সে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে, তা হলে তাকে নিয়ে এত হৈ চৈ হত না। কাজেই হেলমুটের মৃত্যু এমনভাবে দেখাতে হবে যাতে কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না জাগে। সে হেলমুটকে দিয়ে লেখাল।

'বাতের ব্যথার যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। তাই আত্ম হননের পথ বেছে নিলাম।'

হেলমুট

নিজের নাম সই করে কিচেন ক্লজিট খুলল হেলমুট, বের করল শটগান। বন্দুকে গুলি ভরে আবার টেবিলে এসে বসল। মুখের ভেতর মাজল ঢুকিয়ে টেনে দিল ট্রিগার। রক্ত আর মগজ ছিটকে পড়ল চিরকুটের ওপর, তবে লেখাগুলো চেনা গেল।

সিঁড়ির গর্তের নীচে, নিজের শরীরের ভেতর ফিরে আসা ভিনগ্রহের প্রাণী তার উপলব্ধি ক্ষমতা দিয়ে শুনতে পেল গুলির শব্দের সাথে সাথে জেগে উঠেছে নিকল কোহল, দোতলা থেকে চিৎকার করে ডাকছে স্বামীর নাম ধরে। দেখল বেডরুমের আলো জ্বলে উঠেছে, তারপর হলঘর, সবশেষে নীচতলার ঘরের আলো।

নয়

ঘুম থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠলেন ড. আবরার, চিৎ হলেন, চোখের সামনে হাত এনে ঘড়ি দেখলেন।

সাড়ে দশটা বাজে। বাজতেই পারে। কাল অনেক রাতে ঘুমিয়েছেন তিনি। যাক, এবার গ্রীনবে-তে ফোন করে জানা যাবে কুকুরটার সুরতহাল রিপোর্ট।

মুখ হাত ধুয়ে বার্টলসভিলের স্থানীয় একটা ড্রাগস্টোরে ঢুকে গ্রীনবে-র হাসপাতালে ফোন করলেন আবরার। জানা গেল, কুকুরটার র‍্যাবিস হয়নি। আর তার শরীরে কোনও রোগও ধরা পড়েনি যার কারণে সে মাথা খারাপ হয়ে গাড়ির ওপর লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে পারে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রফেসর। ঘটনাটা শেরিফকে জানানো দরকার। তিনি হয়তো ব্যাপারটাতে আগ্রহ প্রকাশ করতে পারেন। কফি খেয়ে, ড্রাগস্টোর থেকে ফোন করলেন উইলকক্সে, শেরিফকে। অফিসেই পাওয়া গেল তাঁকে।

'ড. আবরার বলছি, শেরিফ,' বললেন প্রফেসর। 'জরুরী কিছু কথা আছে আপনার সাথে। এখানে আসতে পারবেন নাকি আমি যাব আপনার অফিসে?'

'আমি এক্ষুণি বার্টলসভিলের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছিলাম, ডক্টর।' জবাব দিলেন শেরিফ, 'কোত্থেকে বলছেন আপনি।'

'ড্রাগস্টোর থেকে। পাশের পাবে ঢুকছি আমি। আসুন, ড্রিঙ্ক খেতে খেতে কথা বলি।'

শেরিফ জানালেন আধ ঘণ্টার মধ্যে আসছেন তিনি।

এখানে প্রায়ই লাঞ্চ বা ডিনার করতে আসেন ডক্টর। হ্যানস উইস নামের এক মুদি দোকানদারের কাছ থেকে নিয়মিত গ্রোসারি কেনেন। পাবে মাঝে মাঝে পোকারও খেলেন। ফলে স্থানীয় লোকজনের সাথে দোস্তী হয়ে গেছে তাঁর। ড্রাগস্টোরের মালিকের সাথে গতরাতেও পোকার খেলেছেন তিনি। সে আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল, 'শেরিফকে ফোন করলেন শুনলাম, ডক। কোনও সমস্যা নয় তো?'

'আরে না! ওখানে কিছু খবর দেয়ার জন্যে ফোন করা।'

'ভাল কথা, ডক। আপনি তো বাসকোম্ব রোডে থাকেন, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালেন আবরার। 'হ্যাঁ। রাস্তার শেষ বাড়িটাতে। 'কেন?'

'আপনাদের ওদিকে কালরাতে একটা আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। শুনেছেন?'

ডক্টরের ঘাড়ের পেছনে কী যেন একটা কিলবিল করে উঠল। 'না, শুনিনি। এই মাত্র শহরে ঢুকেছি। কে মারা গেল?'

'এক বুড়ো। হেলমুট। শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে থাকত লোকটা। আপনার বাড়ি থেকে মাইল তিনেক দূরে। বুড়োর মৃত্যুতে কেউ তেমন মন খারাপ করেনি। কারণ কারও সাথেই সদ্ভাব ছিল না লোকটার।'

ওষুধের দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে শুধু এটুকুই জানা গেল, বুড়ো শটগান মুখে পুরে আত্মহত্যা করেছে। আর মরার আগে একটা চিরকুট লিখে গেছে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে পাবে ফিরে এলেন ডক্টর আবরার। বিয়ারের অর্ডার দিলেন। খানিক পর শেরিফ এসে ঢুকলেন পাবে। আবরারকে বিয়ার খেতে দেখে বললেন, 'টেনশনে আছি। শুধু বিয়ারে চলবে না। ডাবল বুরবনের অর্ডার দিন।'

বারটেন্ডারকে ডাবল বুরবনের অর্ডার দিয়ে শেরিফের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন প্রফেসর।

'হেলমুটের কথা বোধহয় শুনেছেন,' বললেন শেরিফ। 'কাল অনেক রাতে ওখান থেকে বাসায় ফিরেছি। ঘুমাতেই পারিনি। গড, ভয়ানক ক্লান্ত

আমি। এখন আবার কোহ্লের বাড়ি ছুটতে হবে।'

'আমি যদি আপনার সাথে যাই অসুবিধা আছে?' জানতে চাইলেন আবরার।

'না, অসুবিধা নেই। ফোন করেছিলেন কেন? কোহ্ল সম্পর্কে কথা বলতে?'

'না, ফোন করার আগেও আমি ব্যাপারটা জানতাম না। জনের কুকুরটাকে নিয়ে কথা বলতে চেয়েছি। ওটার র‍্যাবিস হয়নি।'

শেরিফ ঝোপের মত ভুরু তুলে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি চেক করেছেন নাকি? কুকুরটা কাউকে কামড়েছে?'

'না। কাউকে কামড়ায়নি। তবে কুকুরটা কার-শাই ছিল জানার পর ওটার প্রতি আমি কৌতূহলী হয়ে উঠি। জানতে চাই জানোয়ারটা অন্ধের মত কেন আমার গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। র‍্যাবিস থাকলে না হয় এর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যেত।'

'আরে, একটা সামান্য কুকুর নিয়ে এত ভাবছেন কেন আপনি? এ ধরনের কুকুর প্রায়ই গাড়ি চাপা পড়ছে। হয়তো খরগোশ ধরতে গিয়ে ওটা আপনার গাড়ির নীচে পড়েছে। এ নিয়ে নিশ্চয়ই রাতের ঘুম হারাম করছেন না আপনি?'

'না, তা নয়। তবে–আচ্ছা, শেরিফ, কোহ্লের আত্মহত্যার ঘটনায় অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েছে আপনার?'

'তেমন অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি। তবে দৃশ্যটা দেখে গা গুলিয়ে উঠেছে। গড, রক্ত আর মগজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে যা-তা অবস্থা।'

'কোনও মামলা বা ইনকোয়েস্ট হবে না?'

'কীসের ভিত্তিতে? কোহ্ল নিজের হাতে লিখে গেছে সে আত্মহত্যা করেছে।'

ড্রিংক খেতে খেতে টুকটাক আরও কথা হলো। শেরিফ পেঁচা এবং বেড়ালের কথাও জানালেন। পেঁচা এবং বেড়ালের মৃত্যুর কথা শুনে ডক্টর কেমন আড়ষ্ট হয়ে উঠলেন, লক্ষ করলেন না শেরিফ।

দশ

হেলমুট কোহ্ল আত্মহত্যা করার পর যে ঘটনাগুলো ঘটল, তা খুবই অবাক করে তুলল ভিনগ্রহের হন্তারককে। তার ধারণাতেও ছিল না একটা মানুষ, যে চিরকুট পর্যন্ত লিখে গেছে স্বইচ্ছায় আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে, তাকে

নিয়ে এত হৈ চৈ হবে।

হেলমুট মুখে বন্দুক পুরে ট্রিগার টেপার পরের দৃশ্যগুলো ভিনগ্রহের প্রাণীর স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে। হেলমুটের স্ত্রী গুলির শব্দে জেগে যায়, নীচে নেমে স্বামীকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তার সে কী চিৎকার। তখুনি দৌড়াতে দৌড়াতে চলে যায় সে প্রতিবেশী লুরসাটদের (যাদের বাড়িতে অসুস্থ বাচ্চা আছে) খবর দিতে। লুরসাট পরিবার সাথে সাথে শেরিফকে ফোন করে। ঘণ্টাখানেক পরে শেরিফ এসেছে। হেলমুটের স্ত্রীকে নানা জিজ্ঞাসাবাদও করেছে। নিকোল কোহ্‌ল কাঁদতে কাঁদতে তাকে বলেছে স্বামী চিরকুটে আত্মহত্যার কথা লিখলেও তার মনে পড়ে না বাতরোগটা হেলমুটকে অত বেশি কি কাবু করেছিল যে নিজেকে এভাবে ধ্বংস করে দিতে হবে?

ভিনগ্রহের প্রাণী মানুষগুলোর আচরণ যত দেখেছে ততই অবাক হয়েছে। যে লোক আত্মহত্যা করেছে, আত্মহত্যার কারণও ব্যাখ্যা করে গেছে, তার মৃত্যুকে ঘিরে এত প্রশ্ন কেন সবার?

পরদিন দুপুরে শেরিফ আবার এলেন হেলমুটের বাড়িতে। এবার তাঁর সাথে আরও একজন আছেন। লোকটির সাথে বিধবা কোহ্‌লের পরিচয় করিয়ে দিলেন শেরিফ। লোকটির নাম আবরার, পেশায় বিজ্ঞানী, বার্টলসভিলে এসেছেন ছুটি কাটাতে। রনির রহস্যময় আত্মহত্যার ঘটনা তাঁকে কৌতূহলী করে তুলেছে। তিনি এ মৃত্যুর একটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা খুঁজছেন। আর হেলমুটের আকস্মিক আত্মহত্যার ঘটনা তাঁর কৌতূহল আরও বেশি বাড়িয়ে দেয়। কারণ এত অল্প সময়ে দুটো আত্মহত্যার ঘটনা সচরাচর দেখা যায় না। আবরার এ ব্যাপারে বিধবা নিকোল কোহলের সাথে দু'একটা কথা বলতে চান। অবশ্য তিনি যদি অনুমতি দেন তা হলে।

নিকোল কোহ্‌ল কথা বলতে আপত্তি করল না। শুধু তাই নয় সে ওদের জন্যে কফিও বানিয়ে আনল।

ছোটখাটো আবরারের কৌতূহল অপরিসীম। কমপক্ষে একশো প্রশ্ন করলেন তিনি নিকোল কোহ্‌লকে। নিকোল কোহ্‌ল সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিল। লুরসাটদের বাড়িতে বেড়ালের মৃত্যু বা ফ্রিজ থেকে সুপ আর মাংসের ঝোল অদৃশ্য হবার ব্যাপারগুলো আবরারকে কৌতূহলী করে তুলল।

আবরার এবং কোহ্‌লের কথোপকথন সবই শুনতে পাচ্ছে ভিনগ্রহের প্রাণীটি। লোকটার ব্যাপারে সে আগ্রহ বোধ করছে। কী ধরনের বিজ্ঞানী এই লোক? একে হোস্ট বানালে কেমন হয়? এ নিশ্চয়ই বার্টলসভিলের টেলিভিশন মেকানিকের চেয়ে চৌকস হবে। সে সিদ্ধান্ত নিল এ লোকের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে হবে। কোথায় থাকে জানা দরকার। তাকে হোস্ট বানালে কতটুকু উপকারে সে আসবে তাও জানা দরকার। তবে আবরার

নামের লোকটিকে বিশ্লেষণ করার সুযোগ তার আর হলো না। কারণ সে প্রশ্নপর্ব শেষ করে উঠে পড়েছে, চলে যাচ্ছে শেরিফের সাথে নিজের গাড়িতে, ক্রমশ সরে যাচ্ছে রেঞ্জের বাইরে।

যাক, ক্ষতি নেই। সে এরকম হোস্ট বহু পাবে। শেরিফ এবং আবরার মিসেস কোহলের সাথে অনেক কথাই বলেছেন। ভিনগ্রহের হন্তারক জানতে পেরেছে মিসেস কোহ্ল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন খামার বাড়ি বিক্রি করে তার ছেলে বা মেয়ের কাছে চলে যাবে। তার মেয়ে মার্থা শেষ চিঠিটি মাকে লিখেছিল সিনসিনাটি থেকে, ছেলে ম্যাক্স থাকত মিলওয়াকিতে। শেরিফ মহিলাকে কথা দিয়েছেন তার ছেলে-মেয়েদের ঠিকানা খুঁজে বের করবেন। কাজটা তাঁর পক্ষে সহজ। কারণ ওই দুটি রাজ্যের পুলিশ শেরিফের বন্ধু মানুষ।

মিসেস কোহ্ল খামার বাড়ি বিক্রি করতে চেয়েছে তার প্রতিবেশী লুরসাটদের কাছে। তা করুক। তাতে ভিনগ্রহের প্রাণীর কোনও অসুবিধে নেই। একবার ভেবেছিল মিসেস কোহ্লকে তার হোস্ট বানাবে। কিন্তু পরক্ষণে নাকচ করে দিয়েছে চিন্তাটা। কারণ মিসেস কোহ্লকে হোস্ট করা মানে তাকে হত্যা করা। মিসেস কোহলের মৃত্যুও অ্যাক্সিডেন্টের আদলে ঘটানো যায়। কিন্তু তাতে সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই হবে বেশি। কারণ খামার বাড়িতে পরপর দুটি মৃত্যু লোকজনের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলবে।

তাড়াহুড়োর কিছু নেই। সে সবসময় অপেক্ষাকৃত ভাল হোস্ট খুঁজছে। শেরিফ নিকোল কোহ্লের চেয়ে হোস্ট হিসেবে অনেক ভাল। কিন্তু সে এখানে থাকে না, তাকে উইলকক্সে, অনেক দূরে, তার রেঞ্জের বাইরে। আপাতত এ শহরে তার রেঞ্জের মধ্যে আছে রেডিও টেলিভিশন রিপেয়ারম্যানটা। তবে ওর কাছে যেতে হবে অন্য হোস্টের ওপর নির্ভর করে, এমন একজন হোস্ট যে গুপ্তচরের কাজ করতে পারে চমৎকার। আর এ কাজে বেড়ালের তুলনা নেই।

কাজেই সে খামার বাড়ির ঘুমন্ত এক বেড়ালকে টার্গেট করল আবার।

এগারো

দুপুরের ঠিক আগে আগে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হলো বার্টলসভিল শহরে। রেডিও এবং টেলিভিশন রিপেয়ারম্যান বিলি র‍্যামন তার দোকানের জানালা দিয়ে বৃষ্টি দেখছিল। ভাগ্য ভাল খাবার নিয়ে এসেছে। লাঞ্চ করতে আর বৃষ্টিতে ভিজে রেস্টুরেন্টে ঢুকতে হবে।

বিলি র‍্যামনের ব্যবসার অবস্থা ভাল না। আকণ্ঠ ডুবে আছে দেনার

বোঝায়। তিন বছর আগে ভুল একটা সিদ্ধান্তের খেসারত দিতে হচ্ছে এখন তাকে। ভেবেছিল বার্টলসভিলে রেডিও টিভি সারানোর দোকান দিলে খদ্দেরের অভাব হবে না। এ শহরের সবার বাড়িতেই রেডিও আছে, কিছু লোকের টিভি রেডিও দুটোই আছে। তবে সমস্যা হলো এ শহরের লোকের রেডিও নষ্ট হয় না বললেই চলে, আর যাদের টিভি আছে তারা সেটের সামনে বসে খুব কমই।

বিলি র‍্যামনের বয়স বত্রিশ, লম্বা, রোগাটে গড়নের এই যুবক সব সময় চোখে চশমা পরে। সর্বদা হাসি মুখ করে থাকার জন্যে শহরের লোক তাকে পছন্দ করে। কালে-ভদ্রে রেডিও বা টিভি নষ্ট হলে বিলি র‍্যামনকে দিয়েই সেটা মেরামত করায়। তবে ঘটনাগুলো যেহেতু সচরাচর ঘটে না তাই পক্ষাঘাতগ্রস্ত অসুস্থ মা এবং নিজের পেট চালাতে হিমশিম খেতে হয় বিলি র‍্যামনকে। হোলসেলারের কাছ থেকে টিউব আর নানা পার্টস বাকিতে নিতে নিতে এখন আর কেউ তাকে বাকি দিতে চায় না। অন্য কোথাও গিয়ে যে চাকরি করবে, সে রকম কাজও তো নেই। তা ছাড়া অসুস্থ মা বিলি র‍্যামনের সাহায্য ছাড়া এক পা-ও চলতে পারে না। তাকে রেখে দূর দেশ যেতেও মন চায় না বিলি র‍্যামনের। সব মিলে খুব সমস্যায় আছে বেচারা।

জানালা দিয়ে বৃষ্টি দেখছিল আর নিজের পোড়া কপাল নিয়ে ভাবছিল বিলি র‍্যামন, ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াল। বেঞ্চির ওপর বসে টেনে নিল র‍্যাপারে মোড়া গরম কফির থার্মোফ্লাস্ক আর এক জোড়া স্যান্ডউইচ। একটা পিনাট বাটার, অন্যটা জেলি মাখানো। পয়সা খরচের ভয়ে সে মাংসের পুর দেয়া স্যান্ডউইচ খায় না বহুদিন হলো। তিন মাস আগে, ওয়াল্টার শ্রোয়েডারের টিভি ঠিক করে দেয়ার পর লোকটা ওকে স্মোকড হ্যাম খাইয়েছিল। সে স্বাদ জিভে লেগে আছে এখনও।

পিনাট বাটার শেষ করে জেলি স্যান্ডউইচে কামড় বসাল বিলি র‍্যামন, একই সাথে কাপে ঢেলে নিল গরম কফি। ঠিক তখন জানালায় কিছু একটা আঁচড় কাটার শব্দ শুনে ওদিকে তাকাল সে। একটা বেড়াল। সাইড জানালার পাশে বসে একটা থাবা দিয়ে খচর-মচর আঁচড় কাটছে কাচে। বেড়ালটা আকারে বিশাল। কুচকুচে কালো। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে, যেন সাঁতার কেটে এসেছে। জানালার কাছে গেল বিলি র‍্যামন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল বেড়ালটার দিকে। এ বেড়ালটাকে আগে কখনও দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না। 'কীরে, কী চাস?' জিজ্ঞেস করল বিলি র‍্যামন। বেড়াল তার পছন্দের প্রাণী।

বেড়ালটাকে মনে হলো অভুক্ত। বৃষ্টিতে ভিজে লোম সেঁটে গেছে গায়ে। বিলি র‍্যামনের প্রশ্নের জবাবে মুখ হাঁ করল ওটা, সম্ভবত ম্যাও বলল, বন্ধ জানালা দিয়ে শোনা গেল না আওয়াজ। আবার থাবা আঁচড়াল সে জানালায়।

‘ভেতরে আসবি?’ বলে জানালা খুলে দিল বিলি র‍্যামন। এক লাফে ভেতরে চলে এল কালো বেড়াল। দরজা বন্ধ করে বিলি র‍্যামন আবার তাকাল বেড়ালটার দিকে। ‘খিদে পিয়েছে?’ আপন মনে প্রশ্ন করল সে। ‘নে এটা খা।’ আধ খাওয়া, জেলি মাখানো স্যান্ডউইচটা ছুঁড়ে দিল সে বেড়ালকে। এক কামড়ে স্যান্ডউইচ গিলে ফেলল বেড়াল।

‘তেষ্টাও পেয়েছে বুঝি?’ বলে সিঙ্ক থেকে এক বাটি পানি এনে দিল ওকে বিলি র‍্যামন। বেড়ালটা চুকচুক করে পানি খেল। সিঙ্কে দুটো তোয়ালে ঝুলছে। একটাতে কালিঝুলি মাখা। ওটা দিয়ে বেড়ালটার গা মুছতে লাগল। আরামে চোখ বুজে এল বেড়ালের। কাজটা প্রায় শেষ করে এনেছে বিলি র‍্যামন, এমন সময় বেজে উঠল ফোন। জবাব দিল বিলি র‍্যামন, ‘বিলি র‍্যামন বলছি, রেডিও এন্ড টিভি রিপেয়ারম্যান।’

‘ক্যাপ হেডেন বলছি, বিলি র‍্যামন,’ ক্যাপ হেডেন জেনারেল স্টোর চালায়, পাশাপাশি পোস্ট মাস্টারের দায়িত্বও পালন করছে। ‘শিকাগো থেকে একটা প্যাকেজ এলে ফোন করতে বলেছিলে। এসেছে ওটা।’

‘দারুণ, ক্যাপ। আসছি আমি এক্ষুণি।’

‘দাঁড়াও, দাঁড়াও। কিছু টাকাও নিয়ে এসো। ওটা ছাড়াতে আমার সাত ডলার লেগেছে।’

‘এইরে, সেরেছে। শোনো ভাই, ডলফ মার্শের টিভি’র জন্যে একটা টিউবের দরকার ছিল। সেটাই তোমার ঠিকানায় এসেছে। টিভি’র কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি। শুধু টিউবটা লাগানো বাকি। ডলফ আমাকে নগদ পেমেন্ট করবে বলেছে। সমস্যা হলো আমার কাছে এ মুহূর্তে তিন ডলারের বেশি নেই। তুমি যদি বাকি টাকাটা ধার হিসেবে রাখো তা হলে বড় উপকার হয়, ভাই। কথা দিচ্ছি, ডলফ পেমেন্ট করা মাত্র তোমার টাকা দিয়ে দেব।’

‘কথাটা মনে থাকে যেন। নগদ চাই আমি।’

‘মনে থাকবে। ধন্যবাদ, ক্যাপ। আসছি আমি।’

দেয়ালের হুক থেকে কোট আর হ্যাটটা নিতে নিতে বিলি বেড়ালকে বলল, ‘শোন, আমি একটু বেরুচ্ছি। চলে আসব এক্ষুণি। তুই ততক্ষণ থাকতে পারিস। বৃষ্টি কমলে চলে যাস। বলতে লজ্জা নেই তোকে রাখার মত সামর্থ্য আমার নেই। যখন রাখার ক্ষমতা হবে তোর মত বেড়াল আমি পুষব। এখন গেলাম রে।’

বিলি র‍্যামনের বকবকানিতে কোনও ভাবান্তর ঘটল না বেড়ালের চেহারায়। বিলি র‍্যামন দরজা বন্ধ করে চলে যাবার পর সে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে চারপাশ দেখতে লাগল। ঘরে খানদুয়েক টেলিভিশন, চেসিস, নানা বাজে পার্টস ছাড়া কিছু নেই। রদ্দি মাল দেখে যেন হতাশই হলো বেড়াল। মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

একটু পরেই মাল নিয়ে চলে এল বিলি র‍্যামন। এসে দেখে বেড়ালটা একটা খোলাপাতার দিকে মনোযোগ নিয়ে তাকিয়ে আছে। ওটা ইলেক্ট্রনিক সার্কিট বিষয়ক বইয়ের ছেঁড়া পাতা।

'কীরে, ইলেক্ট্রনিক্সের ওপর খুব আগ্রহ দেখছি তোর।' বেড়ালটার দিকে তাকিয়ে হাসল বিলি র‍্যামন, তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল ডলফ মার্শের অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে।

কাজ করতে করতে বেড়ালটার সাথে আপন মনে কথা বলতে লাগল বিলি র‍্যামন। সবই তার ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে গল্প।

বেড়ালটা ভাল শ্রোতা। মনোযোগ দিয়ে বিলি র‍্যামনের দুঃখের পাঁচালি শুনে গেল। এদিকে বিলি র‍্যামনের কাজ শেষ। সে সেট রেখে উঠে দাঁড়াল।

বৃষ্টি থেমে গেছে। বেড়ালটা একবার 'মিউ' করে ডেকে ছুট দিল দরজার দিকে। বেড়ালটাকে ভালই লেগেছে বিলি র‍্যামনের। ওটাকে বিদায় দিতে খারাপ লাগছে এখন। সে দরজা খুলতে খুলতে বলল, 'যখন মন চায় চলে আসবি। দরজা বন্ধ থাকলেও জানালা খোলা থাকবে। খিদে পেলেই চলে আসবি। একসাথে লাঞ্চ করব, কেমন?'

বেড়াল কিছু না বলে বেরিয়ে গেল, এক ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল রাস্তার ওপারে।

হয়তো কারও পোষা বেড়াল, ভাবল বিলি র‍্যামন। বাড়িতেই গেছে। ক্ষমতায় কুলোলে সে-ও একদিন অমন একটা নাদুস-নুদুস বেড়াল পুষবে।

কিন্তু বিলি র‍্যামন কোনদিনই জানবে না অল্পের জন্য অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে সে বেড়ালরূপী যমের তাকে হোস্ট হিসেবে পছন্দ হয়নি বলে ওটা তাকে ছেড়ে চলে গেছে।

বারো

বার্টলসভিলে পরপর দুটো আত্মহত্যার ঘটনার মধ্যে রীতিমত রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন ড. আবরার। সারাটা সকাল তাঁর গেছে এ ঘটনা দুটোর ওপর নোট তৈরি করতে। কিন্তু তিনি চান গল্পের আকারে স্টেটমেন্ট লিখতে। তিনি ডিকটেশন দেবেন, অন্য কেউ লিখে দেবে। সমস্যা হলো এ শহরে তাঁর পরিচিত এমন কোনও টাইপিস্ট নেই যে নির্ভুল ইংরেজিতে তাঁর ডিকটেশন লিখে নিতে পারে।

হঠাৎ এড হোলিসের কথা মনে পড়ে গেল প্রফেসরের। বার্টলসভিলের একমাত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ক্যারিয়ন'-এর সম্পাদক। আবরারের পুরানো

বন্ধু। সাথে সাথে এড হোলিসের অফিসে চলে গেলেন আবরার। শর্টহ্যান্ড জানা একজন দক্ষ টাইপিস্টের কথা তাঁকে বলতে এড মিস শিলা রহমানের কথা বললেন। জানালেন মিস শিলা এখানকার হাইস্কুলে ইংরেজি পড়ায়, টাইপ তার পার্ট টাইম জব। সে শর্টহ্যান্ড এবং টাইপিং-এ খুবই দক্ষ। আর ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী বলে তার ভাষাও চমৎকার। শিলার বাবা আমেরিকান, মা বাঙালি। রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন দুজনেই। সে একটি ছোট অ্যাপার্টমেন্টে একা থাকে। তার কোনও বয়ফ্রেন্ড নেই। গড়গড় করে তথ্যগুলো দিলেন এড। ছোট্ট এ শহরে একটি বাঙালি মেয়ে একা জীবন-যুদ্ধে টিকে আছে শুনে আবেগে আপ্লুত হলেন আবরার।

'ঠিক এরকম একজনকে দরকার আমার।' বললেন প্রফেসর। 'কোথায় পাব তাকে?'

এড বললেন, 'আচ্ছা, দেখছি।'

টেলিফোন ডাইরেক্টরি ঘেঁটে একটা নাম্বার বের করলেন তিনি। তারপর ওই নাম্বারে ফোন করলেন। 'মিস রহমান? আমি এড হোরিস। শুনুন, আমার এক বন্ধুর কয়েকদিনের জন্যে আপনাকে দরকার। টাইপ আর শর্টহ্যান্ডের কাজ। পারবেন?... বেশ। এক সেকেন্ড ধরুন।'

মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে এড ফিরলেন বন্ধুর দিকে। 'মিস রহমান বলছেন, যখন খুশি তুমি তাঁকে পেতে পার। ইচ্ছে করলে আজই কথা বলতে পার। একটার দিকে যেতে পারবে? ঠিকানা আমি বলে দেব।'

'তা হলে তো ভালই।'

এড হোরিস আবার ফোনে কথা বলতে লাগলেন, 'ঠিক আছে, মিস রহমান। আমার বন্ধু একটার দিকে আপনার সাথে দেখা করবে।...ওকে, বাই।'

ফোন নামিয়ে রাখলেন এড। প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'ভদ্রমহিলা তাঁর রেট তোমাকে মনে করিয়ে দিতে বলেছেন। দিনে দশ ডলার। অথবা ঘণ্টা প্রতি দেড় ডলার।'

'অসুবিধে নেই। এখন ঠিকানাটা বলো। আমি একটার মধ্যে পৌঁছে যাব তোমার মিস রহমানের কাছে।'

কাঁটায় কাঁটায় একটায় মিস শিলা রহমানের বাসায় এলেন আবরার। শিলা অপেক্ষা করছিল তার জন্যে। দরজা খুলেই বলল, 'ড. আবরার?'

মাথা ঝাঁকালেন আবরার।

'ভেতরে আসুন, প্লীজ,' আহ্বান জানাল শিলা। মিস শিলা রহমানের বয়স ত্রিশের কোঠায়। আবরারের চেয়ে লম্বা সে, পাঁচ ফুট ছয়, হালকা-পাতলা গড়ন, চোখে স্টিলরিমের চশমা, পরনে পরিচ্ছন্ন ধূসর রঙের পোশাক। চুলের রঙ বাদামী, এক বেণীতে বাঁধা। ঘাড়ের পেছনে ঝুলছে।

এখন মাথায় একটা হ্যাট আর হাতে একটা ছাতা ধরিয়ে দিলেই স্টুয়ার্ট পামারের মহিলা গোয়েন্দা চরিত্র হয়ে উঠত শিলা রহমান।

'বসুন, ডক্টর,' বলল শিলা, 'আমার নোটবুক নিয়ে আসি–'

'ইয়ে, মিস শিলা। এখানে ডিকটেট করতে পারলে ভালই হত। তবে মনে হয় আমার বাসায় বসে কাজটা আরও ভালভাবে করতে পারব। এখান থেকে মাইল আটেক দূরে আমার বাসা, শহরের শেষ মাথায়, বাসকোম্ব রোডে। আপনি ওখানে বসে ডিকটেশন নিয়ে এখানে এসে টাইপ করবেন; সমস্যা হবে কোনও? আমি অবশ্য একা থাকি–' শেষ দিকে আমতা আমতা করতে লাগলেন তিনি।

মুচকি হাসল শিলা। 'এ পৃথিবীতে আমরা সবাই একা, ডক্টর, ওতে কোনও সমস্যা হবে না। চলুন, যাওয়া যাক।'

শিলা নোটবই আর পেন্সিল নিয়ে ডক্টর আবরারের সাথে তাঁর স্টেশন ওয়াগনে উঠে বসল।

হোস্ট হিসেবে বেড়ালের তুলনা নেই, ভাবছে ভিনগ্রহের খুনী। ওরা নিঃশব্দে চলে, দ্রুত গতিসম্পন্ন, শ্রবণশক্তিও প্রখর, যেকোনও সময় যে কোনও জায়গায় যাবার ক্ষমতাও রাখে। তাই মার্জার শ্রেণীটাকে খুব পছন্দ হয়েছে তার।

বিলি র‍্যামনের দোকানে কালো বেড়ালটাকে সে-ই পাঠিয়েছিল চর হিসেবে। শেরিফ আর সেই ছোটখাট লোকটা, আবরার–ওরা বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে তার মনে। একটা চড়ুইকে পাঠিয়েছিল সে আবরারের গাড়ির পিছু পিছু। কিন্তু চড়ুইটা গাড়িটাকে এক পর্যায়ে হারিয়ে ফেলে। তারপর সে একটা কালো বেড়ালকে হোস্ট করে। বেড়ালটাকে দিয়ে সারা শহর চক্কর দিয়েছে সে। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রম সহ্য করতে না পেরে মারা গেছে বেড়ালটা। তারপর সে একটা ধূসর রঙের ক্ষুদে বেড়ালকে হোস্ট বানিয়েছে। বেড়াল পেতে তার কষ্ট নেই। কারণ এদিকে খামার বাড়ির ছড়াছড়ি। আর ওসব খামার বাড়ি থেকে একটা দুটো বেড়াল নিয়ে আসা কোনও ব্যাপার নয়।

ধূসর বেড়ালটাকে সে কাজে লাগিয়েছে শহরের বাইরের খামার বাড়িগুলোতে অনুসন্ধানের জন্যে। তার ধারণা, আবরার নামের সেই লোকটি কোনও খামার বাড়িতে থাকে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ধূসর বেড়াল যখন হাল ছেড়ে দিয়ে দুটো ফার্ম হাউজের মাঝখানের একটা মাঠ দিয়ে আসছে সকাল এগারোটার পরে, হঠাৎ পুবদিক থেকে একটা গাড়ি আসার শব্দ শুনে সে তাকিয়ে দেখে, একটা পুরানো স্টেশন ওয়াগন শহরের দিকে যাচ্ছে। আর ড্রাইভিং সিটে বসে আছে আবরার স্বয়ং।

ভিনগ্রহের প্রাণী ততক্ষণে প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে আবরার নামের লোকটি শহরের শেষ মাথার খামার বাড়িতে বাস করে। ব্যাপারটা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হবার জন্যে ধূসর বেড়ালকে সে পাঠিয়েছে বাড়ির হাল-হকিকত জানতে।

বেড়াল বেশ কয়েকবার চক্কর দিল গোটা বাড়ি। জেনারেটর চলছে দেখে বোঝা গেল আবরার আবার ফিরে আসবে এ বাড়িতে। সম্ভবত একাই থাকে সে এখানে; নাকি কাউকে রেখে গেছে সে তার অবর্তমানে?

বাড়িতে ঢোকার রাস্তা খুঁজল বেড়াল। নেই। নীচতলায় জানালা অনেক, তবে দু'এক ইঞ্চি মাত্র ফাঁক করা। ঢোকা যাবে না। শুধু ওপরের তলার একটা জানালা খোলা।

বেড়াল বাড়িটার গন্ধ শুঁকল, কান পাতল। কোনও সাড়াশব্দ নেই। তার মানে এখানে দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তি থাকে না।

ভিনগ্রহের হন্তারক এবার বেড়ালটাকে বিশ্রাম দিল। উঠোনের এক প্রান্তে, ঝোপে ঘুমিয়ে পড়ল বেড়াল। কোনও শব্দ কানে গেলেই জেগে উঠবে সাথে সাথে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ঘণ্টাখানেক পর গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। আবরার এসেছে তার স্টেশন ওয়াগন নিয়ে। তবে একা নয়, সাথে এক মহিলাও আছে।

মহিলাকে চিনতে পারল ভিনগ্রহের প্রাণী। রনির স্মৃতিতে এ মহিলার কথা ছিল। এর নাম শিলা রহমান, রনির হাইস্কুলের ইংরেজির টিচার। মহিলা আবরারের বান্ধবী নাকি? হাতে আবার শর্টহ্যান্ড নোটবুকও দেখা যাচ্ছে। মনে পড়ে গেল মিস শিলা অবসরে টাইপিং বা বুক কিপিং-এর কাজ করে বাড়তি দু'পয়সা কামায়। তার মানে ওকে এখানে নিয়ে আসার কোনও উদ্দেশ্য আছে আবরারের। বেশ তো, আবরার যদি মহিলাকে চিঠি লেখার ডিকটেশন দেয় তাহলে চিঠির বিষয় শুনে আবরারের সম্পর্কে সে আরও বিস্তারিত জানতে পারবে।

ওরা ঘরে ঢোকামাত্র বেড়ালটা বাড়ির চারপাশ চক্কর দিতে শুরু করল। প্রতিটি জানালায় গিয়ে কান পাতল ওদের কথা শোনার আশায়। কিন্তু শোনা যাচ্ছে না।

ভেতরে ঢোকারও উপায় নেই। জানালা বন্ধ। দোতলার জানালা খোলা থাকলেও অত উঁচুতে লাফ দিয়ে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে দৌড়ে পেছনের দরজায় গেল। ওটা রান্নাঘরের দরজা। কান পাতল। কিন্তু দরজার পাল্লা এত ভারী যে ভেতরের লোকজনের কথা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

আরেকবার বাড়িটা চক্কর দিল বেড়ালটা। রীতিমত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে সে আবরার মিস রহমানকে কী ডিকটেশন দেয় জানার জন্যে। হঠাৎ

গাছটা চোখে পড়ল তার। আগে দেখেনি। এলম বৃক্ষ। গাছটার মগডাল গিয়ে ঠেকেছে দোতলার খোলা জানালার কাছে। বেড়াল চট করে উঠে পড়ল গাছে। ডাল বেয়ে সাবধানে এগোল জানালার দিকে। তারপর লাফ দিল।

এটা বেডরুম। তবে আবরার ব্যবহার করে বলে মনে হলো না। সে জানালার দিকে তাকাল। জানালার কাছে নুয়ে পড়া ডালটার চারফুট ওপরে উঠে গেছে সে লাফ দিয়ে নামবার সময় ঝাঁকি খেয়ে। এখন আর ও রাস্তা দিয়ে বেরুনোর উপায় নেই। বেরুতে হলে নীচে যেতে হবে। আবরার নিশ্চয়ই নীচতলার জানালা চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ রাখে না।

বেড়াল একছুটে হলঘর পেরিয়ে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নীচে। তারপর নিঃশব্দ পায়ে হলওয়ে ধরে এগোল। এটা সদর দরজা হয়ে মিশেছে রান্নাঘরে। প্যাসেজে মোড় ঘোরার মুহূর্তে দাঁড়িয়ে চুরি করে শোনার উপযুক্ত জায়গা এটা।

ফ্রিজের দরজা খোলার শব্দ পেল সে, তারপর পরিষ্কার শুনতে পেল ওদের গলা।

তেরো

'আপনি বিয়ার খান না, মিস রহমান?' জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর। 'ডিকটেটিং একটা নীরস কাজ। আর ডিকটেশন নেয়া তো আরও নীরস।'

মৃদু হাসল শিলা। 'খাই। তবে বিয়ার খাওয়ার কথা কাউকে বলতে পারবেন না কিন্তু। এত ছোট শহরে শিক্ষকরা বিয়ার খায় না বা ধূমপান করে না।'

'কথা দিলাম কাউকে বলব না,' ফ্রিজ থেকে আরেকটা বিয়ারের ক্যান বের করতে করতে বললেন আবরার। ইতস্তত সুরে যোগ করলেন। 'ইয়ে–ডিকটেটিং করার সময় ধূমপান করলে আপনার অসুবিধে হবে?'

'মোটেই অসুবিধে হবে না।'

দু'গ্লাস বিয়ার নিয়ে শিলার সামনে বসলেন ডক্টর, একটা গ্লাস ঠেলে দিলেন মেয়েটার দিকে।

'কাগজ-কলম আপাতত রাখুন, মিস শিলা। এক্ষুণি ডিকটেটিং শুরু করতে ইচ্ছে করছে না। ডিকটেটিং-এর চেয়ে আমার কথা শুনতেই বোধহয় আপনার ভাল লাগবে। মাঝে মাঝে ভাবি আমার ছাত্ররাও বোধহয় আমার ডিকটেশনের চেয়ে দ্রুত লিখতে পারে।'

'আপনার ছাত্ররা? আপনি শিক্ষকতাও করেন নাকি, ডক্টর?'

'হ্যাঁ, মিস শিলা, এম আই টি-তে ফিজিক্স পড়াই। ইলেক্ট্রনিক্সে পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েছি। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সেও তাই।'

শিলা কাগজ-কলম নামিয়ে রাখল টেবিলে, অবাক দৃষ্টিতে তাকাল ডক্টরের দিকে। 'আবরার! ড. সি. আর. আবরার? বড় বড় স্যাটেলাইট প্রজেক্ট নিয়ে আপনি কাজ করেছেন, তাই না?'

হাসলেন ডক্টর। 'তেমন কিছু না। তবে আপনি আমার নামটা জানেন জেনে গর্ববোধ করছি। বিজ্ঞানের প্রতিও আগ্রহ আছে নাকি?'

'অবশ্যই। বিশেষ করে গ্রহ-তারা ইত্যাদি বিষয়ে আমার আগ্রহ প্রবল। সায়েন্স ফিকশনের একনিষ্ঠ পাঠক বলতে পারেন আমাকে।'

'আমি আবার রহস্য সাহিত্যে বেশি মজা পাই। রিলাক্সের প্রয়োজন হলে সায়েন্স থেকে যত দূরে সরে যেতে পারি ততই ভাল লাগে।'

'তা বুঝতে পারছি,' বলল শিলা রহমান। 'আপনি কি সায়েন্টিফিক কোনও বিষয়ে আমাকে ডিকটেশন দিতে চান?'

'না ঠিক তা নয়। আসলে যে ব্যাপারে কথা বলতে চাইছি ওটার ব্যাখ্যা দেয়া মুশকিল। এখানে অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে, শিলা। আমি ব্যাপারটা নিয়ে কিছু তদন্তও চালিয়েছি। ভুলে যাবার আগে ওগুলো স্টেটমেন্টের মত করে লিখতে চাইছি।'

তারপর রনি, জন এবং হেলমুটের আত্মহত্যার বিষয়ে নিজের সন্দেহের কথা খুলে বললেন ড. আবরার। প্রসঙ্গত এল কুকুর, কাক, বেড়াল, পেঁচা ইত্যাদি সবার কথা। ডক্টরের ধারণা এরাও আত্মহত্যা করেছে।

'কিন্তু কেন, মিস শিলা,' পাইপে আগুন ধরাতে ধরাতে বললেন ডক্টর। 'এই ছয়টি আত্মহত্যার ঘটনার মধ্যে কি কোনও কানেকশন বা সম্পর্ক রয়েছে? মিসেস কোহলের ফ্রিজ থেকেই বা সুপ আর মাংসের ঝোল অদৃশ্য হয়ে গেল কেন? এসব ছোটখাট ঘটনার মধ্যে কি আপনি রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন না?'

আবরারের কথা শুনতে শুনতে চোখ বড় বড় হয়ে গিয়েছিল শিলার, চেহারা বিবর্ণ। আবরার ধারণা করলেন ভয়ে নয়, উত্তেজনায়।

শিলা শান্ত গলায় বলল, 'এবার আপনি ডিকটেশন শুরু করতে পারেন, ডক্টর।'

পাইপ ফুঁকতে ফুঁকতে ডিকটেশন শুরু করলেন আবরার। তবে ধারাবাহিকভাবে নয়; মাঝে মাঝে দু'এক মিনিটের জন্য চুপ করে থাকলেন, প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করলেন বাছাই করে, কারণ ডক্টর চাইছেন পরিষ্কার, বিশদ একটি গল্প।

মোটামুটি ঘণ্টা দেড়েক ডিকটেশন চলল। প্রথম তিনটে আত্মহত্যার ঘটনা এবং টাইগারের র‍্যাবিস বিষয়ক নেতিবাচক রিপোর্ট পর্যন্ত এসে

থামলেন ডক্টর। বললেন, 'কোহ্লের ব্যাপারে পরে কথা বলব। আপনিও নিশ্চয়ই লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। একটু রেস্ট নেয়া দরকার।'

'আমার রেস্টের প্রয়োজন নেই,' বলল শিলা। 'নতুন আরেকটা অংশে ঢুকতে যাচ্ছি। রনির ব্যাপারটা সবই জানি আমি। তবে মি. কোহ্লের ব্যাপারে কিছুই জানি না। কাজেই আপনি শুরু করতে পারেন, ডক্টর।'

'দশ মিনিট সময় দিন আমাকে, শিলা, আরেক গ্লাস বিয়ার চলবে তো?'

শিলা ক্ষীণ আপত্তি জানালেও আমল দিলেন না ডক্টর। তার জন্যে বিয়ার নিয়ে এলেন।

গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে শিলা জানতে চাইল, 'ক' কপি দরকার আপনার?'

'তিন কপি,' বললেন ডক্টর। 'একটা আমার জন্য আর দুটো পাঠাব আমার বন্ধুদেরকে তাদের মতামত জানতে। এদের একজন খুব বড় ডাক্তার। তাকে জিজ্ঞেস করব র‍্যাবিসের মত আর কোনও দুর্লভ রোগ আছে কিনা যে রোগ প্রাণী থেকে মানুষের দেহে ছড়িয়ে পড়ে এবং সবাই পাগল হয়ে যায়। আরেকজন অংকবিদ। সে সবকিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করে। তার কাছে জানতে চাইব যে সব ঘটনা ঘটছে এখানে তার মধ্যে কোনও পারস্পরিক সম্পর্ক আছে নাকি স্রেফ কাকতালীয় বলে মনে করে সে এগুলোকে।'

'আমি যদি নিজের জন্যে একটা কপি তৈরি করি, আপনার কোনও আপত্তি আছে, ডক্টর?'

'কোনও আপত্তি নেই, শিলা।'

হাসল শিলা রহমান। 'বেশ। আমি অবশ্য নিজের জন্যে একটা কপি তৈরি করতাম। তবে আপনার অনুমতি পেয়ে ভাল হলো।'

আবরারও হাসলেন। খোলামেলা স্বভাবের শিলাকে তাঁর ভাল লেগেছে। কোনও জটিলতা নেই তার ভেতরে। এ ধরনের সহজ সরল মানুষ পছন্দ করেন ডক্টর। ইতোমধ্যে ভাবতে শুরু করেছেন নিজের সেক্রেটারী হবার প্রস্তাব শিলাকে দেবেন কিনা। তাঁর ডিপার্টমেন্টের বাজেট আগামী বছর বৃদ্ধি করা হবে। তিনি এই প্রথম একজন ফুলটাইম সেক্রেটারী এবং রেকর্ড ক্লার্ক পাবেন। শিলা তার প্রস্তাবে রাজি হলে ভালই হবে। তিনি একজন দক্ষ সেক্রেটারী পাবেন আর শিলা এখানকার চেয়ে অনেক বেশি বেতন পাবে এম আই টি-তে। তবে প্রস্তাবটা পরে দিলেও চলবে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই।

বিয়ার শেষ করে শিলা রহমান বলল, 'আজ যে পর্যন্ত ডিকটেশন দিলেন তা টাইপ করতে আমার দু'দিন লাগবে। আজ মঙ্গলবার। বিষ্যুদবার দুপুরের মধ্যে আপনার জিনিস পেয়ে যাবেন, অবশ্য সন্ধ্যা বেলাতেও যদি কাজটা

করি।'

'আপনি সন্ধ্যাবেলাও কাজ করেন নাকি?'

'সাধারণত করি না। তবে আপনারটা করব। কারণ এত মজার কাজ জীবনে পাইনি আমি। আর এ জন্যে কোনও পেমেন্ট নেব না। আপনি যদি টাকা নেয়ার জন্যে জোরাজুরি করেন তা হলে বলব আজকের বিকেলটা খামোকাই নষ্ট হলো আপনার।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ডক্টর। তিনি বুঝতে পেরেছেন মেয়েটার মনে যা, মুখেও তাই। কাজেই ওর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তিনি বড়জোর একটা কাজই করতে পারবেন–বোস্টন ফেরার পর শিলার জন্য একটা উপহার কিনে পাঠিয়ে দেবেন। ওটা নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য করতে পারবে না শিলা রহমান।

'বেশ, শিলা। আপনার কথাই রইল। তা হলে আজ থেকে আপনাকে আমার পার্টনার হিসেবে কাজ করতে হবে। আমি কি আপনাকে এখন কিছু কথা বলতে পারি?'

'অবশ্যই পারেন। বলুন না।'

'আপনাকে এখন থেকে চোখ, কান খোলা রেখে চলতে হবে। আপনি শহরে থাকেন। কাজটা সহজ হবে আপনার জন্য। আমি শহরে যাই হপ্তায় একদিন। ফলে কোনও ঘটনা ঘটলে তা জানতে পারি দেরিতে। কাজেই এখন থেকে কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা যদি ঘটে, যা আমার মানে আমাদের তদন্তের সাথে মিলে যায়, আপনি সেসব সম্পর্কে ভালভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে রাখবেন।'

'তাতে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু আপনার সাথে আমার যোগাযোগ হবে কী করে? আপনার বাসায় বোধহয় ফোন নেই, নাকি আছে?'

'না, নেই। এ জন্যে এখন বরং আফসোস হচ্ছে। তবে প্রায়ই আমি এ শহরের পোস্ট অফিসে যাই চিঠিপত্র এসেছে কিনা দেখতে। আপনি পোস্ট মাস্টারের কাছে কোনও মেসেজ রেখে গেলে আপনাকে ফোন করব। তা হলে কথা ওটাই রইল–বিষ্যুদবার আপনার সাথে দেখা হচ্ছে। চলুন, ওঠা যাক।'

হ্যান্ডব্যাগে নোটবই আর পেন্সিল ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়াল শিলা রহমান। সদর দরজা দিয়ে বেরুল ওরা, উঠল স্টেশন ওয়াগনে। ডক্টর স্টার্ট দিলেন ইঞ্জিন, গিয়ার ছাড়লেন; ক্লাচ রিলিজ করতে যাচ্ছেন এমন সময় শিলা বলল, 'এই রে, আপনার বেড়ালটার সাথে তো পরিচয় করিয়ে দিলেন না। বলব ভাবছিলাম, ভুলে গেছি। অবশ্য অসুবিধা নেই।'

আবরার ক্লাচ পেডালে পা রেখে ঘুরে তাকালেন শিলার দিকে। 'বেড়াল? আমি বেড়াল পুষি না, শিলা। আপনি আমার বাড়িতে বেড়াল দেখেছেন?'

'আ–হ্যাঁ। দেখলাম বলেই তো মনে হলো। ওই সময়–'

আবরার লিভার নিউট্রালে এনে ইগনিশন সুইচ অফ করলেন। 'বোধহয় রাস্তার কোনও বেড়াল ঢুকে পড়েছে। একটু বসুন। আমি চেক করে আসছি। বেড়াল ঢুকলে ওটাকে বের করে দেয়াই ভাল। কার না কার বেড়াল।'

গাড়ি থেকে নেমে আবার বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন ডক্টর দরজা বন্ধ করে। দ্রুত নীচতলা ঘুরে দেখলেন। প্রায় সবগুলো জানালাই বন্ধ। দু'একটা দু'এক ইঞ্চি ফাঁক হয়ে আছে। কিন্তু ওই ফাঁক দিয়ে বেড়াল ঢোকার উপায় নেই। ওপরে গেলেন তিনি। বেড়ালের টিকিটিও চোখে পড়ল না। বেডরুমে ঢুকলেন। এ রুমের একটা জানালা খোলা। গাছের ডাল ঝুলে আছে জানালা থেকে কয়েক ফুট ওপরে। ওখান থেকে লাফ দিয়ে নামা যায় বেডরুমে, কিন্তু বেরুনো সম্ভব নয়। কারণ নীচে নরম ঘাস নেই, আছে শক্ত পাথুরে মেঝে। ওখানে লাফ দিয়ে নামতে গেলে হয় বেড়াল মারা যাবে নয়তো মারাত্মক আহত হবে।

হঠাৎ ভাবনাটা মাথায় এল তাঁর। এ বাড়িতে যদি সত্যি কোনও বেড়াল ঢুকে থাকে, আর ওটার যদি মরার খায়েশ হয়, যেমন কোহ্‌লের বেড়ালটা মারা গেল, বা অন্যান্য প্রাণীগুলো–

আবরার বেডরুমের জানালা বন্ধ করে নেমে এলেন নীচে, দরজা খুলে বেরুলেন। বেড়াল থাকলে থাকুক, উনি এসে আবার খুঁজবেন। তখন এ নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে।

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলেন আবরার। বললেন, 'কোনও বেড়াল চোখে পড়েনি আমার, শিলা। আপনি সত্যি দেখেছিলেন তো? কোথায়, কখন?'

'তখন তো দেখেছিলাম মনে হচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে দেখার ভুল হতে পারে। আপনি যখন ডিকটেশন দিয়ে এক মিনিটের জন্য থেমে কী যেন ভাবতে শুরু করলেন তখন বেড়ালটাকে দেখি আমি। হলওয়ে প্যাসেজের কোণায় দাঁড়িয়ে ছিল ওটা, রান্নাঘর লাগোয়া সিঁড়ির ধারে। আপনার মনোযোগ নষ্ট হবে ভেবে ওটাকে ডাকিনি আমি। আপনি আবার ডিকটেশন শুরু করলেন, তাকিয়ে দেখি চলে গেছে ওটা।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল শিলা। তারপর বলল, 'এখন মনে হচ্ছে ভুলই দেখেছি। অবশ্য ওই সময় ভুল কিছু দেখা অস্বাভাবিক ছিল না।'

'আমারও তাই ধারণা,' তরল গলায় বললেন ডক্টর। 'যাহোক, আমার বাড়িতে বেড়ালের খোঁজ পেলে আপনাকে জানাব আমি।'

কিছুক্ষণ কোনও কথা হলো না দু'জনে। আপন মনে গাড়ি চালাচ্ছেন আবরার, নীরবতা ভেঙে শিলা বলল, 'ডক্টর, আপনার কি মনে হয় এমন কোনও রোগ সত্যি আছে যা প্রাণী থেকে মানুষের দেহে ছড়িয়ে পড়ে সবাইকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচনা যোগায়?'

'এমন কোনও রোগের কথা শুনিনি কখনও। এটা খুব বিরল কোনও

রোগ হবে।'

'খুবই বিরল। এমন কোনও রোগের অস্তিত্ব থাকলে নিশ্চয়ই শুনতে পেতাম।'

'ঠিকই বলেছেন। তবে, শিলা, ওই রোগের কথা বাদ দিয়ে অন্য কোন সম্ভাবনার কথা মনে হয় না আপনার? অদ্ভুত কোনও কাকতালীয় ঘটনা–অন্য কোনও ব্যাখ্যা?'

'হ্যাঁ, ব্যাখ্যা আমি একটা দিতে পারি। আপনি গাডারডিন সোয়াইনের কথা শুনেছেন, ডক্টর?'

চোদ্দ

'গাডারডিন সোয়াইন...' আনমনা গলায় বললেন ডক্টর। 'কথাটা কোথায় যেন শুনেছি। কিন্তু মনে করতে পারছি না।'

'বাইবেলে আছে,' বলল শিলা। 'বুক অভ লিউকে। একবার যীশুখৃষ্ট ভূতে পাওয়া এক লোককে দর্শন দিতে এলেন। কাছেই ছিল একদল রাজহাঁস। দাঁড়ান, বাইবেল থেকে উদ্ধৃতিটা তুলে ধরছি আমি 'তারপর শয়তান বা ভূতগুলো লোকটিকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল এবং প্রবেশ করিল রাজহাঁসদের মধ্যে এবং রাজহাঁসের দল দ্রুত হ্রদের গভীরে নামিয়ে পড়িল এবং দম বন্ধ হইয়া মরিয়া গেল।'

ডক্টর আঁতকে উঠলেন। 'শিলা, আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাইছেন না যে আপনি ভূত বা জিনে ধরা কোনও কিছুতে বিশ্বাস করেন।'

'অবশ্যই বিশ্বাস করি না। তবে কারও ওপর ভর করা–'

'কে বা কী ভর করবে? আমি বাস্তববাদী মানুষ, শিলা। আমি টেলিপ্যাথি বা টেলিকাইনিসিসের সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দিতে চাই না। এমনকী সম্মোহন বা পোস্ট হিপনোটিক সাজেশনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও মেনে নিতে রাজি। কিন্তু প্যারাসাইকোলজি যদি ব্যাখ্যাও দিতে চায় যে কেউ কারও ওপর ভর করতে পারে এবং তাকে ভেতর থেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে, আমি তা বিশ্বাস করব না কিছুতেই।'

'কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করেন, এ-ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবী ছাড়াও ছড়িয়ে আছে কোটি কোটি গ্রহ? এ সব গ্রহে যে অন্য কোনও প্রাণীর বাস নেই তা কী করে–কী করে জানব, ও সব গ্রহের কোনও প্রাণীর অন্যের ওপর ভর করে তাকে দিয়ে যা খুশি করানোর ক্ষমতা রাখে? আপনি কী করে নিশ্চিত হন এসব ঘটনার পেছনে ভিনগ্রহবাসীর হাত নেই?'

'হুম্‌ম' বললেন আবরার। 'আমি নিশ্চিত হয়ে কিছু বলছি না। আর জানিও না সত্যি এরকম কিছু এখানে আছে কিনা। কিন্তু শুধু একজন ভিনগ্রহবাসী কেন, ভিনগ্রহবাসীরা নয় কেন?

'কারণ আমার ধারণা একজনই এসব ঘটাচ্ছে। ভেবে দেখুন, মেঠো ইঁদুরটা মারা যাবার পর রনি মরে গেল। তারপর মরল রনিকে খুঁজতে যাওয়া কুকুরটা, তারপর পেঁচাটা, তারপর বেড়ালটা। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কী বলতে চাইছি। দুটো মৃত্যুর ঘটনা কখনোই একসাথে ঘটছে না। যে এ ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে সে একজনকে মেরে তারপর আরেকজনকে তার হোস্ট বানাচ্ছে। অর্থাৎ হোস্টের মৃত্যু ঘটার পর সে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে।'

শোল্ডার ব্লেডে কী যেন সুড়সুড় করে উঠল ডক্টরের। কণ্ঠে জোর এনে বললেন, 'এ সবই আসলে আপনার কল্পনা, আমারও মনে হয় রহস্য সাহিত্য ছেড়ে এখন থেকে সায়েন্স ফিকশন পড়তে হবে।'

'তাই পড়ুন। তবে যা ঘটছে, একটু খতিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন তা নিছক কল্পনা হয়তো নয়। আপনার বাড়িতে যে বেড়ালটাকে আমি দেখেছি, ওটা যদি সত্যি ওখানে থেকে থাকে, আমার ধারণা ওটা সেই ভিনগ্রহবাসীর হোস্ট। বেড়ালটাকে পাঠানো হয়েছে আমাদের ওপর নজর রাখার জন্য।'

হেসে উঠলেন আবরার। 'তা হলে ওটাকে হত্যা করার পর ভিনগ্রহবাসী নিশ্চয়ই আমার ওপর ভর করবে? যদি এমন কিছু ঘটে, আপনাকে আমি জানাব, শিলা।'

ঠাট্টা করে কথাটা বললেও শিলাকে তার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে নিজের বাড়িতে ঢোকার সময় ব্যাপারটা আর ঠাট্টা মনে হলো না ডক্টর আবরারের কাছে। শিলা যা বলেছে তার কোনও যুক্তি নেই। কিন্তু ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়?

দরজা সাবধানে বন্ধ করলেন ডক্টর। চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। কিছুই চোখে পড়ল না, কিছু শুনতেও পেলেন না।

পাইপ ধরিয়ে লিভিংরুমে চলে এলেন তিনি, বসলেন গদি মোড়া চেয়ারে। একটা পেপার ব্যাক টেনে নিলেন। কিন্তু বইটা খুলতে ইচ্ছে করল না।

বাড়িটা সার্চ করে দেখবেন নাকি একবার? কিন্তু বেড়াল খোঁজার কাজ বড় ক্লান্তিকর। আর এখানে বুদ্ধিমান কোনও বেড়াল লুকিয়ে থাকবে বলেও মনে হয় না। কারণ এখানে লুকোনোর জায়গাও নেই। আর কোথায় খুঁজবেন তিনি? হয়তো ওটা এখন কিচেনে বসে আছে। তাঁর আওয়াজ পেয়ে হলঘরে ঢুকে পড়বে। আর বেড়াল নিঃশব্দে চলাফেরায় ওস্তাদ। তিনি টেরও পাবেন

না কোত্থেকে কোথায় যাচ্ছে ওটা।

অবশ্য ওটা যদি সত্যি বেড়াল হয়ে থাকে। ওটা কি সত্যি বেড়াল? সাধারণ বেড়াল হলে তো লুকোচুরি খেলার কথা নয়। এতক্ষণ লুকিয়েও বা থাকবে কেন?

বেড়ালটাকে আবার খোঁজা শুরু করলেন ডক্টর কিন্তু বৃথাই খোঁজ চলল। ওটার টিকিটিও দেখা গেল না কোথাও। খুঁজতে খুঁজতে খিদে লেগে গেল আবরারের। তিনি দরজা ভাল করে বন্ধ করে খেতে গেলেন পাবে। ওখানে ডিনার সেরে, পোকার খেলে বাড়ি ফিরতে ফিরতে মাঝরাত হয়ে গেল।

বাড়ি ফেরার পর আবার বেড়ালের চিন্তায় পেয়ে বসল তাঁকে। চাঁদের আলোয় ফক ফক করছে সারা বাড়ি। ইঁদুর দৌড়ে গেলেও চোখে পড়বে আবরারের। তিনি কিচেনে ঢুকে আলো জ্বাললেন। যাবার আগে ময়দা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন মেঝেতে। যদি সত্যি বাড়িতে বেড়াল থাকে, ময়দা খাওয়ার লোভে ওটা আসতে পারে ওখানে।

ময়দার ওপর বেড়ালের পায়ের ছাপ! উঁচু স্বরে ডাকলেন ডক্টর। 'ঠিক আছে, বেড়াল, তোমার চেহারাটা এবার দয়া করে দেখাও বাপু। কোনও কিছু খেতে চাইলে বলো। আমি তোমাকে মারব না। তবে তোমার চেহারা না দেখা পর্যন্ত তোমাকে আমি এখান থেকে যেতেও দেব না।'

ফ্রিজ খুলে বিয়ারের ক্যান বের করলেন আবরার, বসলেন টেবিলে। এই প্রথম তাঁর ভয় ভয় লাগছে। ভয়টা কী নিয়ে বুঝতে পারছেন না, তবে জানেন কিচেনের আলো নিভিয়ে অন্ধকারে দোতলার বেডরুমে যাওয়া সম্ভব হবে না তাঁর পক্ষে।

বিয়ার শেষ করে কাপ বোর্ডের ড্রয়ার খুলে একটা ফ্লাশলাইট বের করলেন আবরার, তারপর কিচেনের বাতি নিভিয়ে দিলেন।

ফ্লাশলাইট জ্বেলে সিঁড়ি বাইতে শুরু করলেন ডক্টর। কাজটা হাস্যকর হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ফ্লাশলাইট নেভাতে সাহস হলো না তাঁর।

হলঘরে বা সিঁড়িতে কেউ নেই। বেডরুম তন্নতন্ন করে খুঁজেও কাউকে দেখতে পেলেন না। এমনকী খাটের নীচেও লুকিয়ে নেই বেড়ালটা। তা হলে কই গেল? বাড়ির ভেতরেই কোথাও আছে নিশ্চয়। ঘুমের মধ্যে ওটা যাতে তাঁর রুমে ঢুকে পড়তে না পারে সে জন্যে বেডরুমের দরজা বন্ধ করে দিলেন ডক্টর। বিছানায় শুয়ে মনে হলো ওপরে ওঠার সময় বন্দুক নিয়ে এলে বোধহয় ভাল হত।

পনেরো

উদ্বিগ্ন আবরার যখন বলছেন 'ঠিক আছে, বেড়াল,' কথাটা শুনে রীতিমত আতঙ্ক বোধ করছিল ভিনগ্রহের হন্তারক। ভয় পাবার কারণ আবরার কিছু একটা সন্দেহ করে বসেছেন যা তাঁর অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলতে পারে। তবে আবরারকে তার যথার্থ হোস্ট মনে হয়েছে—একজন টপ ইলেকট্রনিক্স, পয়সাঅলা, সর্বত্র অবাধ বিচরণ, বিয়ে থা করেননি। আবরারের সঙ্গে শিলা ডিকোডেশন পর্বের কোনও কিছুই তার কান এড়িয়ে যায়নি। আবরারকে তার হোস্ট হিসেবে খুবই নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছে। মনে হয়েছে এই লোকের ওপর ভর করলে অল্প কদিনের মধ্যে সে নিজের গ্রহে ফিরে যেতে পারবে।

তবে সে একটা ভুল করে বসেছে। তার উচিত ছিল সাধারণ বেড়ালের মত আচরণ করা। সে যদি ওদের সামনে ঘুরঘুর করত তা হলে ওরা বরং তাকে আদরই করত। হয়তো দুধ খেতে দিত। তারপর বাড়ির বাইরেও যেতে দিত। তা হলে অনেক আগেই সে মুক্ত হয়ে যেতে পারত। ফিরতে পারত কোহ্লদের খামার বাড়িতে, নিজের নিরাপদ খোলের মধ্যে। তারপর সুযোগ বুঝে, কাউকে হোস্ট বানিয়ে আবরারের বাড়িতে আসত সে, ঘুমন্ত আবরারের ওপর নিয়ন্ত্রণ-আরোপ করা সহজ হত তখন।

তবে ভুল যখন হয়ে গেছে, এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে। পালাবার রাস্তা নেই। আবরারটা যা চালাক! সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে রেখেছে। আর ময়দার ওপর তার পায়ের ছাপ দেখার পর আবরার তো এখন জানেই সে এখানে আছে।

প্রশ্ন হলো আবরার তার সম্পর্কে কতটুকু কী ধারণা করতে পেরেছে? কিছু একটা সন্দেহ সে করে বসেছে তা তো বোঝাই যায়। আবরারের পাতা ফাঁদে পা দেয়াটাও ভুল হয়েছে। তবে নিজের পায়ের ছাপ মোছার উপায় ছিল না তার ক্ষুদ্র শরীর নিয়ে।

তার আতংক হচ্ছে আবরারের সাম্প্রতিক আচার-আচরণ দেখে। বুদ্ধিমান আবরার কি দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিয়েছে? বুঝে ফেলেছে তার বাড়িতে যে বেড়ালটা আটকা পড়েছে আদৌ সেটা বেড়াল নয়? হয়তো বা। নইলে সে ওভাবে বেড়ালটাকে সম্বোধন করবে কেন? বোঝাই যাচ্ছে আবরার ঘটে অনেক বুদ্ধি রাখে। কিন্তু কতটা বুদ্ধি রাখে জানতে হলে লোকটার ওপর তাকে ভর করতে হবে। আর সেটা করতে হলে এই বেড়ালের শরীর থেকে তাকে বেরিয়ে আসতে হবে। সে কি আবার আত্মহত্যার রাস্তা ধরবে? কিন্তু

এই বেড়ালটাকে দিয়েও আত্মহত্যা করালে আবরারের কাছে সমস্ত রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে। সে ঠিক বুঝে নেবে ভিনগ্রহের কোনও প্রাণীই শুরু থেকে একের পর একজনকে আত্মহত্যায় বাধ্য করেছে।

এখন তার এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার আপাতত উপায় একটাই—কাল সকালে লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে নিজের চেহারা দেখানো এবং সাধারণ বেড়ালের মত আচরণ করা। কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু এ ছাড়া বিকল্পও নেই। তবে বিপদ ওটা নয় যে আবরার তাকে দেখা মাত্র গুলি করে মেরে ফেলবে। তা হলে তো সে বেঁচেই যায়। আর আবরার যদি তার হোস্টদের সম্পর্কে জেনে থাকে, খুনখারাবীর দিকে সে যাবে সব শেষে। কারণ সে বুঝতে পারবে হোস্টকে হত্যা করা মানে যে ওটার ওপর ভর করে আছে তাকে মুক্ত করে দেয়া। সমস্যা হলো, আবরার ব্যাপারটা টের পেয়ে গেলে তাকে ধরে হয়তো খাঁচায় পুরে রাখবে। এরচে' বাজে ব্যাপার আর কী হতে পারে? বেড়ালটার স্বাভাবিক মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে মুক্ত হতেও পারবে না। আর আবরার বিজ্ঞানী। তাকে নিয়ে হয়তো অনেক অসহ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা সে চালাবে। তারচেয়েও ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো সে হয়তো পুষ্টির অভাবে বেড়ালের শরীরের মধ্যেই একসময় মরে যাবে। কোহলদের বাড়িতে পুষ্টিকর যে সলিউশন সে খেয়েছে তাতে এক মাস টিকে থাকা যাবে, একবছর নয়। আর বন্দী অবস্থায় সে যদি যথার্থ পুষ্টি না পায় তা হলে মৃত্যু তার অনিবার্য।

সারারাত সে এসব নিয়ে ভাবল। একবার ভাবল জানালা ভেঙে লাফিয়ে পড়ে নীচে। কিন্তু সেটা সেই আত্মহত্যাই হবে, লাভ হবে না কিছু।

সে এখন এটুকুই আশা করতে পারে, আবরার যা সন্দেহ করেছে তা স্রেফ সন্দেহই মনে হবে তার কাছে এবং কাল সকালে আবরার তাকে বেরুতে দেবে। তাকে এখন প্রমাণ করতে হবে সাধারণ একটা বেড়াল ছাড়া অন্য কিছু নয় সে।

আগের রাতে ঘুমুতে ঘুমুতে রাত একটা বেজে গিয়েছিল, সকালে ঘুম ভেঙে ড. আবরার দেখেন ঘড়ির কাঁটা দশটা ছাড়িয়ে গেছে। ঘুমের মধ্যে বিশ্রী সব স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইলেন বিছানায়। হঠাৎ বেড়ালটার কথা মনে পড়ে গেল তাঁর।

বেড়াল বিষয়ক ভীতি এ মুহূর্তে তেমন কাজ করছে না তাঁর মধ্যে, দিনের আলোয় অনেকটাই দূর হয়ে গেছে ভয়। মনে হচ্ছে গত দশদিনের অদ্ভুত মৃত্যুগুলোর একটার সাথে আরেকটাকে সম্পর্কযুক্ত করে ব্যাপারটাকে অতিরঞ্জিত করে ফেলেছেন তিনি।

...হয়তো বা। তারপরও কিছু জিনিস অব্যাখ্যাত থেকে যাচ্ছে। তাঁর বাড়িতে লুকিয়ে থাকা বেড়ালটার গতিবিধি এত রহস্যময় কেন? ওটা কেন

শুধু লুকিয়ে থাকছে? তবে কি ওই বেড়ালটা মানুষজন ভয় পায়? বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে ওটা, রাস্তার ছেলেরা ঢিল মেরে মানুষ সম্বন্ধে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে ওটার মধ্যে?

সে যাহোক, আবরার সিদ্ধান্ত নিলেন আজ বেড়ালটাকে খুঁজে বের করবেনই।

তবে আজ আর ওটাকে খুঁজতে হলো না। নীচে নামতেই আবরার দেখতে পেলেন সামনের দরজায় নিতান্ত নিরীহ চেহারা নিয়ে বসে আছে বেড়ালটা।

বেড়ালটাকে তাঁর মোটেই বিপজ্জনক মনে হলো না। ছোট, ধূসর রঙের বেড়াল। দেখে মনে হচ্ছে না ক্ষুধার্ত বা আবরারকে দেখে ভয় পেয়েছে। বরং চাউনিতে যেন বন্ধুত্বের আভাস। মিউ করে ডেকে উঠল বেড়াল, দরজায় থাবা দিয়ে আঁচড়াল। বেরুতে চায়। ওটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন আবরার । 'এখন নয়, বেড়াল। পরে। আগে তোমার সাথে কিছু কথা বলা দরকার। এসো, নাস্তা খেয়ে নিই।'

রান্নাঘরে ঢুকলেন ডক্টর, পিছু পিছু বেড়ালও। তবে এত কাছে নয় যে আবরার ওটার গায়ে লাথি মারতে পারবেন। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে মেঝের ওপর বসল ওটা, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ডক্টরের দিকে। যেন বলতে চাইছে, 'আমাকে বেরুতে দাও, প্লীজ।'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন ডক্টর, কঠিন গলায় বললেন, 'না বেড়াল। এখন কোথাও যেতে দেয়া যাবে না তোমাকে। আগে আমাকে ভাবতে দাও।'

ফ্রিজ খুলে দুধ বের করলেন তিনি, একটা বাটিতে ঢেলে এগিয়ে দিলেন বেড়ালটার দিকে। বেড়ালটা ফিরেও তাকাল না ওদিকে। আবরার নিজের জন্যে নাস্তা তৈরি করছেন, সে আগের জায়গায় ঠায় বসে রইল। ডিমভাজা আর কফি নিয়ে টেবিলে বসলেন ডক্টর, নড়ে উঠল বেড়াল, ঝাঁপিয়ে পড়ল দুধের বাটিতে, চুকচুক করে খেতে লাগল।

'সুন্দর বিল্লি,' ডিম ভাজায় কামড় দিয়ে বললেন ডক্টর। 'আমি এখন একটু বেরুব। তুমি বাড়িতেই থেকো কেমন?'

বেড়াল কোনও জবাব দিল না, শুধু একবার মুখ তুলে তাকাল আবরারের দিকে।

আবরার বেরুবেন বেড়ালটার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে। যদি এটা কারও হারানো বেড়াল হয়, তাঁকে তিনি ফেরত দিয়ে দেবেন। আর সেই লোক যদি তাঁকে বেড়ালটা বিক্রি করতে চায়, সানন্দে কিনে নেবেন তিনি। কারণ বেড়ালটাকে ভারী পছন্দ হয়েছে তাঁর। সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছেন গোটা বাড়িতে নেট লাগাবেন। এখানে মাছির বড় উৎপাত। বেড়ালটাকে জ্বালিয়ে মারবে।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে আবরার বেড়ালটাকে বললেন, 'সিরিয়াসলি বলছি এখানে কটা দিন থাকতে কেমন লাগবে তোমার? আর ভাল কথা, কী নাম তোমার?'

বেড়াল দুধ খাচ্ছিল, খেতেই লাগল।

'বুঝলাম। বলবে না। ঠিক আছে, তোমাকে আজ থেকে বিল্লি বলে ডাকব, কি রাজি?'

দুধের বাটি প্রায় শেষ, বেড়াল দরজার ধারে গিয়ে বসে বলল, 'ম্যাও।'

'বুঝলাম রাজি,' বললেন আবরার। 'তবে তোমার আচরণ দেখে বুঝতে পারছি তুমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ। ঠিক আছে, আমি দেখছি কার বাড়ির পোষা মিনি তুমি।'

হারানো বেড়ালের খোঁজে শহরে এলেন ড. আবরার। ক্লারিয়ন পত্রিকার সম্পাদককে বললেন তাঁর বাড়ির ধূসর বেড়ালের কথা। জানতে চাইলেন কোথায় খোঁজ নিলে জানা যাবে কারও ধূসর রঙের বেড়াল হারানো গেছে কিনা। ক্রামারদের বাড়িতে খোঁজ নিতে বললেন এড হোলিস। ওদের বাড়িতে অনেক বেড়াল আছে। কোহ্লদের প্রতিবেশী ওরা।

ক্রামারদের বাড়ি যাবার আগে শিলাকে ফোন করলেন আবরার। শিলা জানাল বিষ্যুদবারের মধ্যে সে কাজ শেষ করতে পারবে। এরপর জানতে চাইল আবরার বেড়ালের খোঁজ পেয়েছেন কিনা। আবরার বেড়াল বিষয়ক সমস্ত ঘটনা তাকে বললেন। তারপর রওনা হয়ে গেলেন ক্রামারদের বাড়ির উদ্দেশে।

মিসেস ক্রামারের সাথে দেখা হলো আবরারের। কথা শুনে বোঝা গেল আবরারকে চেনেন তিনি, এর আগেও দেখেছেন। 'ভেতরে আসুন,' আমন্ত্রণ জানাল মিসেস ক্রামার।

'আজ থাক, মিসেস ক্রামার,' বিনয়ের সুরে বললেন ডক্টর। 'ছুটকো একটা কাজে আপনাকে বিরক্ত করছি। শুনলাম আপনার একটা ধূসর বেড়াল আছে। আমার বাড়িতেও ধূসর রঙের একটা বেড়াল হঠাৎ ঢুকে পড়েছে। ভাবলাম—'

'জ্বী, আমার ধূসর রঙের একটা বেড়াল ছিল। দু'দিন ধরে ওটা লাপাত্তা।'

'তা হলে ও বেড়ালটাই আপনার হবে। আমি ওটাকে পুষব ভাবছি। অবশ্য আপনি যদি বিক্রি করতে রাজি হন—'

হেসে উঠলেন মহিলা। 'বিক্রি করার প্রশ্নই ওঠে না। তবে আপনি পুষতে চাইলে রেখে দিতে পারেন। আমার বাড়িতে বেড়ালের অভাব নেই।'

'ধন্যবাদ। মিসেস ক্রামার। আপনার ধূসর বেড়ালটার নাম কী?'

'জেরী।'

'আমি ওর নাম দিয়েছি বিল্লি। কেমন হয়েছে বলুন তো।'

জবাবে হাসিতে ফেটে পড়লেন মিসেস ক্রামার।

বেড়ালটা নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে ডক্টর আবরার আসছেন, সে তাড়াতাড়ি দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। আবরার দরজা খুলতেই বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল, চট করে ওটাকে ধরে ফেললেন আবরার। 'উঁহু, তোমার কোথাও যাওয়া চলবে না, বিল্লি। আমার সাথে কয়েকদিন তোমাকে থাকতে হবে। তারপর সিদ্ধান্ত নেবে বিল্লি হয়ে আমার কাছে থাকবে নাকি জেরী হয়ে ফিরে যাবে ক্রামারদের কাছে।'

ষোলো

মশা-মাছি প্রতিরোধের জন্যে বাড়িতে নেট টাঙানো দরকার। তাই ডক্টর আবরার পরদিন শহরে গেলেন ছুতোর মিস্ত্রি হ্যাঙ্ক পার্ডির সাথে কথা বলতে। পার্ডি বলল এখন সে খুব ব্যস্ত, আগামী হপ্তার আগে সময় দিতে পারবে না। 'ঠিক আছে' বলে ওখান থেকে সোজা শিলা রহমানের বাসায় গেলেন আবরার।

আজ বিষ্যুদবার। শিলা অপেক্ষা করছিল ডক্টরের জন্যে। তাঁর গাড়ির আওয়াজ শুনেই দরজা খুলে দিল।

'আসুন, ডক্টর। সব রেডিই আছে। বসুন, আমি নোটবই আর ম্যানুস্ক্রিপ্ট নিয়ে আসছি।'

'ধন্যবাদ, মিস শিলা। তবে আমার বন্ধুদের যে চিঠি লেখার কথা বলেছিলাম আজ আর আপনাকে দিয়ে তা লেখাব না। চিঠি এবং স্টেটমেন্ট পাঠাবার আগে আরও দু'একটা দিন একটু ভেবে নিই। এর মধ্যে কোনও ঘটনা ঘটলে ওর মধ্যে যোগ করতে পারব।'

'ঠিক আছে। আপনার যেমন ইচ্ছা,' একটা বড়, বাদামী খাম এগিয়ে দিল শিলা আবরারকে। 'পড়ে শোনাব এখন?'

মাথা নাড়লেন আবরার। 'বাসায় বসে পড়ব। আপনার সময় থাকলে বরং দু'চারটে কথা বলি।'

শিলা রহমানের সময় আছে। ডক্টর বেড়ালটার কথা বললেন ওকে। 'ওটাকে নিয়ে যে ভয় কাজ করছিল মনে তা অনেকটাই কেটে গেছে,' হাসলেন তিনি। 'আসলে আপনার ভূতে ধরা বা ওই ধরনের কথা শুনে আমার মনেও ভয় ধরে গিয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে বেড়ালটাকে ভয় পাবার

কিছু নেই। নিতান্তই সাধারণ একটা বেড়াল ওটা, মিস শিলা।'

'আর টাইগারও সাধারণ একটা কুকুর ছিল, অন্তত আপনার গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত। তবে আপনি যা-ই বলুন, ডক্টর, আমি কিন্তু পুরোপুরি দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারছি না। ব্যাপারটা যদিও হাস্যকর শোনাচ্ছে—কিন্তু আপনাকে নিয়ে আমি চিন্তায় আছি।'

'আমার কিছু হবে না, মিস শিলা। আসলে আমরা দু'জনেই ব্যাপারটাকে অতিরঞ্জিত করে ফেলেছি।'

'হয়তো ডক্টর...আপনি চিঠি আর রিপোর্টগুলো আপনার বন্ধুদের পাঠাবেন তো?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আবরার। 'আচ্ছা, পাঠাব। তবে ক'টা দিন সময় দিন।'

'আচ্ছা, সময় নিন। আমি এ হপ্তাটা বাড়িতেই আছি। কাজেই যে কোনও সময় এলেই আমাকে পাবেন।'

সে রাতে, খাওয়া-দাওয়া শেষে, লিভিংরুমের সোফায় এসে বসেছেন আবরার, বেড়ালটা তাঁর পাশে বসল। তিনি ওর নরম, রেশমি লোমে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। আরামে গরগর করল বেড়াল।

'তারপর, খবর কী তোমার, বিল্লি?' বললেন তিনি। 'ভাল লাগছে এখানে থাকতে? পছন্দ হচ্ছে আমাকে? বন্দী বন্দী লাগছে না তো? ঠিক আছে তোমাকে আমি কাল-পরশুর মধ্যে একবার বাইরে যেতে দেব। এখন আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও দেখি।'

উঠে দাঁড়ালেন আবরার, একটা চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসলেন বেড়ালটার। আবার শুরু করলেন, 'বিল্লি, তুমি লুকিয়েছিলে কেন? দোতলার জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকেছ কেন? জান না, বেড়ালরা অমন কাজ করে না, এখনকার মত স্বাভাবিক আচরণ কেন করনি তুমি আগে?'

থাবা দুটো টানটান করল বেড়াল, তারপর আবার কুণ্ডলী পাকিয়ে বন্ধ করল চোখ।

'বিল্লি,' কঠিন গলায় তাকালেন আবরার। চোখ খুলে গেল ওটার, তাকাল ডক্টরের দিকে।

'বিল্লি, আমি কথা বলার সময় ঘুমানো চলবে না, তুমি তো কোহ্লদের প্রতিবেশীদের বাড়িতে থাকতে। জানো, হেলমুট যেদিন আত্মহত্যা করেছে, সে রাতে তাদের একটা বেড়ালও একই কাজ করেছে? সোজা একটা হিংস্র কুকুরের মুখে গিয়ে পড়েছে। কিন্তু কেন আত্মহত্যা করবে?'

বেড়ালটা আবার চোখ বুজল, তবে আবরারের মনে হলো ঘুমায়নি ওটা।

'একই রাতে একটা পেঁচাও আত্মহত্যা করেছে, সে কথা জানো? তার আগে রনি মারা গেল, মারা গেল ওদের কুকুরটাও, আমারই গাড়ির নীচে

চাপা পড়ে। কুকুরটা লুকিয়ে ছিল রাস্তার পাশে, আমার গাড়ি লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে। ইচ্ছে করে।

'দুটো মানুষ। চারটে প্রাণী—এরা সবাই আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু কেন? নাকি ওদের আত্মহত্যায় বাধ্য করা হয়েছে কারও স্বার্থ হাসিল হবার পর? কেউ কি ওদের ব্যবহার করেছে?'

বাইরে হাজার হাজার ঝিঁঝিঁ ডাকছে, জানালা দিয়ে তাকালেন আবরার। নিকষ অন্ধকার। তার মনে পড়ছে লেমিংদের কথা। এরা দল বেঁধে সাগরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। ওরা কি সবাই পাগল? নাকি লেমিংরা এমন কিছু জানে যার কথা আমরা জানি না। তিনি আবার ঘুরলেন বেড়ালের দিকে।

'বিল্লি, ওই প্রাণীগুলো কেন আত্মহত্যা করেছে, বলো তো? তুমি যদি ওদের একজন হও তা হলে তুমি কেন কাজটা করছ না? নাকি এখানে বদ্ধ অবস্থায় থেকে আত্মহত্যার সুযোগ পাচ্ছ না? ঠিক আছে, ব্যাপারটা আমি এখুনি পরীক্ষা করে দেখছি।'

লিভিংরুম থেকে বেরিয়ে নীচতলার স্টোররুমে ঢুকলেন ডক্টর, এখানে তিনি মাছ ধরার সরঞ্জামের সাথে কিছু আর্মসও রেখেছেন। গরমের সময় উইসকনসিনে শিকার তেমন কিছু মেলে না জেনেও আবরার একটা পিস্তল আর রাইফেল নিয়ে এসেছেন টার্গেট প্রাকটিসের জন্যে। সেই সাথে ব্রান্ড নিউ শটগানও রয়েছে। নতুন অস্ত্রটা যদি কোনও কাজ লাগানো যায়, এই ভেবে আনা।

পিস্তলটা নিলেন তিনি, একটা .৩৮ ক্যালিবারের স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন স্পেশালের সাথে একটা কার্ডবোর্ড রাইফেল টার্গেটও বের করলেন। তারপর বন্দুক নিয়ে চৌকোনা কার্ডবোর্ডটা লিভিংরুম এবং হলঘরের মাঝামাঝি মেঝের ওপর দাঁড় করিয়ে ফিরে গেলেন নিজের আসনে। বন্দুক কক করার শব্দে মাথা তুলল বেড়াল।

'শোনো, বিল্লি,' বললেন তিনি, 'এসো, ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখ। তুমি যদি বাইরে যেতে চাও আত্মহত্যা করতে তা হলে কাজটা সহজ করে দিচ্ছি তোমার জন্যে। ওই দরজার কাছে যাও, টার্গেটের ওপর বসো, আমি তোমাকে গুলি করে মেরে ফেলি।'

বেড়ালটা ঘুমঘুম চোখে একবার পিটপিট করে তাকাল আবরারের দিকে, তারপর মাথা নামিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল—নাকি ঘুমের ভান করল?

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ডক্টর। তিনিও ধরে নিয়েছিলেন বেড়ালটা টার্গেটে গিয়ে বসবে না। তিনি পিস্তল আর টার্গেট আগের জায়গায় রেখে কিচেনে ঢুকলেন। ঘুমাবার আগে এক গ্লাস বিয়ার খাওয়া দরকার।

পরদিন শুক্রবার। শহরে গেলেন আবরার আড্ডা দিতে। বেরুবার আগে

বেড়ালটার আচরণে কোনও অস্বাভাবিকতা লক্ষ না করে খুশিই হয়েছেন তিনি। ওকে নাস্তা দিয়েছেন তিনি। বেড়ালটা চেটেপুটে সব খেয়েছে। যেন এ বাড়ির পরিবেশের সাথে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে সে। নাকি এটা আবরারকে পটানোর জন্য করছে? জানে, আবরার তাকে সোমবার বাইরে যেতে দেবেন। তবে ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ চিন্তা করেননি আবরার। শহরে এসে তার সম্পাদক বন্ধুর সাথে আড্ডা দিলেন। তারপর লেকে গেলেন মাছ ধরতে। তিনটে মাছ ধরা পড়ল বড়শিতে। দুটো তিনি রান্না করে খেলেন, বাকিটা বেড়ালকে দিলেন। বেড়াল গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করল ওটা। আবরার বললেন, 'যদি আমার সাথে থাকো তা হলে তিনদিন অন্তর মাছ খেতে দেব তোমাকে।'

বেড়াল কিছু বলল না। চোখ বুজে পরম আয়েশে কাঁটা চিবোচ্ছে।

সোমবার সকাল থেকে ঝিরঝির বৃষ্টি শুরু হলো। আজ বেড়ালটাকে বাইরে যেতে দেয়ার দিন। আবরার পরীক্ষা করে দেখতে চান বেড়ালটা তার আগের আস্তানায় ফিরে যায় নাকি তাঁর কাছেই ফিরে আসে।

কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময় দরজা খুলে দিলেন আবরার। বেড়ালটা লাফঝাঁপ দিল না, হালকা পায়ে বেরিয়ে গেল খোলা দরজা দিয়ে।

বিনকিউলার রেডিই ছিল, আবরার দ্রুত উঠে এলেন দোতলায়। বেড়ালটা কোন দিকে যায় দেখবেন। বেড়ালটা হেলেদুলে হাঁটছে রাস্তা দিয়ে, কোনও তাড়া নেই। আস্তে হেঁটে ওটা পৌঁছল রাস্তার শেষ মাথায়, দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল আবরারের বাড়ির দিকে। চট করে জানালার পাশ দিয়ে সরে গেলেন আবরার। ওটা কি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে যাবে কি যাবে না? নাকি দেখছে কেউ ওকে লক্ষ করছে কিনা।

রাস্তার শেষ মাথায় কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল বেড়াল। তারপর আবার হাঁটা দিল। এবার আগের চেয়ে দ্রুত। তবে যে রাস্তাটা ক্রামারদের বাড়ির দিকে গেছে সেদিকে নয়, জঙ্গলের দিকে। খানিক পরে অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

বিনকিউলার চোখ থেকে নামিয়ে চাঁদি চুলকালেন ডক্টর আবরার। ওটার আচরণ তো এ পর্যন্ত স্বাভাবিকই মনে হলো। তবে–

আবরার সিদ্ধান্ত নিলেন বেড়ালটার খোঁজে জঙ্গলে যাবেন। বৃষ্টি থেমেছে আধা ঘণ্টা আগে। ভেজা মাটিতে বেড়ালের পায়ের ছাপ ফুটে থাকবে। তিনি দেখতে চান বেড়ালটা কোথায় গেল। এই ফাঁকে একটু বেরিয়ে আসাও হবে।

মাথায় হ্যাট চাপিয়ে, বগলে রেইনকোট নিয়ে (হঠাৎ যদি আবার বৃষ্টি নামে) বেরিয়ে পড়লেন আবরার। মাটিতে বেড়ালটার পায়ের ছাপ ফুটে আছে স্পষ্ট। তবে জঙ্গলের মধ্যে ছাপ খুঁজে পেতে কষ্ট হলো। কারণ

এদিকের বেশির ভাগ রাস্তায় ঘাস জন্মেছে। তবে বাঁচোয়া এটাই যে, বেড়ালটা দিক বদল না করে সোজা রাস্তায় এগিয়েছে।

প্রায় দেড় মাইল হাঁটার পর ট্রেইল শেষ হয়ে গেল। সামনে হাত চারেক প্রশস্ত ছোট প্রস্রবণ। বেড়াল কি লাফ মেরে এটার ওপর দিয়ে চলে গেছে? তিনি লাফ দিয়ে অপর পাড়ে চলে এলেন। প্রস্রবণটার দুই তীরের মাটিই ভেজা। কিন্তু এ পাড়ে বেড়ালের পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে না। বোঝা যায় বেড়ালটা এ পাড়ে আসেনি। তা হলে কোথায় গেল? তিনি ঢাল লক্ষ্য করে এগোতে লাগলেন। বিশ গজ যাবার পর যে দৃশ্যটা দেখলেন, ঘাড়ের পেছনের সমস্ত চুল দাঁড়িয়ে গেল সরসর করে।

পানিতে ভাসছে ধূসর রঙের বেড়ালটা।

এবার আর মনে সন্দেহ রইল না ডক্টর আবরারের আগে যে সব ঘটনা ঘটেছে, তা আসলে ঘটানো হয়েছে। আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়েছে সবাইকে। বুঝে গেছেন ডক্টর বেড়ালের ওপর যে জিনিসটা এতদিন ভর করেছিল তাঁর বাড়িতে, এতদিন শুধু সুযোগ খুঁজছিল বেরিয়ে আসার। স্বাভাবিক আচরণ করেছে সে আবরারের সাথে যাতে ডক্টরের মনে কোনও সন্দেহ জাগতে না পারে। সে এতদূর এসে আত্মহত্যা করেছে যাতে তার লাশ খুঁজে না পাওয়া যায়, যাতে ভেসে যায় স্রোতের সাথে। কিন্তু আত্মহত্যাই এটার শেষ উদ্দেশ্য নয়। গভীর কোনও উদ্দেশ্য আছে এর। কী সেটা?

ওটা যে-ই হোক বা যা-ই হোক তার ভিক্টিমদের যে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে তা বোঝাই যাচ্ছে। একের পর এক খুন করে চলেছে। কিন্তু কেন? ভয়ঙ্কর কোনও উদ্দেশ্য আছে অদৃশ্য আততায়ীর?

গা শিরশির করে উঠল ডক্টর আবরারের। তিনি একটা ডাল দিয়ে বেড়ালটার লাশ তুলে নিলেন পানি থেকে। একটা কাপড়ে মুড়ে গাড়ির পেছনে রাখলেন। লাশটাকে কি তিনি গ্রীনবে-তে পাঠাবেন অটোপসি'র জন্যে? কিন্তু কী পরীক্ষা করতে বলবেন তিনি ডাক্তারদের? তিনি ভাল করেই জানেন ওটার র‍্যাবিস নেই। এক ঘণ্টা আগেও বেড়ালটাকে একদম সুস্থ এবং স্বাভাবিক দেখেছেন আবরার।

বাড়ি ফিরে পাইপ ধরিয়ে সোফায় বসলেন আবরার। ভাবছেন। অনেকক্ষণ পর সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর প্রথম কাজ হবে স্টেটমেন্টের কপি বন্ধুদের পাঠিয়ে দেয়া। তবে বেড়ালের ঘটনাটাও এর সাথে যোগ করতে হবে। তিনি শিলার সাথে দেখা করতে চললেন শহরে।

শিলা বাসায় নেই। দরজায় চিরকুট রেখে গেছে।

'তিনটার সময় ফিরব।' এদিকে লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। আবরার ডাউন টাউনের রেস্টুরেন্টে ঢুকে লাঞ্চ করলেন, গল্প করার লোক ছিল

অনেক। কিন্তু গল্প করতে মন চাইল না। বিয়ার খেয়ে সময় পার করতে লাগলেন। তিনটার খানিক আগে উঠে পড়লেন তিনি।

শিলাকে এবার বাসায় পাওয়া গেল।

'আরে, ডক্টর,' উদ্বেগ ফুটে উঠল শিলার কণ্ঠে আবরারের চেহারা দেখে। 'আসুন, ভেতরে আসুন। কী হয়েছে?'

গম্ভীর চেহারা নিয়ে পুরো ঘটনা শিলাকে খুলে বললেন ডক্টর। তাকে কিছু ডিকটেশনও দিলেন। ঘণ্টাখানেক লাগল কাজটা শেষ করতে।

শিলা মুখ তুলে চাইল। 'ডক্টর! এ স্টেটমেন্ট দুটো আপনার বন্ধুদের পাঠানোর পাশাপাশি শেরিফকেও ঘটনাটা জানানো উচিত নয় কি? আর শেরিফ ঘটনাটা সিরিয়াসভাবে না নিতে চাইলে এফ বি আইকে-ও বলতে পারেন।'

মাথা ঝাঁকালেন আবরার। 'তাই করব ভাবছি। নিন, এবার চিঠি দুটো লিখে ফেলুন।'

আবার ডিকটেশন শুরু হলো। শেষ হতে প্রায় পাঁচটা বেজে গেল। আবরার জানতে চাইলেন। 'টাইপ করতে কতক্ষণ লাগবে আপনার?'

'ঘণ্টা চারেক। তবে এখুনি শুরু করব। আপনি এই ফাঁকে শেরিফের সাথে দেখা করে আসুন না–'

'না, আমি তাঁকে ফুল স্টেটমেন্ট পড়ে শোনাতে চাই। আর আপনাকে না খেয়ে কাজ করতে হবে না। আমার সাথে চলুন। ডিনার করে আসবেন। আপনাকে আমি পৌঁছে দিয়ে যাব। রাতের মধ্যে কাজটা শেষ করতে পারলেই হলো। কাল সকালে আমি শেরিফের সাথে কথা বলব। আর চিঠি দুটো স্পেশাল এয়ারমেইল ডেলিভারিতে পাঠিয়ে দেব।'

'কিন্তু আপনি আজ রাতে আবার ওই বাড়িতে যাবেন? আমার কেমন ভয় লাগছে।'

হাসলেন আবরার। 'ভয় পেতে হবে না। আজ রাতে আমার কিছু হবে না, শিলা।'

ঠিকই বলেছেন ডক্টর। কারণ ভিনগ্রহের হন্তারক তখন অন্য কাজে ব্যস্ত।

সতেরো

বিরক্তিকর বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ভিনগ্রহের প্রাণী অবশেষে কোহলদের খামার বাড়িতে নিজের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গেছে। এবার নিজের ওপর

পুরোপুরি সন্তুষ্ট সে। বেড়াল হোস্টকে সে এতদূরে নিয়ে এসে ডুবিয়ে দিয়েছে যে কেউ হয়তো কোনদিন তার খোঁজ পাবে না। আবরার যদি শোনে বেড়াল তার আগের আস্তানায় ফিরে যায়নি, সামান্য অবাক হতে পারে। তবে সে কোনদিনই জানতে পারবে না আজ রাতে, যখন আবরার ঘুমিয়ে থাকবে তার ওপর ভর করতে চলেছে ভিনগ্রহের হন্তারক।

তার পরিকল্পনাটি সরল। বেড়াল হয়ে ঘুরঘুর করা ছাড়া তার আর কোনও কাজ ছিল না আবরারের বাড়িতে। তবে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল যখন আবরার তাকে গুলি করবে বলেছিল। ফাঁদটা অবশ্য ঠিকই টের পেয়েছে সে। তাই ধরা দেয়নি ফাঁদে। সে টার্গেটে গিয়ে বসলে আবরারের মনে সন্দেহ জাগত। আবরার তাকে গুলি না করে যদি খাঁচায় পুরে রাখত তা হলে সর্বনাশের পোয়াবারো হত। না খাইয়েই হয়তো তাকে মেরে ফেলত আবরার।

যাক, সব ভালয় ভালয় গেছে। আজ রাতের পর সে পুরোপুরি বিপদমুক্ত হতে পারবে। সে এমন একজনকে তার হোস্ট বানাবে যে ছিল তার শত্রু কিন্তু হোস্ট হিসেবে অসাধারণ। এখন সবার আগে দরকার আবরারের বাড়িতে পৌঁছানো। তার তো আর নিজের চলাফেরা করার ক্ষমতা নেই। কাজেই একজনকে হোস্ট বানাতে হবে। সে-ই আবরারের বাড়িতে তাকে পৌঁছে দেবে।

হোস্টের খোঁজ করতে হলো না ভিনগ্রহের খুনীকে। জিম ব্রামার নিজেই হাজির হয়ে গেল হোস্ট হিসেবে। ছেলেটা রনির বয়সী, আগামী বছর কলেজে ঢুকবে। ইচ্ছে আছে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ার। আপাতত ছুটিতে বাড়ি এসেছে। তার বাবা, মি. ব্রামার ছেলেকে বলেছেন তাদের প্রতিবেশী মিসেস কোহ্লের বাড়িতে ফুট ফরমাশ খাটতে। মিসেস কোহ্লের ব্রামারদের কাছে তার বাড়ি বিক্রি করে দেয়ার একটা সম্ভাবনা আছে।

জিম মিসেস কোহ্লের বাড়িতে এসেছে তাকে কী করতে হবে জানাতে। মিসেস কোহ্ল ওকে ক্ষেত থেকে কিছু ভুট্টা আর শসা নিয়ে আসতে বললেন। লাঞ্চে রান্না করবেন।

ক্ষেত থেকে জিনিসগুলো এনে জিম মিসেস কোহ্লের হাতে দিল। বেরিয়ে যাচ্ছে, মিসেস কোহ্ল ডাক দিলেন। 'দাঁড়াও, জিম। লাঞ্চের সময় তো হয়েই গেল। একটু জিরিয়ে নাও। তারপর আমার সাথে খাবে।'

আপত্তি করল না জিম। গোলাঘরে বিশ্রাম নেয়ার কথা বলে সে একটা খড়ের গাদায় শুয়ে পড়ল। মাঠে অনেক কাজ করেছে সে। একটু পরেই নাক ডাকতে লাগল। আর ওই সুযোগটাই কাজে লাগাল ভিনগ্রহের হন্তারক। ভর করল সে জিম ব্রামারের ওপর।

সেই রাতের ঘটনা। জিম ব্রামারদের নিজেদের বাড়ি। ডিনার শেষে নিজের ঘরে বসে খানিকক্ষণ 'পপুলার মেকানিক্স'-এর পাতা উল্টাল জিম, রেডিও শুনল। রাত দশটার দিকে ওর বাবা-মা যখন ঘুমাতে যাচ্ছে, চট করে রেডিও বন্ধ করে ফেলল জিম। বাবা-মাকে জানতে দিতে চায় না সে জেগে আছে।

ঘণ্টাখানেক পরে, বাবা-মা ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝতে পেরে জামা-কাপড় পরল জিম, পায়ে জুতো গলিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল ঘর ছেড়ে।

ঝলমলে চাঁদনী রাত। জিম দ্রুত হাঁটা দিল মিসেস কোহ্‌লের বাড়ির দিকে। সরাসরি চলে এল কিচেনে, সিঁড়ির তলা থেকে বের করল কচ্ছপের খোলটাকে। শার্টের ভেতর পুরে সাবধানে বুজিয়ে দিল গর্ত। তারপর হনহন করে এগোল আবরারের বাড়ির দিকে।

আবরারের বাড়ি অন্ধকার। সম্ভবত ঘুমুচ্ছে সে। তবে সাবধানের মার নেই ভেবে জুতো খুলে ফেলল জিম। পা টিপে টিপে চলে এল রান্নাঘরে। রান্নাঘরের সিঁড়ির নীচে কচ্ছপের খোলটাকে লুকোবার চমৎকার জায়গা আছে। জিম খুবই সাবধানে সিঁড়ির নীচে গর্ত খুঁড়ে কচ্ছপ আকারের জিনিসটাকে কবর দিল। তারপর সতর্কতার সাথে বুজিয়ে দিল কবর। বোঝার উপায় থাকল না এখানে খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছে। তারপর বাড়ি ফিরে চলল জিম।

জিমকে ইচ্ছে করলে আজ রাতেই মেরে ফেলতে পারত হন্তারক। কিন্তু লোকের মনে আর সন্দেহ জাগিয়ে তুলতে চায় না সে। সিদ্ধান্ত নিয়েছে জিমকে কাল সকালে রোড অ্যাক্সিডেন্টে মেরে ফেলবে। ঘটনাটা এমনভাবে ঘটাবে, কারও মনে সন্দেহ জাগার অবকাশ থাকবে না। সে জানে কাল সকালে জিম পাঁচ বুশেল শস্যসহ ট্রাক নিয়ে গ্রীনবে-তে যাবে। ট্রাক চালাবে জিম নিজে। ওর বাবার সাথে সেই কথাই হয়েছে। জিমের স্মৃতি ঘেঁটে সে দেখেছে গ্রীনবে-তে যাবার রাস্তায় একটা কংক্রিটের ব্রিজ পড়বে। ব্রিজে ওঠার পর জিমকে দিয়ে ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে গাড়ি ছোটাবে ভিনগ্রহের প্রাণীটি। ধাক্কা খাওয়াবে পিলারের সাথে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িসুদ্ধ ছাতু হয়ে যাবে জিম। লোকে ভাববে ব্রেক ফেল করে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়েছে জিম। ব্যস, তারপর শুরু হবে আসল খেলা।

আঠারো

রাতে ভাল ঘুম হয়নি ডক্টর আবরারের। সকালে উঠে নাস্তা বানালেন।

তারপর ভাবতে বসলেন আজ কী কী কাজ আছে। শহরে যাবার কথা তাঁর। শিলা হয়তো কালরাতেই চিঠি আর স্টেটমেন্ট টাইপ করে রেখেছে। সকাল ন'টায় তাকে ফোন করবেন বলেছেন। এখন বাজে সাড়ে আটটা। তিনি স্টেশন ওয়াগন নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

শহরে পৌঁছে প্রথমেই শেরিফকে ফোন করলেন আবরার। শেরিফ বললেন, 'ডক্টর, আবার পরে করুন। এইমাত্র স্টেট পুলিশ রেডিও কার থেকে একটা খবর পেয়েছি; বার্টলসভিল আর গ্রীনবে-র মাঝামাঝি জায়গায় অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে। ওখানে যেতে হবে এখুনি, সরি।' লাইন কেটে গেল।

রিসিভার রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন আবরার। ভাবছেন আবার কে অ্যাক্সিডেন্ট করল। তাঁর পরিচিত কেউ নয়তো? হলে শেরিফ হয়তো বলতেন।

একটু পরে আবার শেরিফের অফিসে ফোন করলেন ডক্টর। এবার ফোন ধরল তাঁর ডেপুটি। ডক্টর নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন একটু আগে শেরিফের কাছে তিনি ফোন করেছিলেন। শেরিফ একটা অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলে ফোন রেখে দিয়েছেন তাড়া ছিল বলে। ডেপুটি কি বলতে পারবেন কে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে?

ডেপুটি সজ্জন মানুষ। বলল জেমস ব্রামার নামে হাইস্কুলের এক ছাত্র মারা গেছে। বার্টলসভিলে তার বাড়ি। সে ট্রাক চালিয়ে গ্রীনবে-তে যাচ্ছিল, গাড়ি চালাতে চালাতে সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিল। সোজা ব্রিজের পিলারের সাথে ধাক্কা খেয়েছে ট্রাক। সাথে সাথে মারা গেছে ব্রামার।

জেমস ব্রামারকে চিনতে পেরেছেন আবরার। ছেলেটার কথা আগেও শুনেছেন মিসেস কোহ্‌লের মুখে। তার বাড়িতে কাজ করছিল ব্রামার। আর এই ব্রামারদের বাড়ির ধূসর বেড়ালই গতকাল পর্যন্ত আবরারের সাথে ছিল।

এখন ব্রামার বেচারা মারা গেছে। সন্দেহ নেই তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল তিন, প্রাণীদের আত্মহত্যার সাথে ব্রামারের মৃত্যুর সম্পর্ক রয়েছে বলে দৃঢ় বিশ্বাস ডক্টরের।

এবার আর ভয় লাগছে না আবরারের। বরং আশ্চর্য শান্ত হয়ে গেছেন, কর্তব্যকর্ম স্থির করে ফেলেছেন তিনি এইমাত্র। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। আর নষ্ট করার মানে হয় না।

ওই জিনিসটা, ওটা যাই হোক, একজন কাউন্টি শেরিফের একে সামাল দেয়া সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের দায়িত্ব নিতে হবে এফবিআই এবং পদস্থ বিজ্ঞানীদের। তবে শেরিফের সাথে যে তিনি কথাটা বলবেন না তা নয়, বলবেন। এফবিআই, সেই সাথে আর্মিকেও ব্যাপার জানানো দরকার।

সৌভাগ্যক্রমে দু'টি বিভাগেই হোমরা-চোমরা ব্যক্তিদের সাথে পরিচয় আছে ড. আবরারের। শিলার কাছ থেকে স্টেটমেন্টের কপি আসার পরপরই

তিনি এদের সাথে কথা বলা শুরু করবেন। তবে সবার আগে যা করা দরকার তা হলো বিপজ্জনক ওই বাড়ি ছেড়ে চলে আসা। আবরার ঠিক করলেন তিনি আবার নিজের আস্তানায় ফিরে যাবেন, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে কেটে পড়বেন ওখান থেকে। শিলার কাছ থেকে স্টেটমেন্ট নিয়ে সোজা চলে যাবেন গ্রীনবে-তে, ওখানকার কোনও হোটেলে উঠবেন এবং ফোনে সবার সাথে যোগাযোগ শুরু করবেন। নিজের ওপর বিশ্বাস আছে তাঁর এফবিআই এবং আর্মির লোকজনদের ব্যাপারটা বোঝাতে সমর্থ হবেন। তারা বার্টলসভিলে আসবে তদন্ত করতে।

ভিনগ্রহের হন্তারক তার 'পারসেপ্টর সেন্স' প্রয়োগ করে দেখল ড. আবরার বাড়িতে নেই। আবরার তো প্রায়ই সকালে শহরে যায়। তবে সে মাছ ধরতে যায়নি বা হাঁটতে বেরোয়নি। কারণ গাড়িটা নেই।

ড. আবরারের জিনিসপত্র চেক করল সে। ব্যক্তিগত সমস্ত জিনিসই যথাস্থানে আছে। শুধু কাপড়-চোপড় বাদে। সিঙ্কে ধোয়া ডিশ দেখে বোঝা যায় নাস্তা খেয়েই সে বেরিয়েছে। এত সকালে তার শহরে যাবার কথা নয়। কোনও কারণে তড়িঘড়ি করে বেরিয়েছে। তবে চিন্তার কিছু নেই; ফিরে আসবে সে। তারপর রাতে যখন ঘুমিয়ে পড়বে–

বেড়াল হয়ে সে যে কটা দিন এ বাড়িতে ছিল, তার পারসেপটর সেন্স তেমনভাবে কাজ করেনি। তার পক্ষে বন্ধ ঘর বা ক্লজিটের ভেতরে উঁকি মারা সম্ভব হয়নি। পারেনি বন্ধ বই বা ভাঁজ করা চিঠি পড়তে। এখন, অবসরে, সে তার হারানো শক্তি আবার ফিরে পেতে শুরু করেছে।

হঠাৎ মাটিতে কম্পন অনুভব করল সে, গাড়ি আসছে। আবরারের স্টেশন ওয়াগন। একাই আসছে সে। ঘড়িতে দশটা বাজে।

আবরার সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন, হন্তারক তার 'পারসেপশন সেন্স' প্রয়োগ করল গাড়ির ওপর এবং এই প্রথম বুঝতে পারল কিছু একটা ভজকট হয়ে গেছে। গাড়িতে পুরানো তারপুলিন দিয়ে সযত্নে মুড়ে রাখা হয়েছে ধূসর বেড়ালটার লাশ। ভিনগ্রহের খুনীর দ্বিতীয় শেষ হোস্ট। একে আবরার কোথায় পেল, এটাকে গাড়িতেই বা রেখেছে কেন? আবরার কি তা হলে জঙ্গলে সেই প্রস্রবণের কাছে গিয়েছিল? সে এই সম্ভাবনার কথা কল্পনাও করেনি। সে শুধু পেছনে, বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেছিল কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা। কেউ পিছু নেয়নি বলে সন্তুষ্টবোধ করছিল সে। কিন্তু ওই ঝিরঝিরে বৃষ্টি–সন্দেহ নেই, মাটিতে তার পায়ের ছাপ অনুসরণ করেছে আবরার। ইস, আবার সে ধরা খেল।

অসুবিধে নেই, আবরার বাড়ি ফিরেছে। এখন হোক আর পরে হোক, নিশ্চয়ই সে ঘুমাবে। তারপর সে কী সন্দেহ করেছে তাতে কিছু আসবে যাবে

না।

কিন্তু আবরার এটা কী করছে? সে স্টোররুম থেকে সুটকেস বের করে দোতলায় যাচ্ছে কেন? সুটকেসে জামা-কাপড়সহ নিত্য-ব্যবহার্য সমস্ত জিনিসপত্র ঢোকাচ্ছে। তার মানে এখান থেকেও চিরতরে চলে যাবার পরিকল্পনা করেছে।

উঁহু, এ কিছুতেই হতে দেয়া যায় না। তাকে যেভাবেই হোক ঠেকাতে হবে।

ড. আবরার সুটকেস দুটো এনে স্টেশন ওয়াগনের পেছনে রাখলেন। তারপর আবার বাড়িতে ঢুকলেন। দ্রুত একবার চক্কর দিলেন সারা বাড়ি, দরজা-জানালা বন্ধ করলেন। রান্নাঘরে ঢুকে ইতস্তত করলেন সুইচ অফ করবেন কিনা। তা হলে বেযমেন্টের গ্যাসোলিন ইঞ্জিন এবং জেনারেটর বন্ধ হয়ে যাবে। যাক, বন্ধ করার দরকার নেই। ফ্রিজে খাবার আছে। নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি আবার আসবেন। তবে একা অবশ্যই নয়।

ফিশিং ইকুইপমেন্ট, পিস্তল বন্দুক ইত্যাদি নিয়ে স্টেশন ওয়াগনে উঠে বসলেন আবরার। স্টার্ট দিলেন ইঞ্জিন। ঠিক তখন ওটাকে চোখে পড়ল তাঁর।

একটা হরিণ। বিশালদেহী। গাড়ি থেকে পঞ্চাশ হাত দূরে, জঙ্গলের কিনারে, যেখান থেকে তার বাড়ির সীমানা শেষ এবং রাস্তার শুরু, ঠিক সেখানটায়। কটমট করে তাকিয়ে আছে হরিণটা আবরারের দিকে। তারপর নিচু করল মাথা, খুর দিয়ে ধুলো ওড়াল, হামলার জন্য প্রস্তুত।

ওটা কী করতে যাচ্ছে বুঝে ফেললেন ডক্টর। দ্রুত গিয়ার দিলেন তিনি। তাঁর ইচ্ছে হরিণটাকে পাশ কাটিয়ে যাবেন। কিন্তু সে সুযোগ তাঁকে দিল না হরিণ। গাড়ি চলতে শুরু করেছে, ওটাও শিং বাগিয়ে তেড়ে এল। গাড়ি পিছিয়ে আনার সুযোগও পেলেন না আবরার। দুশো পাউন্ড ওজনের শরীর নিয়ে চলন্ত মিসাইলের মত হরিণটা গোত্তা খেল রেডিয়টরের কেন্দ্রে, দুই হেডলাইটের মাঝখানে। প্রচণ্ড সংঘর্ষে খুলি ফেটে চুরচুর হয়ে গেল হরিণের, ঘাড় ভেঙে মাটিতে পড়ে গেল লাশ হয়ে। ভয়ানক ঝাঁকি খেলেন আবরার, ড্যাশবোর্ডের সাথে ভীষণভাবে ঠুকে গেল মাথা, চোখের সামনে জ্বলে উঠল লাল-নীল হরেক রঙের তারা।

থেমে গেছে ইঞ্জিন। আবরার ইগনিশন অফ করলেন, আবার স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা থেকে বিরত থাকলেন। জানেন এ গাড়ি গ্যারেজে না নিয়ে গেলে আর চলবে না।

তাঁর কাছে অস্ত্র আছে .২২ বোরের রাইফেল, পিস্তল আর শটগান। এ নিয়ে পায়ে হেঁটে শহরে যাবার ঝুঁকি নেয়া সম্ভব নয়। এক পাল জানোয়ার

যদি তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া হয়, কী করতে পারবেন তিনি? মাঠ বা আল ধরে যাবার উপায় নেই। ওখানে ষাঁড় আর গরুর দল ঘাস খাচ্ছে। আর জঙ্গলের মধ্য দিয়েও যাবার প্রশ্ন নেই। ওখানে প্রচুর হরিণ আছে। একটা দুটো ভালুক বা ওয়াইল্ড ক্যাট থাকাও বিচিত্র নয়। এগুলোর চেয়েও ভয়াবহ বিপদ আসতে পারে তাঁর শত্রু যদি ভাত-ঘুম দেয়া কোনও লোকের ওপর ভর করে বসে। যদি মিসেস কোহ্ল বা মিসেস ব্রামার শটগান বা রাইফেল নিয়ে হাজির হয়ে যায়, তাঁকে গুলি করতে শুরু করে তখন? উল্টো তিনিও কি গুলি করবেন? মহিলাদের গায়ে হাত তুলতে পারবেন না, ভাল করেই জানেন আবরার, আর রাস্তায় হেঁটে গেলে জানোয়ার বা মানুষ যে-ই আসুক, কতজনকে হত্যা করবেন তিনি? কেউ না কেউ তাঁকে ঠিকই পেড়ে ফেলবে। তাঁর অজানা শত্রু একের পর এক হামলাকারীকে পাঠাবে। সবাইকে সামাল দেয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না তাঁর পক্ষে।

তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে–ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান ঘটেছে। তাঁর শত্রু–ওটা যাই হোক–আর ভান করার প্রয়োজন বোধ করছে না। ওটা ড. আবরারকে এখানে আটকে রাখতে চাইছে, হয়তো সফলও হবে। পেছনের সিটে হাত বাড়িয়ে শটগান আর পিস্তল তুলে নিলেন ডক্টর। লোড করে রাখলেন।

অদ্ভুতই বলতে হবে, তাঁর একটুও ভয় করছে না, আগের চেয়ে অনেক শান্ত লাগছে নিজেকে। এ যুদ্ধে জিততে হলে উত্তেজিত হওয়া বা মাথা গরম করা চলবে না। এ যুদ্ধে প্রধান অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগাতে হবে মনের শক্তি। ফায়ার আর্মস দিয়ে লড়াই জেতা যায়, যুদ্ধ নয়।

প্রথম প্রশ্ন হলো–সারভাইভাল। তিনি এখানে বেশি নিরাপদ থাকবেন নাকি বাড়িতে? হয়তো বাড়িতে। শত্রু চায় না তাঁর কাছে কোনও সাহায্য আসুক। আচ্ছা, তিনি যদি চুপচাপ বসে থাকেন এবং পালাবার চেষ্টা না করেন তা হলেও কি তাঁর শত্রু তাঁকে খুন করবে? মনে হয় না। শত্রু চাইলে অনেক আগেই তিনি মরে ভূত হয়ে যেতেন। গাড়িতে ওঠার আগেই হরিণটা তাঁকে গুঁতিয়ে দফারফা করে দিতে পারত। তিনি তো ওটাকে আগে লক্ষই করেননি।

ডক্টর আবরার সিদ্ধান্ত নিলেন বাড়িতে ঢুকবেন তিনি। পিস্তল পকেটে রেখে, শটগান রেডি করে সাবধানে গাড়ি থেকে নামলেন তিনি। চারপাশে সতর্ক নজর বোলালেন। জ্যান্ত কিছু দেখা যাচ্ছে না।

তবে–

মুখ তুলে আকাশের দিকে চাইলেন আবরার। একশ' ফুট উঁচুতে বাতাসে ধীর গতিতে বৃত্ত রচনা করে উড়ছে একটা ওয়াইল্ড ডাক। বুনো হাঁস ওভাবে ওড়ে না। তার মানে কি পরবর্তী হামলা আসছে আকাশ থেকে? এটা

তো আরও বিপজ্জনক। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় শূন্য থেকে মিসাইলের মত কোনও শক্তিশালী, ওজনদার পাখি যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড়ের ওপর তা হলে আর দেখতে হবে না।

আবরার বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছেন, ডাইভ দিল ওয়াইল্ড ডাক। ঝট করে বন্দুক তুললেন ডক্টর, দ্রুত সরে গেলেন এক পাশে। না, পাখিটা তাঁর ওপর হামলা করার জন্য ডাইভ দেয়নি। তাঁর কাছ থেকে হাত দশেক দূরে, মাটিতে আছড়ে পড়ল ধুলোর মেঘ উড়িয়ে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে বাড়িতে ঢুকলেন ডক্টর, বন্ধ করে দিলেন দরজা। না, শত্রু তাকে হত্যা করতে চায় না, এখানে বন্দী করে রাখতে চায়। ওয়াইল্ড ডাকটা তাঁকে ইচ্ছে করে মিস করেছে। শত্রু বুঝিয়ে দিল বাইরে গেলে কী দশা হবে তার।

শটগানের ওপরের ব্যারেল রিলোড করে অস্ত্রটা সদর দরজার পাশের জানালার সাথে হেলান দিয়ে রাখলেন আবরার। পকেট খালি করে অতিরিক্ত শেল আর কার্তুজগুলো সোফায়, হাতের নাগালে রেখে দিলেন। তারপর সোফার হাতলে বসে তাকিয়ে রইলেন জানালা দিয়ে।

জীবনের কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না বাইরে। তা হলে কি সবই তাঁর কল্পনা? তিনি কি পায়ে হেঁটে রওয়ানা হবেন শহরের উদ্দেশে? নাহ্, তা উচিত হবে না। হরিণ আর ওয়াইল্ড ডাকের চেহারা ভেসে উঠল চোখে।

আচ্ছা, তার শত্রুর প্রকৃতি কী? ওটা কি মানুষ, দানব নাকি ভিনগ্রহবাসী? হয়তো শেষেরটাই ঠিক।

শিলা বলেছিল না পৃথিবী ছাড়াও ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি গ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণী বাস করতে পারে।

কিন্তু ভিনগ্রহবাসীর তাঁর ওপর এত আক্রোশ কেন? এর কারণ কি এই—তিনি তার শত্রুর যে সব তথ্য জেনে গেছেন বা সন্দেহ করেছেন সেটা ভিনগ্রহবাসীর অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলতে পারে? হ্যাঁ, তাই হবে।

তাঁর ধূসর বেড়ালটার কথা মনে পড়ল। বেড়ালটা বন্দী অবস্থায় তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ করেছে। শিলার সাথে তাঁর আলাপচারিতা, স্টেটমেন্টের বিষয় কোনকিছুই হয়তো তার অজানা নেই। শত্রু তাঁকে বিপজ্জনক বলে ধরে নিয়েছে। তবে তাঁকে মারার সুযোগ পেয়েও সে মারেনি, বাঁচিয়ে রাখতে চায়। কোথাও যেতেও দিচ্ছে না। এখানেই আটকে রাখতে চায় সে। কিন্তু কেন?

তা হলে কি সে আবরারকে হোস্ট বানাতে চায়? হতে পারে। কিন্তু আগে কেন হোস্ট বানায়নি, এখন চাইছে কেন?

বাইরের পরিবেশ একেবারে শান্ত। আবরার রান্নাঘরে ঢুকে স্টোভে পানি বসালেন। কফি বানাবেন। তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে—তাকে হোস্ট বানাবার

জন্য শক্রর কি বিশেষ কোনও প্রস্তুতি দরকার?

হঠাৎ প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলেন তিনি। ব্যাপারটা নিয়ে যত মাথা খেলালেন ততই পরিষ্কার হয়ে এল বিষয়টা, রনিকে হোস্ট বানানো হয়েছে ঘুমের মধ্যে। একই কাণ্ড ঘটেছে হেলমুট কোহ্লের ক্ষেত্রেও। জিম ব্রামারও নিশ্চয়ই ঘুমের মধ্যে অজানা শক্রর শিকার হয়েছে। আর জানোয়ার হোস্টগুলো বিশেষ করে কুকুর এবং বেড়ালরা–এরা তো দিনে-রাতে যখন-তখন ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু শক্র যদি তাকে হোস্ট বানাতে চায় তা হলে কাল রাতে ভর করল না কেন? হতে পারে, কাল রাতে আবরারের ভাল ঘুম হয়নি, একটু ঘুমিয়েছেন; আবার জেগে উঠেছেন। আবার এমনও হতে পারে জেমস ব্রামারকে হোস্ট বানাবার কাজে তাঁর শক্র ব্যস্ত ছিল বলে এদিকে নজর দিতে পারেনি। তবে এ থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে আসে। আর তা হলো–শক্র দু'জন নয়, একজন এবং সে একবারে একজনকেই হোস্ট করার ক্ষমতা রাখে। তবে ব্যাপারটা সম্পর্কে যদি নিশ্চিত হওয়া যেত–

ডক্টর হঠাৎ শটগান নিয়ে দরজা খুললেন, সতর্ক ভঙ্গিতে কয়েক পা বাড়ালেন সামনে, তাকালেন ওপরের দিকে।

পাখি, বড় বড় পাখি, ছ'সাতটা হবে, আকাশে পাক খাচ্ছে। তা হলে কি ডক্টরের ধারণা ভুল?

পরক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে। ওগুলো অদৃশ্য শক্রর হোস্ট নয়, কতগুলো শকুন, মৃত হরিণের লোভে এসেছে। একেবারে সাধারণ পাখি। শকুন দেখে এত আনন্দ কখনও হয়নি আবরারের, এখন যেমন আনন্দ হচ্ছে।

হঠাৎ জঙ্গলের ভেতর থেকে আরেকটা পাখি উড়ে আসতে দেখলেন তিনি, মনে হলো বুনো হাঁস। পাখিটা অনেক উঁচুতে উঠে গেল, তারপর ডাইভ দিল ডক্টরকে লক্ষ্য করে। তিনি গুলি করতে পারতেন, কিন্তু বেশি ঝুঁকি হয়ে যায় উপলব্ধি করে চট করে পিছিয়ে এলেন, বন্ধ করে দিলেন দরজা। এক সেকেন্ড পর বিকট শব্দে পাখিটা আছড়ে পড়ল বারান্দায়। চেহারা অন্ধকার হয়ে গেল আবরারের। বাইরে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয় বুঝতে পেরেছেন। তবে তাঁর শক্রর একটি সীমাবদ্ধতার কথাও জেনে ফেলেছেন। শক্র শুধু ঘুমন্ত প্রাণীদেরকেই কব্জা করতে পারে, জেগে থাকা কাউকে নয়। আর ওটাকে ঘুমন্ত প্রাণী খুঁজে বের করতে হয়। এতেও নিশ্চয়ই সময় নষ্ট হয়।

ভয়ঙ্কর এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার সম্ভাবনা যে একেবারে নেই, তা নয়। আশার কথা, শিলা জানে তিনি তার সাথে দেখা করবেন। যথাসময়ে তাঁর দেখা না পেলে সে নিশ্চয়ই চিন্তিত হয়ে ফোন করবে

শেরিফকে। শেরিফ হয়তো খবর পেয়ে আসবেন। তাঁকে যদি অদৃশ্য শক্রটা মেরেও ফেলে, তাঁর লোকবল আছে অনেক। সশস্ত্র লোকগুলোর বিরুদ্ধে ক'টা প্রতিরোধ পাঠাবে শক্র? শেষ পর্যন্ত ওদেরই জয় হবে।

হ্যাঁ, সাহায্য আসবে। তবে ডক্টর আবরারের কাজ এখন একটাই–কিছুতেই ঘুমিয়ে পড়া চলবে না।

উনিশ

এ যেন অনন্ত সময়, সীমাহীন, স্থির, কাটতে চায় না কিছুতেই। তবু প্রাকৃতিক নিয়মে দিন গড়িয়ে রাত এল, এল ঘুমাবার সময়। ডক্টর আবরার সারা বাড়ি ঘুরছেন, ওপরে যাচ্ছেন, নীচে যাচ্ছেন, আলো জ্বালছেন, নিভাচ্ছেন, অস্থির লাগছে তাঁকে।

হঠাৎ সবগুলো আলো নিভে গেল একসাথে। জেনারেটর? হ্যাঁ, জেনারেটরের কারণেই বাতি নিভে গেছে। কিন্তু গ্যাসোলিন মটরে যে পরিমাণ ফুয়েল আছে তা দিয়ে আরও কয়েকদিন হেসে খেলে চলার কথা। হয় জেনারেটর নতুবা মোটর, দুটোর যে কোনও একটা নষ্ট হয়ে গেছে।

শক্র আবার আরেক হোস্টকে ব্যবহার করেছে। সম্ভবত ইঁদুর-সেলারে ইঁদুরের অভাব নেই। ইঞ্জিন বা মোটরের তার কেটে ফেলেছে ইঁদুরকে দিয়ে। জেনারেটর চালিয়ে লাভ হবে না। শক্র আবার ওটা নষ্ট করে দেবে।

অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার।

নিকষ আঁধারে ঘুম পেতে লাগল আবরারের। আর ঘুমালেই সব শেষ।

একটু পরে আকাশে চাঁদ উঠল। মোট আয়তনের তিন ভাগের এক ভাগ। তবে আলোটা ঝকঝকে, আকাশ ঝলমল করছে অগুনতি তারায়। বাইরেটা দিনের আলোর মত ফকফকা, সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় ঘরের আঁধারও অনেকখানি দূর হয়ে গেছে। লিভিং রুমটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চোখের সামনে। হাঁটার সময় অন্তত হোঁচট খেতে হবে না আবরারকে। তাঁর একটা ফ্ল্যাশলাইট আছে, কিন্তু অতিরিক্ত ব্যাটারি থাকলেও সারারাত জ্বালিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। অল্প অল্প জ্বালাতে হবে।

কতক্ষণ জেগে থাকতে পারবেন তিনি? কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি, ক্লান্তও লাগছে, তারপরও আরও চব্বিশ ঘণ্টা না ঘুমিয়ে থাকতে পারবেন আবরার।

খিদে পেয়েছে। কিন্তু ডক্টর ঠিক করেছেন কিছু খাবেন না। খাবার পেটে গেলে ঘুম পেয়ে বসবে তাঁকে। ক্ষুধার্ত মানুষ খিদে নিয়ে জেগে থাকতে

পারে, কারণ খিদের চোটে ঘুম পালাতে বাধ্য।

পায়চারি শুরু করলেন আবরার। পাল্টা হামলা করার কথা ভাবছেন। কিন্তু কীভাবে?

যে শত্রুর চেহারাই তিনি এখন পর্যন্ত দেখেননি তাকে আঘাত করবেন কীভাবে? ওটা কি অদৃশ্য নাকি ওকে দেখা যায়? শরীর আছে? তাঁর মনে হচ্ছে এ বাড়ির কোথাও লুকিয়ে আছে শত্রু। কাল সকাল বেলা শত্রু নিধন অভিযানে নেমে পড়বেন তিনি, জীবিত কিছু চোখে পড়া মাত্র গুলি করবেন।

লম্বা, দীর্ঘতম রাতটার এক সময় অবসান ঘটল। ফুটল ভোরের আলো। আবরার নেমে পড়লেন শত্রুর খোঁজে। প্রতিটি ঘর, বেযমেন্ট কিছুই বাদ দিলেন না। তিনি জানেন না আসলে কী খুঁজছেন, ওটা ছোট না বড় কিছুই জানা নেই তাঁর। বেযমেন্টে গিয়ে দেখলেন জেনারেটরের তার কাটা। শত্রু ইঁদুর টিদুর দিয়ে কাজটা করিয়েছে। ঠিক করে লাভ হবে কোনও? তিনি ওপরে যাওয়া মাত্র কাউকে দিয়ে আবার তার কেটে দেয়া হবে।

হঠাৎ ছাদের দিকে তাকাতে বুক ধক্ করে উঠল। একটা মথ উড়ছে ওখানে। শত্রু মথের ছদ্মবেশে তার ওপর নজরদারী করছে না তো?

স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন আবরার, স্টোর রুমে ঢুকে বন্ধ করে দিলেন দরজা। দ্রুত নেমে পড়লেন কাজে। কোট হ্যাঙার বাঁকিয়ে, স্লিপিংব্যাগ ছিঁড়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রজাপতি ধরার জাল বানিয়ে ফেললেন। খুবই বাজে এবং হাস্যকর দেখতে হলো জিনিসটা। তবে কাজ চলে যাবে।

মথটা এখনও ছাদের নীচে উড়ে বেড়াচ্ছে। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করার পর ফাঁদে আটকানো গেল ওটাকে। তারপর সাবধানে পতঙ্গটাকে একটা খালি দেশলাই বক্সের মধ্যে ঢোকালেন আবরার। মথটা খুব সহজে মরবে না, এর মধ্যে এখান থেকে তিনি পালাতে পারবেন। অবশ্য মথটা যদি সত্যি–

শটগান নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন ডক্টর। চারপাশে নজর বুলালেন। ভীতিকর কিছু চোখে পড়ল না। আকাশেও কোনও পাখি উড়তে দেখা যাচ্ছে না।

গভীর দম নিলেন আবরার, হাঁটা শুরু করলেন। মাত্র দশ কদম এগিয়েছেন, হঠাৎ মাথার ওপর পতপত শব্দ হতে মুখ তুলে চাইলেন। বুক হিম হয়ে গেল বিশাল আকারের একটা চিকেন হককে তাঁকে ঘিরে বৃত্তাকারে উড়তে দেখে। ওটা আবরারকে লক্ষ্য করে ডাইভ দিল, হত্যার উদ্দেশে নয়, ভয় দেখিয়ে ঘরে ফেরাতে।

ভয়ঙ্কর মিসাইলের মত ছুটে আসছে চিকেন হক, আবরারের কাছ থেকে যখন আট/দশ হাত দূরে, ডক্টরের হাতের শটগান গর্জে উঠল বিকট শব্দে। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল পাখিটা শক্তিশালী বুলেটের আঘাতে। রক্ত আর পালক

লাগল আবরারের মুখে। তাঁর কাছ থেকে দু'হাত দূরে এসে ছিটকে পড়ল ওটা।

দৌড়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন ডক্টর। মুখ ধুলেন, পোশাক ঠিকঠাক করে কিচেনে ঢুকলেন। দেশলাইয়ের বাক্স খুলে মথটাকে বের করলেন আবরার, ছেড়ে দিলেন। ভুল ভেবেছেন তিনি। ওটা স্রেফ সাধারণ একটা মথ, তার শত্রুর হোস্ট নয়। তাঁর পরিকল্পনাটা ভালই ছিল, কিন্তু শত্রু তাঁকে কোনও সুযোগ দিতে রাজি নয়।

বিশ

কিছুই ঘটল না।

মিনিটগুলো যেন ঘণ্টা। গত চব্বিশ ঘণ্টায় ড. আবরার অল্পক্ষণ মাত্র ঘুমাতে পেরেছেন। বেশিরভাগ সময় পায়চারি করে কাটিয়ে দিচ্ছেন এই জানালা থেকে ওই জানালায়, শূন্য দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন বাইরে। পা দুটো ব্যথায় বিষ হয়ে গেছে, আরাম করে বসার সাহস পর্যন্ত পাচ্ছেন না। যদি ঘুমিয়ে পড়েন! প্রায়ই কফি পান করছেন, তবে এখন ঠাণ্ডা খাচ্ছেন, ঠাণ্ডা কফিতে ঘুম কম আসে।

সকাল হয়েছে। তবে বড় ধীর গতিতে বয়ে যাচ্ছে সময়। আবরার আশায় আছেন শেরিফ অথবা স্টেট পুলিশ এসে পড়বে, না হলে শিলা তো আসবেই। সে হয়তো বুঝতে পারবে আবরার বিপদে পড়েছেন। না হলে মিস শিলার সাথে তিনি দেখা করতেন।

আর বেশিক্ষণ হয়তো জেগে থাকা সম্ভব হবে না। আগে সোফার হাতলে একটু বসতেন, এখন তাও সাহস হচ্ছে না। বার বার বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে চোখ, জোর করে মেলে রাখতে হচ্ছে। পাইপ টানতে টানতে তেতো হয়ে গেছে মুখ। এ মুহূর্তে ঘুম তাড়ানোর মহৌষধ বেনজেড্রিন ট্যাবলেট বড় দরকার ছিল। কিন্তু সাথে আনেননি তিনি। ছুটি কাটাতে এসে কি কেউ ঘুম তাড়াবার ওষুধ খায়? সকাল গড়িয়ে দুপুর আসছে, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ডক্টর, তবে কাঁচের গায়ে মাথা ঠেকাতেও সাহস পাচ্ছে না। হঠাৎ গাড়ির শব্দ শুনতে পেলেন।

চট করে শটগানটা নিয়ে সদর দরজা খুললেন আবরার। তবে দাঁড়িয়ে রইলেন ভেতরে, শেরিফ বা যে-ই হোক, বাইরে থেকে হামলা এলে তাকে কাভার দিতে প্রস্তুত।

উঠোনে চলে এল গাড়ি। ছোট গাড়ি, ভক্সওয়াগন, ভেতরের যাত্রী মাত্র

একজন–শিলা রহমান।

দ্রুত হাত নাড়তে শুরু করলেন আবরার, চলে যেতে বলছেন শিলাকে। কিন্তু শিলা ডক্টরকে দেখতে পেল না, সে তাকিয়ে আছে স্টেশন ওয়াগন আর মরা হরিণের দিকে। গাড়ি দেখে শকুনের দল অলস ভঙ্গিতে উঠে গেল লাশ ফেলে। ইঞ্জিন বন্ধ করার আগে শিলা মুখ তুলে চাইল দরজার দিকে, দেখতে পেল ডক্টরকে।

'শিলা!' গলা ছেড়ে চেঁচালেন তিনি। 'শিগগির শহরে চলে যান। পুলিশকে খবর দিন, আর–'

চেঁচিয়ে লাভ হলো না। খুরের শব্দ শুনতে পেয়েছেন আবরার–একটা ষাঁড় প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসছে, মাত্র একশ হাত দূরে। আবরার কাছ থেকে ভক্সওয়াগনের দূরত্ব ১২ ফুট, হঠাৎ জিতে যাবার একটা সম্ভাবনা দেখতে পেলেন তিনি। যদিও কাজটা বিপজ্জনক। ষাঁড়টাকে গুলি করে ঠ্যাং খোঁড়া করে দিলে ওটা মরবে না, আর শত্রু অন্য হোস্ট নেয়ার সুযোগও পাবে না।

শিলাকে গাড়িতে থাকতে বলে এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি, তাক করলেন শটগান; দূরত্বটা মাপছেন, সামনের পা জোড়ায় যদি গুলি করা যায়–

আবরারের লক্ষ্য মন্দ নয়, তবে উত্তেজনার চোটে একটু তাড়াতাড়ি গুলি করে ফেললেন। ষাঁড়ের গায়ে গুলি লাগল, তবে থামল না ওটা। প্রচণ্ড রাগে উন্মাদ হয়ে উঠল আহত জানোয়ার, দিক বদল করে এবার সোজা ছুটে আসতে লাগল আবরারকে লক্ষ্য করে। মাত্র দশ হাত দূরে থাকতে দ্বিতীয় ব্যারেল বিস্ফোরিত হলো, একেবারে মোক্ষম জায়গায় লেগেছে গুলি, হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিয়েছে ষাঁড়ের, দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল ওটা। আর নড়ল না।

ভক্সওয়াগনের দরজা মেলে ধরলেন ড. আবরার, 'তাড়াতাড়ি বাড়িতে ঢুকুন, শিলা। ওটা আবার যে কোনও সময় হামলা চালিয়ে বসতে পারে। সময় নষ্ট করবেন না।'

শিলাকে নিয়ে দ্রুত দরজার দিকে এগোলেন। শটগানে গুলি নেই, আর অতিরিক্ত কার্তুজগুলো রয়ে গেছে ভেতরে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মুখ তুলে চাইলেন তিনি। বড় একটা পাখি, শকুন নয়, উড়ে আসছে। তবে ওটা হামলা চালাতে চাইলেও দেরি হয়ে গেছে। চট করে ভেতরে ঢুকে পড়লেন তিনি, বন্ধ করে দিলেন দরজা।

দ্রুত শটগানে গুলি ভরতে ভরতে গতকাল আর আজকের ঘটনা সংক্ষেপে খুলে বললেন ডক্টর শিলাকে। 'ইস, ডক্টর,' বলল শিলা। 'শেরিফকে যে কেন নিয়ে এলাম না আমার সঙ্গে! কাল বিকেলে ওঁর সাথে আমার কথা হয়েছে। আপনার কথা উনি বিশ্বাস করেননি। তবে বলেছেন আসবেন। আজ

সকালে আবার কথা বলেছি। বললেন কাল সকালের আগে আসতে পারবেন না। শেরিফের কথা শুনে মনে হলো উনি ভেবেছেন পুরোটাই আমাদের কল্পনা। তাই গা ছাড়া ভাব দেখেছি তাঁর মধ্যে।'

'কাল সকালে...' চেহারা গম্ভীর হয়ে গেল আবরারের। এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন। 'উঁহুঁ, অতক্ষণ জেগে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আর আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি...নাহ্, শিলা আপনার আসলে উচিত হয়নি এখানে আসা। এখন আপনিও খামোকা বিপদে জড়িয়ে পড়লেন।'

'আমার গাড়িতে চড়ে শহরে যাবার কোন চান্স নেই? ধরুন, আমি গাড়ি চালালাম আর আপনি বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত থাকলেন।'

'সে চান্স একশ'ভাগের এক ভাগ, শিলা, জঙ্গলে শুধু ষাঁড় নয় প্রচুর গরুও আছে। আর শিংঅলা প্রকাণ্ড হরিণগুলোর কথা না হয় বাদই দিলাম। আর বিরাট আকারের কোনও পাখি শূন্য থেকে আপনার হালকা গাড়ির ওপর আছড়ে পড়লে ওটার দফারফা হয়ে যাবে। আচ্ছা, ফিরতে দেরি দেখলে আপনার প্রতিবেশীরা খোঁজ-খবর নেবে না?'

'মনে হয় না। কারণ প্রায়ই গ্রীনবেতে আমি সিনেমা বা নাটক দেখতে যাই, তখন এক কাজিনের বাসায় থাকি। কাজেই আজ রাতে বাসায় না ফিরলে আমার প্রতিবেশীরা ভাববে আমি গ্রীনবেতে গেছি। ইস, আমি না এসে যদি পুলিশে খবর দিতাম! বুদ্ধিটা মাথাতেই আসেনি।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাত তুলে ওকে থামালেন আবরার। 'নিজের ওপর দোষ চাপাতে হবে না। ভুলটা আমারই। দুটো ভুলের খেসারত দিতে হচ্ছে এখন। ধূসর বেড়ালটা মারা যাবার পর আমার এখানে রাত কাটানোই উচিত হয়নি। আর গতকাল সকালে জিম ব্রামারের মৃত্যুর ঘটনা শোনার পর জিনিসপত্র নিতে বাড়ি ফেরা মস্ত বোকামি হয়ে গেছে। আর ধরাটা তখনই খেলাম।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি।

'চলুন, কফি খাওয়া যাক,' বললেন আবরার। 'এতক্ষণ শুধু ঠাণ্ডা কফি গিলেছি এখন এক কাপ গরম কফি খাওয়ার ঝুঁকি নেয়া যায়। আপনি কথা বলুন। দু'জনে মিলে একটা কিছু বুদ্ধি নিশ্চয়ই বের করা যাবে।'

কফির জন্যে পানি চড়িয়েছে শিলা, আবরার দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। বেশিরভাগ কথা তিনিই বললেন, ঘুম তাড়াতে হলে কথা বলতেই হবে। অনবরত কথা বলে গেলেন তিনি। এক পর্যায়ে শিলা রহমানকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন তো?'

'এই যে আমার সাথে এ ভাবে কথা বলে আমাকে জাগিয়ে রাখবেন। আমি ঘুম তাড়াবার জন্যে হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছি। কিন্তু আপনার খিদে লাগলে খেয়ে নিতে কসুর করবেন না। ফ্রিজ গত সন্ধ্যা থেকে চলছে না। তবে টিন বোঝাই খাবার আছে প্রচুর।'

কফি বানানো শেষ, দুটো কাপে কফি ঢেলে টেবিলে রাখল শিলা। 'ধন্যবাদ। তবে আমার খিদে পায়নি। ভাবছি আরও দু'তিন পট কফি বানিয়ে রাখব কি না।'

'ইচ্ছে হলে রাখুন। কিন্তু কেন?'

'কারণ আপনার মানে আমাদের শত্রু ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে দিয়েছে, যে কোনও সময় গ্যাস সাপ্লাইও বন্ধ করে দিতে পারে। আর কফি না খেয়ে আপনি জেগে থাকতে পারবেন না। সে ঠাণ্ডা-গরম, যাই হোক।'

'মনে হয় এ কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ বুটেন ট্যাঙ্কের বালব্ খুলতে রেঞ্চ লাগবে। আর মানুষ ছাড়া কারও পক্ষে ওটা মোচড় দিয়ে খোলা সম্ভব নয়। সে এখানে মানুষ হোস্ট পাবে কোথায়? তবু সাবধানের মার নেই। আচ্ছা, কফি বানান।'

স্টোভে পানি ঢেলে শিলা ডক্টরের মুখোমুখি বসল।

'পানি সাপ্লাইয়ের কী অবস্থা? ওটা বন্ধ করে দেয়ার কোনও সম্ভাবনা আছে? তা হলে কয়েক কলসি পানি ভরে রেখে দিই।'

'তার দরকার আছে বলে মনে হয় না,' বললেন আবরার, 'আমাদের শত্রু পানি তোলার পাম্প নষ্ট করে ফেললেও ক্ষতি নেই। কারণ ভারী ট্যাঙ্কির সে কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। আর ওটা ভরা আছে। দুশো গ্যালনের কম হবে না। আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট।'

কফি খেয়ে বাথরুমে ঢুকলেন আবরার ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করতে। এতে ঝিমুনির ভাব অনেকটাই কেটে গেল। এই ফাঁকে শিলা নীচ তলার জানালা দিয়ে বাইরের অবস্থা দেখে এল। হরিণটাকে ঘিরে আছে শকুনের দল। ষাঁড়ের কাছে যায়নি, সম্ভবত হরিণের মাংস তাদের কাছে বেশি সুস্বাদু মনে হয়েছে।

গোসল সেরে দু'জনে আবার নানা বিষয় নিয়ে আলাপচারিতা শুরু করে দিলেন। ডক্টর বললেন, 'খুব শীঘ্রি কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। এটা আসলে ধৈর্য পরীক্ষার খেলা। আমরা কেউ বেরুবার চেষ্টা করলেই সে হামলা চালাবে। তবে ঘরের ভেতর থেকে কোনও হামলা আসবে বলে মনে হয় না। তা হলে অনেক আগেই ঘটতে পারত। প্রকাণ্ডদেহী যে কোনও জানোয়ার দরজা বা জানালা ভেঙে ঢুকতে পারত।'

'অবাক লাগছে ভেবে,' বলল শিলা, 'আপনার বিরুদ্ধে কোনও মানুষ হোস্ট পাঠায়নি কেন সে?'

'কারণ আমাকে খুন করা তার উদ্দেশ্য নয়। তবে পাঠালেই ভাল হত। ধাবমান ষাঁড়কে হত্যা ছাড়া ঠ্যাং খোঁড়া করা বিপজ্জনক কাজ, মানুষকে নয়।'

'ডক্টর, আমি যখন এলাম—আপনি কী করে বুঝলেন আমি আপনার শত্রু নই? আপনি সহজেই আমাকে গুলি করতে পারতেন।'

হেসে উঠলেন আবরার। 'ওই চিন্তা মাথাতেই আসেনি আমার। যদি তাই হত, তা হলে ধরে নিতাম, শত্রু একবারে একাধিক মানুষ বা প্রাণীকে হোস্ট করার ক্ষমতা রাখে।' উঠে দাঁড়ালেন তিনি, দু'দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাই তাড়াতে তাড়াতে বললেন, 'গোসল করে ভালই হয়েছে। আমি একটু ওপরে গেলাম। এই ফাঁকে আপনি খেয়ে নিন।'

ওরা পালাক্রমে ওপর আর নীচের জানালা দিয়ে বাইরের পরিস্থিতি পরীক্ষা করে দেখছে। তবে ডক্টর শিলাকে বিশ্রাম নিতে বলে একাই রাউন্ড দেয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। কারণ এটা ঘুম তাড়ানোর ওষুধ হিসেবে কাজ করবে।

সময় বয়ে চলল ধীর গতিতে। দু'জনে কত পরিকল্পনা করল এখান থেকে কেটে পড়ার। কিন্তু কোনওটাই কারও মনঃপূত হলো না। অবাস্তব এবং বিপজ্জনক ঠেকল সবগুলো প্ল্যান। ইতিমধ্যে ডক্টর আরেকবার ঠাণ্ডা পানিতে গোসল সেরেছেন। তবে এবার গোসল করেও খুব একটা লাভ হলো না। বাথটাবের মধ্যে শুয়ে তিনি তো প্রায় ঘুমিয়েই পড়ছিলেন। তখন একটা বুদ্ধি বের করলেন ডক্টর। শিলাকে পানি ভরা গ্লাস দিয়ে বললেন, শিলা যখনই দেখবে ঘুমে ডক্টরের চক্ষু মুদে আসছে, সাথে সাথে সে পানির ছিটা দেবে।

পরবর্তী এক ঘণ্টায় দু'দু'বার পানির ছিটা দিতে হলো আবরারের মুখে। দু'বারই কথা বলার সময় মাঝপথে ঘুমিয়ে পড়ছিলেন তিনি। সন্ধ্যা ছ'টার দিকে দ্বিতীয়বার একই ঘটনা ঘটল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রাত হয়ে যাবে। সন্দেহ হলো অতক্ষণ জেগে থাকতে পারবেন কিনা।

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে উঠে দাঁড়ালেন আবরার, বললেন, 'শিলা, এতে কাজ হবে না। আমাকে পেরেক মারা চেয়ারের ওপর বসিয়ে দিলেও আমি ঘুমিয়ে পড়ব। বিপদ যেহেতু দুজনেরই কাজেই আপনাকে বলে দিচ্ছি কী করতে হবে।

'এক–এখনও যেটুকু শক্তি আছে শরীরে, পায়ে হেঁটে শহরে পৌঁছুতে পারব আমি–নিদেন কাছের কোনও ফার্ম হাউজে যেখানে টেলিফোন আছে। আমি শটগান নিয়ে যাব, পিস্তলটা আপনার কাছে থাকবে। হয়তো কাজটা করতে পারব আমি। হয়তো বিপদটাকে আমরা বেশি বড় করে দেখছি, শত্রুর সীমানা নির্ধারণের ক্ষমতাও হয়তো বড় করে দেখছি। যাই হোক, শহরে পৌঁছুতে পারলে আমি আপনাকে রক্ষার ব্যবস্থা করব। স্টেট পুলিশ আসবে শটগান আর টমিগানে সুসজ্জিত হয়ে। আর যদি যেতে না পারি–'

'না,' দৃঢ় গলায় বলল শিলা। 'আপনি গেলে আমিও যাব আপনার সাথে। তবে গাড়িতে। আর আমি গাড়ি ড্রাইভ করব। আর পায়ে হেঁটে যে যেতে চান তাতে কী লাভ হবে?'

'আমি জেগে থাকতে পারব। তা ছাড়া আকাশের দিকে নজর রেখে চলাও সম্ভব হবে। আগেই বলেছি ওপর থেকে কোনও শক্তিশালী পাখি ডাইভ দিয়ে পড়লে আপনার হালকা গাড়ি তা সামাল দিতে পারবে না। আমাদের যে কেউ ওই হামলায় মারা যেতে পারি।'

আর দ্বিতীয় বিকল্প হলো—আমি যদি এ ঘরে বসে ঘুমিয়ে পড়ি আপনি আমাকে বেঁধে রাখবেন। আমি বাঁধা অবস্থায় থাকলে শত্রু আমার ওপর ভর করলেও কোনও ফায়দা করতে পারবে না। যেমন আমাকে দিয়ে আপনার ওপর হামলা করাতে পারবে না। আর আমাকে খুন করতে না পারলে তখন আরেক হোস্টের ওপর নির্ভর করতে সে বাধ্য হবে। এতে সুবিধে হবে আপনি গাড়ি নিয়ে শহরে গিয়ে সাহায্য নিয়ে আসতে পারবেন।

'কিন্তু—কী ধরনের সাহায্য, আপনি যদি—'

'কী ঘটবে না দেখা পর্যন্ত বলা মুশকিল। তবে আপনি শহরে পৌঁছুতে পারলে আর চিন্তা নেই। আপনি আপনার স্টেটমেন্ট নিয়ে হাইয়েস্ট অথরিটির সাথে দেখা করবেন। এফ.বি.আইতে ফোন করবেন। রজার প্রাইস বা বিল কেলারম্যান, যাকেই পান গল্পটা খুলে বলবেন। ওরা দু'জনেই আমার বন্ধু। আপনার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে ওরা। নাম দুটো মনে থাকবে নাকি লিখে দেব?'

'রজার প্রাইস বা বিল কেলারম্যান। মনে থাকবে। কিন্তু আমি শহরে যেতে পারব তো? আমি কী করে জানব আপনি ঘুম থেকে উঠে রশি মুক্ত হতে চাইবেন না?'

'ওই কাজ করলে আপনি অবশ্যই জানতে পারবেন। আর যদি না করি তা হলে আপনি শটগান নিয়ে বারান্দায় নেমে পড়বেন। খেয়াল রাখবেন কেউ আপনাকে হামলা করতে আসে কি না। যদি না আসে তা হলে শহরে যাবার সুযোগ নেবেন। আচ্ছা, দাঁড়ান—আরেকটা কাজও করতে পারেন। আপনাকে শহরে যাবার ঝুঁকিই নিতে হবে না। কাল সকালে তো শেরিফ আসবেনই। আমাকে ততক্ষণ স্রেফ বেঁধে রাখুন। আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। পরিষ্কারভাবে কিছুই চিন্তা করতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, আপনাকে বেঁধে রাখাটাই ভাল।'

'তা হলে রশি নিয়ে আসুন।'

রান্নাঘরে ঢুকল শিলা রশি আনতে। ড. আবরার লিভিংরুমে ফিরে এলেন। পকেট থেকে পিস্তল বের করে টেবিলে রাখলেন, শটগান থাকল সদর দরজার পাশে, দেয়ালে হেলানো।

'এসব জিনিস যেন আমার হাতের নাগালে না আসে,' শিলা কিচেন থেকে রশি নিয়ে ফেরার পর তিনি বললেন, 'ছুরিটাও। আগে পিছমোড়া করে আমার হাত বাঁধুন, তারপর পা। আর শুনুন, যদি আমি পাগলের মত আচরণ

করতে থাকি, কোনও সুযোগ আমাকে দেবেন না। পিস্তলের বাঁট দিয়ে মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে ফেলবেন। তবে মেরে ফেলবেন না। আমাকে মেরে ফেললে আমার শত্রু নতুন হোস্টের ওপর ভর করবে। এমনকী হোস্ট হিসেবে সে আপনাকেও বেছে নিতে পারে। যদি শেরিফ কাল সকালে পৌঁছার আগেই আপনি ঘুমিয়ে পড়েন।'

দ্রুত হাতে আবরারকে রশি দিয়ে বাঁধছে শিলা, জিজ্ঞেস করল, 'শহরে যাবার চেষ্টা করার চেয়ে এটা কি বেশি বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে না?'

'ঠিক বলতে পারছি না। তবে আপনি এতে বিপদমুক্ত থাকবেন। আর আমার জন্যও এটা আর বিপজ্জনক হয়ে উঠবে না।'

'ঠিক আছে। আপনি যা বলেন। বাঁধনটা বেশি টাইট হয়ে গেল?'

'না, ঠিক আছে। ইচ্ছে করলেও এ বাঁধন খুলতে পারব না। আমি শুয়ে পড়লাম। যতক্ষণ পারি জেগে থাকার চেষ্টা করব।'

কিন্তু পারলেন না আবরার। তিনি শুয়েছেন, শিলা তাঁর পায়ে রশি বেঁধেছে, প্রায় সাথে সাথে গভীর ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেলেন ডক্টর আবরার।

শিলা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল তাঁর পাশে। তারপর শটগানটা নিয়ে দরজা খুলল, তাকাল ওপর পানে। বিশাল এবং কালো আকারের কী যেন ভয়ঙ্কর গতিতে ছুটে এল তার দিকে, আঁতকে উঠল সে, একলাফে পিছিয়ে এল, বন্ধ করে দিল দরজা। ঠিক তখন ভারী কিছু একটা সজোরে ধাক্কা দিতে শুরু করল বন্ধ দরজায়।

দরজায় ধাক্কা মারছে একটা শকুন। মরা হরিণটাকে খেতে ব্যস্ত এক দল শকুনের ওটা একটা, ভিনগ্রহের হন্তারক এ মুহূর্তে এই পাখিটাকে তার স্বার্থ হাসিলের জন্যে ব্যবহার করছে।

শিলার আগমনে বিরক্ত হয়েছে সে। তার ইচ্ছে ছিল ষাঁড়টাকে দিয়ে মেয়েটার গাড়িটাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে। কিন্তু আবরার তাকে গুলি করল, সে বুঝতে পারল ডক্টর ষাঁড়টাকে প্রাণে মারতে চাইছে না, পঙ্গু করে ফেলতে চাইছে। তখন নিজের জান বাঁচাতে আবরারের দিকে ছুটে যায় সে, আবরার মারমুখী ষাঁড়ের হাত থেকে বাঁচতে আবার গুলি করতে বাধ্য হয়।

ষাঁড়ের অপমৃত্যুর পরপর হন্তারক বাড়ির পেছন দিকের সিঁড়ির নীচে তার কচ্ছপের খোলে এসে আশ্রয় নিয়েছে। মহিলা এবং পুরুষটার সমস্ত কথাই সে মনোযোগ দিয়ে শুনেছে। গাড়িতে বা পায়ে হেঁটে শহরে যাওয়া যে তাদের জন্যে বিপজ্জনক এবং সে কারণে সে চেষ্টাও তারা করেনি বোঝার পর স্বস্তিবোধ করেছে ভিনগ্রহের প্রাণী, স্কুল শিক্ষিকার গাড়িটা আর নষ্ট করার প্রয়োজনবোধ করেনি।

শেরিফ কাল সকালে আসতে পারে শুনেও সে উদ্বিগ্ন হয়নি। পরিস্থিতি সামাল দেয়ার মত ক্ষমতা সে যথেষ্টই রাখে। যে-ই আসুক, সে প্রথম সুযোগেই গাড়ি ধ্বংস করে ফেলবে, হত্যা করবে গাড়ির মালিককে। কোনও সাহায্য সে আসতে দেবে না এ বাড়িতে।

সত্যি বাইরে থেকে কোনও সাহায্য আসছে কিনা দেখার জন্যে উড়ন্ত হোস্ট ব্যবহার করল হন্তারক। একটা চিকেন হককে এ কাজে লাগাল সে। রাস্তার ওপর চক্কর দিতে শুরু করল পাখিটা, তীক্ষ্ণ নজর রাখল বাড়ির ওপর। এতে অবশ্য একটা অসুবিধে হলো। উড়ন্ত হোস্টের সাথে ব্যস্ত থাকায় সে তার পারসেপটিভ সেন্স বাড়ির ভেতরে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলো। ফলে ভেতরে কী ঘটছে অনেক সময় জানা হলো না তার। আবরার যখন বলছেন তাঁর পক্ষে আর জেগে থাকা সম্ভব হবে না, ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর ওই সময় আরেকটি ফ্লাইং হোস্ট ব্যবহার করল চারপাশে নজর বুলাতে। সে ধরে নিয়েছে এরপর আর কোনও উড়ন্ত হোস্টের তার প্রয়োজন হবে না, তাই শেষবারের মত রাস্তা-ঘাট চেক করে দেখছিল সে। ফলে আবরার আর শিলার মধ্যে সর্বশেষ কী কথা হলো জানতে পারল না সে, জানা হলো না আবরারকে বেঁধে রাখার ব্যাপারটিও।

কাজেই, ভিনগ্রহের খুনী অবাক হয়ে গিয়েছিল শিলাকে একা শটগান হাতে বেরিয়ে আসতে দেখে। মহিলাকে লক্ষ্য করে শকুনটাকে ঝাঁপ দিতে বাধ্য করে সে, তবে শিলা দ্রুত ঘরে চলে যাওয়ায় টার্গেট মিস হয়ে যায়। শকুনটাকে মেরে ফেলে ভিনগ্রহের হন্তারক আবার ফিরে এসেছে নিজের খোলসে।

সে খুবই অবাক হয়েছে তার চূড়ান্ত হোস্ট আবরারকে দড়ি বাঁধা অবস্থায় ঘুমাতে দেখে। ঘুমাচ্ছে ঠিক আছে। কিন্তু দড়ি বাঁধা অবস্থায় কেন? এখন আবরারের শরীরে ঢুকলেও লাভ হবে না কিছু। বাঁধন না খুলে আবরার কিছুই করতে পারবে না। তবে মেয়েটা নিশ্চয়ই সারা জীবন দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে পারবে না। এক সময় দড়ি খুলতেই হবে। সে সিদ্ধান্ত নিল আবরারের ভেতরে ঢুকবে। যেহেতু আবরার ঘুমাচ্ছে, সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারবে সে, আবরারের একান্ত গোপন ভাবনা এবং স্মৃতিগুলোর কথা জেনে নিতে পারবে ভিনগ্রহের হন্তারক। তারপর মাঝরাতের দিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবে আবরারকে। ডক্টরকে দিয়ে এমন স্বাভাবিক আচরণ সে করাবে যাতে মেয়েটার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না জাগে এবং তার বাঁধন খুলে দেয়। তারপর–তারপর কী করবে সেটা পরে দেখা যাবে। আপাতত ডক্টর আবরারকে কব্জা করা যাক।

ভিনগ্রহের হন্তারক ঢুকে পড়ল আবরারের শরীরে।

শরীরের ভেতরে ঢোকার পরপরই কেমন অস্বস্তি হতে লাগল তার। এ

পর্যন্ত যতগুলো প্রাণী বা মানুষের মনের ভেতর ঢুকেছে সে, প্রতিটি মন অন্তত এক মুহূর্তের জন্যে হলেও প্রতিরোধের চেষ্টা করেছে। তবে ওটাকে কোন বাধাই মনে করেনি ভিনগ্রহের হত্যাকারী।

কিন্তু এবারের প্রতিরোধটা যেন অন্যরকম। কয়েক সেকেন্ড ধরে আবরারের মন তার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলল। সে পুরোপুরি দখল করতে পারছে না আবরারকে। হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে উঠে বসলেন আবরার, হাঁপিয়ে উঠে বললেন, 'সিঁড়ির নীচে। জিনিসটা হলো–'

আর বলতে পারলেন না আবরার। কারণ হন্তারক তাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছে।

ডক্টর আবরার আবার শুয়ে পড়লেন, বার দুয়েক দম নিলেন গভীর করে, তারপর চোখ মেলে তাকালেন। শিলার সাথে চোখাচোখি হলো তাঁর, কাউচের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল সে। স্বাভাবিক গলায় আবরার বললেন, 'মনে হচ্ছিল দুঃস্বপ্ন দেখছি, শিলা। অতিরিক্ত ক্লান্তির কারণেই হয়তো। ঘুমের মধ্যে আমি কি কিছু বলেছি?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল শিলা। তারপর খুব আস্তে বলল, 'বলেছেন ডক্টর–সত্যি যদি আপনি ডক্টর আবরার হয়ে থাকেন। বলেছেন, 'সিঁড়ির নীচে–জিনিসটা হলো–' তারপর চুপ হয়ে গেছেন।

'গুড লর্ড, শিলা, সব মনে নেই আমার। শুধু মনে পড়ছে একটা ষাঁড় আমাকে গুঁতো দিতে আসছে আর–ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমি দৌড়াচ্ছিলাম। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করলাম সামনের দরজায় সিঁড়ির নীচে–স্বপ্নে আমার হাতে কোনও বন্দুক ছিল না। এখন আমার ঘুম পাচ্ছে। তবে আশা করি এবার আর দুঃস্বপ্ন দেখতে হবে না।' তিনি চোখ বুজলেন।

'ড. আবরার, আপনি বলেছিলেন আপনার শত্রু কাছে পিঠেই আছে এবং ঘরের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারে। সেটা সিঁড়ির নীচেও হতে পারে। সামনের দরজায় তিন থাক সিঁড়ি নেমে মিশেছে বারান্দার সাথে। আরও তিন থাক সিঁড়ি রয়েছে পেছনের দরজায়। আমি পরীক্ষা করে দেখব ওখানে কিছু আছে কিনা।'

'শিলা, ব্যাপারটা হাস্যকর হবে। স্রেফ একটা দুঃস্বপ্নের কথা শুনে–'

কিন্তু তাঁর কথা শিলার কানে গেল না, সে ততক্ষণে সদর দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েছে, হাতে শটগান আর পিস্তল। বাইরে আলো আছে। তবু ফ্লাশলাইট নিয়েছে শিলা, সিঁড়ির নীচেটা অন্ধকার হতে পারে।

চারপাশে সতর্ক নজর বোলাল শিলা রহমান। তার ওপর হামলা করার মত কিছু বা কাউকে চোখে পড়ল না। সামনের সিঁড়িতে ফ্লাশলাইটের আলো

ফেলল। কিছুই দেখতে পেল না। ঠিক করল আরও খোঁজ চালাবে। বাড়ির পেছন দিকটায় প্রয়োজনে মাটি খুঁড়ে দেখবে। পেছনে চলে এল শিলা।

প্রথম দেখায় মনে হলো এদিকের সিঁড়ির নীচে কিছু নেই। তারপর আলো নিয়ে একটু সামনে এগিয়ে সদ্য বোজানো একটা গর্ত চোখে পড়ে গেল শিলার। ওখানকার মাটি খুঁড়ে আবার গর্তটা বুজিয়ে দিয়েছে কেউ। হ্যাঁ, মানুষের হাতের ছাপও ফুটে আছে নরম মাটিতে।

জামা-কাপড় ময়লা হয়ে যাবে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল শিলা, হাত বাড়িয়ে দিল সিঁড়ির নীচে। মাটি এখানে আলগা, সহজেই তোলা গেল। হাতে কী যেন একটা ঠেকল। কচ্ছপের খোলের মত লাগল—কিন্তু কচ্ছপ গর্ত করে না, শক্ত মাটিতে তো নয়ই। টান মেরে ওটাকে তুলে আনল শিলা। কচ্ছপের মত দেখতে জিনিসটা, তবে এটার হাত-পা লেজ কিছুই নেই—এক পলক দেখেই বুঝতে পারল শিলা—এটা ভিনগ্রহবাসী।

গা ঘিনঘিন করে উঠল শিলার, ছুঁড়ে ফেলে দিল জিনিসটা। তারপর খোলার মাঝখানে পিস্তলের নল ঠেকাল এবং গুলি করল।

ঠিক সেই সময়, ঘরের ভেতর যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন ড. আবরার। এক দৌড়ে সামনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল শিলা, হাতে প্রস্তুত শটগান।

মেঝের ওপর পড়ে আছেন ডক্টর, তবে হাসছেন তিনি। প্রশান্ত, সুন্দর হাসি। শিলাকে দেখে বললেন, 'তুমি পেরেছ, শিলা। ভিনগ্রহের হন্তারককে হত্যা করতে পেরেছ। তবে আমার বাঁধন এখনই খুলে দিতে হবে না। কারণ পুরোপুরি বিপদমুক্ত হতে পেরেছি কিনা এখনও জানি না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডক্টর। 'বেচারা ভিনগ্রহবাসী। স্রেফ নিজের গ্রহে ফিরে যেতে চেয়েছিল সে—কিন্তু পারল না। আমি কয়েক মুহূর্তের জন্যে ওর নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছিলাম বলে রক্ষা—কয়েকটা শব্দও উচ্চারণ করার সুযোগ পেলাম। তোমাকে ধন্যবাদ কথাগুলো বুঝতে পারার জন্যে—স্মৃতি মনে পড়তে শিউরে উঠলেন তিনি—'আমিও ওর মনের মধ্যে ছিলাম। ও যা জানত সবই আমার জানা হয়ে গিয়েছিল। সে এক লম্বা গল্প। কীভাবে সে হোস্ট ব্যবহার করত, কী উদ্দেশে ইত্যাদি সব।'

'কোত্থেকে এসেছিল ওটা—সৌরজগতের কোনও গ্রহ থেকে?'

'না, বহু দূরের নক্ষত্রের এক গ্রহ থেকে। সেখানে পৌঁছুবার কথা হয়তো আমরা কল্পনাও করতে পারব না। সে গ্রহের কথা তুমি শুনতে চাও, শিলা?'

শিলা রহমানের চেহারা দেখেই বোঝা গেল সে কত আগ্রহ নিয়ে আবরারের গল্প শুনছে, হ্যাঁ, বলার দরকার হলো না।

মৃদু গলায় বলে যেতে লাগলেন আবরার। 'সে গ্রহের বিজ্ঞান আমাদের কাছে অচেনা। আমরা কল্পনাও করতে পারব না সেই বিজ্ঞান নিয়ে। তবে

আমি দূর গ্রহে যাবার স্বপ্ন দেখি, শিলা। স্যাটেলাইট নিয়ে অনেক বড় বড় কাজ করতে চাই। সে সব কাজে তোমার মত একজন মানুষ বড় প্রয়োজন, শিলা, তুমি আসবে আমার সাথে? তোমাকে নিয়ে আমি অজানা গ্রহ আবিষ্কার করব। হয়তো যাব মঙ্গল বা শুক্রগ্রহে, হয়তো মনুষ্য বসবাসের গ্রহও আমরা খুঁজে পাব এক সময়। বলো তুমি যাবে আমার সঙ্গে?'

অভিভূতের মত মাথা দোলাল শিলা। ডক্টর আবরারকে সে বিশ্বাস করে, এরকম একজন মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে তার ভালই লাগবে। সে শুধু অস্ফুটে বলল, 'যাব।'

হাসিতে উদ্ভাসিত হলো আবরারের চেহারা। ইতিমধ্যে তাঁর বাঁধন খুলে দেয়া হয়েছে। তিনি একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন শিলার দিকে, বললেন, 'তা হলে ওই কথাই রইল, শিলা।'

আবরারের হাতটা নিজের নরম হাতে নিয়ে ছোট্ট করে মাথা দোলাল শিলা রহমান। মিষ্টি হেসে বলল, 'জ্বী, ওই কথাই রইল।'

আর কিছু বললেন না মি. সি. আর. আবরার। হাত-পা টানটান করে শুয়ে পড়লেন। প্রায় সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঠোঁটের কোনায় মৃদু হাসি।

***

অপার্থিব প্রেয়সী

আফজাল হোসেন

প্রথম প্রকাশ: ২০১২

আমি ও জনৈক ইমাম

এক

শীতের সকাল।

মামা বাড়ির পুবের খোলা বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে চা খাচ্ছি আর রোদের আদর নিচ্ছি। একটু আগেও খুব কুয়াশা ছিল। এখন কুয়াশা কেটে ঝলমলে রোদ উঠেছে। দিনের শুরুর উষ্ণ রোদ্রের পরশ গায়ে মাখতে খুব আরাম লাগছে।

গতকাল রাতে আমি মামা বাড়ি এসেছি। নিজের ইচ্ছেতে আসা নয়, বাধ্য হয়ে আসা। আমার মামা গ্রামে চেয়ারম্যান ইলেকশন করছেন। ইলেকশনে মামার পক্ষে প্রচারণার জন্য আমাকে আনা। মামার ধারণা–আমি ভার্সিটিতে পড়ুয়া আধুনিক ছেলে, আমার কথা গ্রামের লোকজন মনোযোগ দিয়ে শুনবে। গ্রামের লোকেরা শহরের শিক্ষিত আধুনিক লোকদের কথা একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনে। শিক্ষিত আধুনিক লোকদের কথা তারা নাকি দৈববাণীর মত বিশ্বাস করে।

আমার মামা অত্যন্ত প্রতাপশালী লোক। আশপাশের অন্তত দশ গ্রামের লোক তাঁর নাম শুনলে ট্যারা হয়ে যায়। অবশ্য মামার নাম শুনলে লোকজন যে শুধু ভয়ে-শ্রদ্ধায় ট্যারা হয়ে যায় তা না-ও হতে পারে। আমিও মামার নাম শুনলে ট্যারা চোখে তাকাই, কারণ মামার প্রতাপ আর ক্ষমতার প্রভাব তাঁর নামের উপরও পড়েছে। মামার নাম–সৈয়দ হালিম চৌধুরী। নামের আগে পরে দুটো বড় বংশের নাম। সৈয়দ ও চৌধুরী। এই সৈয়দ ও চৌধুরী কোথা থেকে এসেছে কে জানে! আমার জানা মতে–আমার নানার বংশের নাম ছিল সর্দার। সর্দার টাইটেল পান আমার নানার দাদা। তিনি নাকি ডাকাত দলের সর্দার ছিলেন। প্রথম জীবনে স্রেফ সিঁদেল চোর। পরে প্রাচীন ঠগি সম্প্রদায়ের সাথে মিশে ডাকাতি শুরু করে এক পর্যায়ে ডাকাতের সর্দার হন। সেই থেকে বংশের নাম হয় সর্দার। মামা, বাপ-দাদাদের সেই সর্দার বংশ বাদ দিয়ে জাতে উঠবার জন্য নামের আগে-পিছে দুটো বড় বংশের সাইনবোর্ড টানিয়েছেন। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়ুয়া মামা বুঝতেও পারেন না নামের আগে-পিছে দুটো বংশের নাম রাখা কতটা হাস্যকর।

মামা তাঁর এক জীবনে অনেক ধন-সম্পদ করেছেন। এখন ক্ষমতা আর

সম্মানের মোহ তাঁকে তাড়া করছে। গ্রামের চেয়ারম্যান হয়ে তাঁর মনের কাঙ্ক্ষিত বাসনার প্রথম ধাপ তিনি পেরুতে চান। ধীরে-ধীরে আরও অনেক দূর। কপালে থাকলে কী না হয়! হয়তো একদিন তিনি মেয়র ইলেকশন বা এম.পি. ইলেকশন করার নমিনেশনও পেয়ে যাবেন।

মামার প্রধান সহযোগী দবির বেপারী। মোটা-সোটা তাল গাছের মত লম্বা দশাসই চেহারার লোক। মামার প্রধান পরামর্শদাতা, বুদ্ধিদাতা সবই দবির বেপারী। মামার সমস্ত কাজ-কারবার চলাফেরা দবির বেপারীকে সঙ্গে নিয়ে। তরুণ বয়স থেকেই মামা আর দবির বেপারী খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দবির বেপারী আর মামা বলতে গেলে একে অপরের ছায়া। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে–মামার এত ধন-সম্পদ হয়েছে, সেই দিক দিয়ে দবির বেপারীর কিছুই হয়নি। এমনকী লোকটা বিয়েও করেনি। অথচ মামার স্ত্রী সংখ্যা চারজন। মামার সবচেয়ে ছোট স্ত্রীর বয়স মাত্র উনিশ। আমার চেয়েও ছোট মামী ছয় বছরের ছোট।

দবির বেপারীর মত বিশালদেহীর পাশে মামা যখন দাঁড়ান তখন মামাকে দেখে মনে হয় দাড়িওয়ালা একটা বামন। মামা উচ্চতায় বোধ হয় পাঁচ ফুটও হবেন না। অথচ মামীরা প্রত্যেকেই কী লম্বা লম্বা!

মামা ছয় কন্যা এবং এক পুত্রের জনক। বড় দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে। তারা যে যার শ্বশুর বাড়িতে। পরের চার মেয়ে পড়াশুনা করছে। দুইজন একই সাথে এইচ.এস.সি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী আর বাকি দু'জনের একজন ক্লাস টেনে আর একজন ক্লাস নাইনে পড়ে। সবার ছোট ছেলে। ছেলের বয়স মাত্র চার মাস।

মামার উনিশ বছর বয়স্কা ছোট বউ অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার পর চার মাস আগে মামার সারা জীবনের আশা পূরণ করেন। মামা একটা পুত্র সন্তানের আশায়ই একের পর এক বিয়ে করেন। প্রথম ঘরে পর পর তিন মেয়ে। দ্বিতীয় ঘরে দুই মেয়ে। তৃতীয় ঘরে এক মেয়ে। শেষ পর্যন্ত চতুর্থ স্ত্রীর ঘরে ছেলের মুখ দেখলেন মামা।

মামার বাড়ির সংখ্যাও চারটি। প্রতিটি বাড়িই দেখার মত। বরিশাল সদরে ছাপান্ন শতাংশ জমির উপর একটি বাড়ি। ঢাকায় দুটো বাড়ি। দুটোর একটি মিরপুরে, দুই ইউনিটের ছয়তলা বিশাল বিল্ডিং। আর একটি বাড়ি আশুলিয়ায়। তুরাগ নদীর ওপারে রুস্তমপুরে। প্রায় আশি শতাংশ জায়গা জুড়ে বাড়িটা। সমস্ত বাড়ি জুড়ে কমলা, মালটা, আঙুর, আনার এ ধরনের দামি ফলের বাগান আর বাড়ির সামনের কিছু জায়গা জুড়ে জানা-অজানা বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ফুলের বাগান। চারদিকে বাগান, মাঝখানে বাংলো টাইপের একতলা বিল্ডিং। বলতে গেলে সারা বছরই বাড়িটা খালি পড়ে থাকে। কালু নামে এক কেয়ারটেকার বাড়িটার রক্ষণা-বেক্ষণ করে।

আশুলিয়ার সেই বাড়িতে মামা মাঝে-মধ্যে ঢাকাই সিনেমার নায়িকা বা মডেল সুন্দরীদের নিয়ে সময় কাটাতে যান।

গ্রামের এই বাড়িটার কথা আর কী বলব! এটা তো যেনতেন জমিদার বাড়িকেও হার মানাবে। অন্তত এক একর জায়গা জুড়ে বাড়িটা। বাড়ির পিছনে অনেক দিনের পুরানো বিভিন্ন বড় বড় গাছের বাগান। সামনে দিঘি আকৃতির বিশাল পুকুর। পুকুরের বাঁধানো চওড়া ঘাটলা। চারপাড়ে ফাঁকা-ফাঁকা করে লাগানো নারকেল গাছ। পূর্ণিমার রাতে পুকুরের মাঝে তাজমহলের মত হোয়াইট সিমেন্টে বানানো বাড়ির প্রতিবিম্ব দেখা যায়। সে এক অসাধারণ দৃশ্য।

মামার বাড়িতে এসে বলা যায় মোটামুটি রাজার হালে আছি। এ বাড়ির নিয়ম হচ্ছে প্রত্যেকটা লোকের জন্য আলাদা আলাদা একজন কেয়ারটেকার। আমার তদারকির জন্য নিয়োগ করা হয়েছে বোকা-সোকা সহজ-সরল চান্দু মিয়া নামের এক লোককে। চান্দু মিয়া বোধ হয় আমারই বয়সী। বোধ হয় বলছি এই জন্যে, কারণ গ্রামের লোকদের বয়স চট করে ধরা যায় না। রোগা-পাতলা মাঝারি উচ্চতার চান্দু মিয়ার গায়ের রং তামাটে। চেহারায় কেমন ছন্নছাড়া ভাব। মাথা ভর্তি অযত্ন আর অবহেলায় বেড়ে ওঠা এলোমেলো উস্কখুস্ক লালচে চুল।

চান্দু মিয়ার দায়িত্ব তৎক্ষণাৎ আমার হুকুম তামিল করা। এই যেমন–আমি এখন বাড়ির দোতলার পুবের খোলা বারান্দায় বসে বড় এক মগ ভর্তি চা খাচ্ছি আর রোদ পোহাচ্ছি, চান্দু মিয়াও আমার থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে আমার হুকুম শোনার জন্য আর শোনার পরে তামিল করার জন্য।

চান্দু মিয়ার পরনে ময়লা রঙের লুঙ্গি আর বিবর্ণ হাফ হাতা শার্ট। খালি পা। খুব সম্ভব কোনও এক সময় লুঙ্গির রং সাদা ছিল আর শার্টের রং লাল। এমন শীতের মাঝে চান্দু মিয়া স্রেফ একটা হাফহাতা শার্ট পরে কীভাবে ঠিক আছে সেটাই এক আশ্চর্য!

গ্রামের এই বাড়িতে এখন আমার দুই মামী আছেন। একেবারে বড় মামী আর উনিশ বছর বয়স্কা ছোট মামী। মামা যেখানেই যান ছোট মামীকে সঙ্গে নিয়ে যান। ছোট মামীকে ছেড়ে তিনি থাকতে পারেন না।

দুই

মামা আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছেন। তিন দিনের হাত খরচ। মামার

প্রচারণায় বেরিয়ে গ্রামের লোকজনদের নিয়ে চা-নাস্তা, পান-তামাক খেয়ে এই টাকা খরচ করতে হবে। তিন দিন পরে আবার হাত খরচ পাব। ভোটের এখনও দশ দিন বাকি। এই দশ দিন ধরে এভাবেই হাত খরচের টাকা পাব।

চান্দু মিয়াকে নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লাম। আমার প্রথম উদ্দেশ্য গ্রামের বাজারে গিয়ে বিভিন্ন চায়ের দোকানে বসে লোকজনকে চা-টা খাইয়ে খাতির জমানো।

মামার মিটিং, মিছিল, সমাবেশ এর কোনও কিছুর মধ্যেই তিনি আমাকে জড়াবেন না। আমার কর্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। মামার অভিমত–যারা মামার মিটিং, মিছিল, সমাবেশে যোগদান করে, তারা এমনিতেই মামার ভোটার। এর বাইরে যারা তাদের সাথে মত বিনিময় করে, তাদেরকে দলে ভিড়ানো আমার দায়িত্ব। অর্থাৎ লোকজন ধরে ধরে আমাকে টোপ ফেলতে হবে।

চান্দু মিয়াকে নিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে গ্রামের একমাত্র জামে মসজিদের সামনে এসে পৌঁছালাম। রোদের প্রখরতা বেড়েছে। আমার গায়ে ফুলহাতা সোয়েটার। গা চিড়বিড় করছে। সোয়েটার খুলে ফেলতে হবে।

মসজিদ দেখে একটা পরিকল্পনা এসে মাথায় ভর করল। মসজিদ থেকে মামার প্রচারণা করলে কেমন হয়! মসজিদের ইমাম, মুসল্লিদের নিয়ে মিলাদ পড়ে মামার জন্য দোয়া করব। বোধ হয় খুব কাজে দেবে। বাংলাদেশের মানুষ এমনিতে নামাজ-রোজা যতটুকুই করুক না কেন, ধর্মের প্রতি দুর্বলতা কিন্তু প্রগাঢ়।

গা থেকে সোয়েটার খুলতে-খুলতে চান্দু মিয়াকে বললাম, 'মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে একটু কথা বলা দরকার।'

চান্দু মিয়া গলায় অনেকখানি উৎসাহ নিয়ে বলল, 'চলেন, তারে মসজিদের ভেতরেই পাওন যাইব। নাইলে মসজিদের পেছনে তাঁর থাহনের ঘরে। খুবই পরহেজগার মানু। হারাক্ষণ ওজু অবস্থায় থাহেন। মসজিদের ভিতরে বইস্যা উনি হয় কোরানশরীব পড়েন নাইলে হাদীস-কেতাব পড়েন, নাইলে নফল নামাজ পড়েন। বেহুদা বইয়া থাহেন না...'

ইমাম সাহেবের কথা জিজ্ঞেস করতেই চান্দু মিয়াকে এত উৎসাহিত দেখাচ্ছে কেন কে জানে? গড়গড় করে কথা বলেই যাচ্ছে। এমনিতে কিন্তু চান্দু মিয়া তেমন কথাবার্তা বলে না, হুঁ-হ্যাঁর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

আমরা মসজিদের দিকে এগোচ্ছি। চান্দু মিয়া ইমাম সাহেব সম্পর্কে বিভিন্ন গুণগান করেই যাচ্ছে, '...খুবই কামেল আদমি। ওনার বশে কয়ডা জিন আছে। ফজরের ওক্তে গেরামের কেউ মসজিদে নামাজে আয় না। উনি একলা-একলা নামাজ পড়েন। তহন জিনেরা ওনার পেছনে দাঁড়ায়ে জামাতে নামাজ আদায় করে...'

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম ইমাম সাহেবের সম্পর্কে চান্দু মিয়ার এত

উৎসাহ কেন। যার বশে জিন থাকে সে অনেক ক্ষমতাবান। চান্দু মিয়ার মত মানুষ ক্ষমতাবানদের প্রশংসা করবে এটাই স্বাভাবিক। মনে মনে আমি হাসলাম, মানুষ মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে আর গ্রামের লোকেরা এখনও জিন-টিনের বিশ্বাস নিয়ে পড়ে আছে!!!

মসজিদের ভিতরে ইমাম সাহেবকে পাওয়া গেল না। মসজিদের পিছনে ইমাম সাহেবের থাকার ঘরের সামনে গিয়ে দেখা গেল ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। বোঝা গেল ইমাম সাহেব ভিতরেই আছেন। চান্দু মিয়া দরজার কড়া নাড়তে নাড়তে উঁচু গলায়, 'ইমামসাব... ও ইমামসাব...' বলে কয়েকবার ডাক দেয়ার পর ইমাম সাহেবের সাড়া পাওয়া গেল।

দরজা খুলে ইমাম সাহেব বের হলেন। পরনে লুঙ্গি আর খালি গায়ে গামছা প্যাঁচানো। ইমাম সাহেবের লম্বাটে মুখমণ্ডল ভর্তি বুক পর্যন্ত লম্বা কাঁচা দাড়ি। মাথা চকচকে ন্যাড়া। গোঁফও কামানো। ঝকঝকে চোখে ঘন কালো মণি। সহজ-সরল চোখের চাহনি। অত্যন্ত সুপুরুষ চেহারা। চেহারায় নূরানী ছাপ।

ইমাম সাহেবকে দেখে বোঝা গেল তিনি এতক্ষণ ঘুমাচ্ছিলেন।

চান্দু মিয়া ইমাম সাহেবকে আমার পরিচয় দিল—বড় বাড়ির বড় মিয়ার ভাগ্নে। ঢাকা থেকে এসেছেন। গ্রামের লোকেরা আমার মামাকে বড় মিয়া বলে সম্বোধন করে। আর মামার বাড়িটা পরিচিত বড় বাড়ি নামে।

ইমাম সাহেব আমাকে সালাম দিলেন। আমি সালামের উত্তর দিয়ে বললাম, 'আপনার অনেক সুনাম শুনেছি। আপনি নাকি সব সময় ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকেন। তা এতক্ষণ বুঝি ঘুমাচ্ছিলেন?'

আমার প্রশ্নে ইমাম সাহেব বোধ হয় খানিকটা লজ্জা পেলেন। তিনি অপ্রস্তুত গলায় বললেন, 'ভাই, আমি রোজা রেখেছি। আর রোজা অবস্থায় ঘুমানোও ইবাদতের সমান।'

'এখন তো রোজার মাস নয়। কীসের রোজা রেখেছেন?'

'আমি প্রতি শুক্রবারই নফল রোজা রাখি।'

ভাবলাম কথা বাড়িয়ে শুধু শুধু সময় নষ্ট না করে আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে ইমাম সাহেবের কাছে এসেছি তা খুলে বলি। পকেট থেকে এক হাজার টাকা বের করে ইমাম সাহেবের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললাম, 'আজ জুমার নামাজের শেষে মুসল্লিদের নিয়ে মিলাদ পড়ে, আমার মামার জন্য দোয়া করবেন। মামা যেন নির্বাচনে জয়ী হতে পারেন। আর এই টাকা দিয়ে মিষ্টান্ন আনিয়ে রাখবেন। দোয়া শেষে মুসল্লিদের মধ্যে সেই মিষ্টান্ন বিতরণ করবেন।'

ইমাম সাহেব ইতস্তত করে বললেন, 'ভাই, মিষ্টান্নের জন্য এত টাকার প্রয়োজন নেই। মিষ্টান্ন মানে তো বাতাসা। মুসল্লি যা হবে তাতে দুই কেজির

বেশি বাতাসা লাগবে না। দুই কেজি বাতাসা কিনতে দুইশ' টাকার বেশি লাগে না।'

আমি বললাম, 'শুধু বাতাসা দিবেন কেন? বাতাসার সাথে শুকনো মিষ্টি বা জিলাপি দিতে পারেন।'

ইমাম সাহেব বললেন, 'হাটের দিন ছাড়া এই গ্রামে মিষ্টি বা জিলাপি পাওয়া যায় না। মিষ্টি বা জিলাপি আনতে হলে রূপাকাঠী বন্দরে যেতে হবে। রূপাকাঠী বন্দরে যেতে-আসতে প্রায় পাঁচ-ছয় ঘণ্টা লাগবে। জুম্মার নামাজ শুরু হওয়ার বাকি তো মাত্র তিন ঘণ্টা।'

আমি পাঁচশ' টাকার দুটো নোট থেকে একটি রেখে অন্যটি ইমাম সাহেবের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললাম, 'ঠিক আছে, তা হলে শুধু বাতাসার ব্যবস্থাই করুন।'

ইমাম সাহেব বললেন, 'তাতে তো পাঁচশ' টাকা লাগবে না, দুইশ' টাকাই যথেষ্ট।'

'বাকিটা আপনার হাদিয়া।'

ইমাম সাহেব লজ্জিত গলায় বললেন, 'আমি হাদিয়া নেই না।'

আমি বললাম, 'আমার কাছে পাঁচশ' টাকার নোটের নীচে কোনও ভাংতি টাকা নেই। বাকি টাকা পরে কোনও এক সময় নিয়ে যাব।'

এইবার ইমাম সাহেব টাকা নিলেন। স্নিগ্ধ হাসি দিয়ে বললেন, 'আমি এখনই সাইকেল নিয়ে বের হচ্ছি বাতাসা আনার জন্য।'

আমি দরাজ গলায় বললাম, 'আজ সন্ধ্যায় আপনার ইফতারি আমি পাঠিয়ে দিব।'

ইমাম সাহেব খুশি হওয়া গলায় বললেন, 'শুকরিয়া।'

আমরা চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালাম। ইমাম সাহেব লজ্জিত গলায় বললেন, 'ভাই, বেয়াদবি নিবেন না–এতক্ষণ আপনাদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হলো। আসলে এখানে মসজিদের ভিতরে ছাড়া বসার ব্যবস্থা নেই। মসজিদের ভিতরে তো আবার অজু ছাড়া যাওয়া যায় না। ঘুম থেকে উঠলাম, অজু নেই।'

আমি ইমাম সাহেবের কথা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ অন্য একটা প্রসঙ্গ তুললাম, 'ও, ভাল কথা, শুনলাম আপনার বশে নাকি কয়েকটা পোষা জিন আছে? আমাকে এক দিন জিন দেখাবেন।'

ইমাম সাহেব কোনও জবাব দিলেন না। শুধু চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন।

তিন

সন্ধ্যা থেকে গ্রামের বাজারেই আমি।

চায়ের দোকানে বসে লোকজনদের চা-বিস্কিট খাইয়ে খাতির জমানোর চেষ্টা চালিয়েছি, কিন্তু লোকজন আমাকে তেমন পাত্তা দিল না। শহরের আধুনিক শিক্ষিত লোকদের কথা গ্রাম্য লোকজন মনোযোগ দিয়ে শোনে–মামার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হলো। বরং গ্রামের লোকজন আমাকে ময়ূরের ঝাঁকে কাক ঢুকে পড়েছে সেই দৃষ্টিতে দেখছে।

এক বৃদ্ধ লোককে যখন আমার পরিচয় দিলাম সৈয়দ হালিম চৌধুরীর ভাগ্নে তখন লোকটা কেমন চোখ-মুখ শক্ত করে বললেন, 'চেহারা-সুরত দেইখ্যা তো বোঝছেলাম শিক্কিত ঘরের ভালা পোলা, এহন দেহি হালিম মিয়ার ভাগ্নে!'

বৃদ্ধের কথার মানে কী–সৈয়দ হালিম চৌধুরীর ভাগ্নে মানে খারাপ লোক। আজ এক দিনেই যা বুঝতে পারলাম তা হলো, গ্রামের লোকজন মামাকে তেমন ভাল চোখে দেখে না। মামাকে যারা সমর্থন করে, তাঁর মিটিং, মিছিল, সমাবেশে যোগ দেয় এর অধিকাংশই হচ্ছে উঠতি বয়সী গ্রাম্য বখাটে ছেলেছোকরা বা বদমায়েশ সুবিধাবাদী লোক।

বিভিন্ন চায়ের দোকানে ঘুরে-ঘুরে লোকজন পটানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে এক পর্যায়ে ক্লান্ত হয়ে, বাজারের ভিতরে মামার নির্বাচনী প্রচারণার অফিসে গিয়ে বসলাম।

মামার নির্বাচনী মার্কা হচ্ছে আনারস। অফিস ঘরের সমস্ত দেয়াল আনারস মার্কার পোস্টারে-পোস্টারে সয়লাব। পোস্টারে বড়-সড় একটা আনারসের পাশে মামার পাঞ্জাবি-টুপি পরা হাসি হাসি মুখের ছবি।

অফিসের দায়িত্বে আছে চেংড়া ধরনের কয়েকটা ছেলে। ছেলেরা আমাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়ল–কীভাবে আমার খেদমত করবে। কেউ ছুটে যায় সিঙারা-পিঁয়াজু আনতে, কেউ যায় চা আনতে, কেউ আবার সিগারেট আনতে।

চেংড়াদের লিডারের নাম আবুল বাসার। আবুল বাসার শিক্ষিত ছেলে। শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করে শুদ্ধ-অশুদ্ধ গুলিয়ে ফেলে। পর পর তিনবার এইচ.এস.সিতে ফেল করেছে। তার খুব ইচ্ছে পাশ করে ঢাকা ভার্সিটিতে পড়াশুনা করা।

প্রাথমিক পরিচয় পর্ব শেষে আবুল বাসার হাসি মুখে বলল, 'ব্রাদার,

ঢাকার বর্তমান হালচাল সম্পর্কে কিছু কন।'

আমি বললাম, 'ঢাকা সম্পর্কে কী বলব? ঢাকা যেমন ছিল তেমনই আছে।'

'না, শোনলাম ঢাকা নাকি আইজকাইল ফরেন হইয়া গেছে।'

'কোন্ দিক দিয়ে?'

'না, শোনলাম...' আমতা আমতা করে আবুল বাসার, 'রাস্তাঘাটে মেয়েরা নাকি আইজকাইল ওড়না-টোড়না পরা বাদ দিছে। মিনি স্কার্ট, টাইড গেঞ্জি, সর্ভ কামিজ পরে ওড়না-টোড়না ছাড়া বেহায়ার মত ঘুরে বেড়ায়। যারাও একটু-আরটু ওড়না পরে, তারা এক পাশ ঢাকে অন্য পাশ উদম করে রাখে। আর পার্কে পার্কে নাকি চলে খোলামেলা প্রেম।'

আমি হাই চেপে প্রসঙ্গ ঘুরাতে বললাম, 'ঢাকায় কী হয় না হয় তা দিয়ে কোনও দরকার নেই। এখানকার পরিস্থিতি কী বলছে তাই বলুন? মামার সাপোর্টার কেমন? মামা কি ভোটে জিততে পারবেন?'

আবুল বাসার বিজয়ীর হাসি দিয়ে বলল, 'ইনশাল্লাহ! ধইরা নেন আমরা হইয়া গেছি। আনারস মার্কা ছাড়া একটা ভোটও অন্য কিছুতে পড়বে না।'

ঠাণ্ডা মিয়ানো একটা পিঁয়াজু আর চা খেয়ে সিগারেট ধরালাম। বাজারের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। রাত মাত্র সাড়ে আটটা। আমার জ্যাকেটের পকেটে মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। ঢাকা থেকে আমার বন্ধু আরিফ ফোন করেছে।

আরিফের সাথে কথা বলা শেষে মোবাইল ফোনটা পকেটের যথাস্থানে রাখতে গেলাম, তখন আবুল বাসার আমার দিকে ঝুঁকে এসে বলল, 'ব্রাদার, আপনার মোবাইলে কি কিছু নাই?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কী থাকবে?'

আবুল বাসার ষড়যন্ত্রকারীদের মত গলা নিচু করে বলল, 'ব্রাদার, শুনেছি আইজকাইল সবার মোবাইলে নাকি নাটক-সিনেমার নায়িকাদের বিভিন্ন উল্টা-পাল্টা দৃশ্যের গোপন ভিডিও থাকে। তা আপনার মোবাইলে এই জাতীয় কিছু নাই?'

আমি বিরক্ত স্বরে বললাম, 'না, নেই।'

আমার বিরক্তিভাব হয়তো আবুল বাসার বুঝতে পারল। এর পর কিছুক্ষণ সে চুপ মেরে রইল। আমিই আবার মুখ খুললাম, 'দোকানপাট তো সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে, অফিস খুলে বসে থেকে আর লাভ কী?'

আবুল বাসার বলল, 'তা, ব্রাদার, ঠিকই বলেছেন। বসে থেকে কোনও লাভ নাই। মেলা রাইত হইছে। আপনে আছেন বইলাই এতক্ষণ অফিস বন্ধ করি নাই। আপনের সাথে কথা কইয়া বহুত মজা পাইতেছি।'

অফিস বন্ধ করে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। আমার সাথে যথারীতি

আমার সার্বক্ষণিক পাইকদার চান্দু মিয়া আর আবুল বাসার। আবুল বাসারের সাথের অন্যান্য ছেলেরা কিছুদূর আসার পর ভিন্ন রাস্তা ধরে চলে গেছে। তাদের বাড়ি গ্রামের অন্য পাশে। শুধু আবুল বাসারের বাড়িই মামার বাড়ির পাশে। কী আর করা, সারা পথের সফর সঙ্গী হলো দুষ্টমতি আবুল বাসার।

রাত মাত্র সাড়ে নয়টা। এরই মধ্যে সমস্ত গ্রামটা যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। চারদিক নীরব-নিস্তব্ধ। শুধু গাছের পাতা থেকে পাতায় ঝরে পড়া শিশিরের টুপ-টুপ শব্দ আর মাঝে-মাঝে রাত জাগা পাখিদের ডানা ঝাপটানো এবং গা ছমছমানো বুলি।

আমরা তিনজন কথাবার্তা ছাড়াই নীরবে হেঁটে চলছি। খুব শীত পড়েছে। গায়ে দামি চামড়ার জ্যাকেট থাকতেও শীতের হিম যেন হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। আবুল বাসারের পরনে লুঙ্গি, গায়ে চাদর। মাথা, গলা, কান মাফলার দিয়ে ভালভাবে প্যাঁচানো। দুঃখ লাগল চান্দু মিয়ার কথা ভেবে। চান্দু মিয়ার পরনে শুধু সকালের পরা সেই বিবর্ণ পুরানো হাফহাতা শার্ট আর ময়লা লুঙ্গি। যথারীতি খালি-পা। তবে মাথা, গলা, কান একটা মাফলার দিয়ে প্যাঁচানো। চান্দু মিয়ার ভাবভঙ্গি নির্বিকার। সে যে শীতে কষ্ট পাচ্ছে তাকে দেখে তা মনে হচ্ছে না।

কিছু দূর যাওয়ার পর আবুল বাসার চাদরের নীচ থেকে একটা সস্তা সিগারেটের প্যাকেট বের করে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'ব্রাদার, গাঁজা ভরা কয়েকটা সিগারেট আছে, অভ্যাস থাকলে ধরান।'

আমি রাগান্বিত স্বরে বললাম, 'না, ওসব হাবিজাবির অভ্যেস আমার নেই।'

আবুল বাসার একাই একটার পর একটা গাঁজা ভরা সিগারেট ধরিয়ে উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে, আয়েশি ভঙ্গিতে হেলেদুলে হাঁটতে থাকল।

চার

বাড়িতে পৌঁছাতে সাড়ে দশটা বেজে গেল। মামা তখনও ফেরেননি। সন্ধ্যায় মামা গিয়েছেন উত্তর পাড়ায় সমাবেশ করতে।

বাড়িতে হুলস্থুল কাণ্ড। মামার চার মাস বয়সী ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঘটনা এমন—ছোট মামী রাত পৌনে দশটার দিকে তাঁর শিশুপুত্রকে নিয়ে নিজের রুমে ঘুমাতে যান। মশারি খাটিয়ে, ঘুমন্ত ছেলেকে মশারির ভিতরে রেখে মামী রুমের সাথে লাগোয়া টয়লেটে যান। টয়লেট থেকে বের হওয়ার পর দেখতে পান বিছানায় তাঁর ছেলে নেই। রুমের

দরজাও খোলা। মামীর স্পষ্টই মনে আছে, তিনি রুমের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

মামীর কথা যদি সত্যি হয়, অর্থাৎ তিনি যদি রুমের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করেই থাকেন, তা হলে ধরে নিতে হবে কেউ আগে থেকেই মামীর রুমের ভিতরে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল। হয়তো খাটের নীচে বা আলমারির পিছনে। মামী যখন টয়লেটে ঢোকেন তখন সুযোগ বুঝে তাঁর ছেলেকে নিয়ে সটকে পড়ে। কিন্তু বাড়ি ভর্তি লোকজন, এর মধ্যে কেউ বাচ্চা চুরি করে পালিয়ে যাবে তা কারও চোখে পড়বে না এটা কেমন কথা!!!

মামা বাড়িতে ফেরার পর কিছুক্ষণ হম্বিতম্বি আর গলা ফাটিয়ে গর্জন করে কাজের লোকদের গালাগালি করে এক সময় মিয়ানো মুড়ির মত মিইয়ে যান। ধরা গলায় বলতে থাকেন, 'আমাকে নির্বাচন থেকে সরানোর জন্য এটা কালা জাকিরের একটা চাল...'

কালা জাকির হচ্ছে মামার নিকটতম প্রতিপক্ষ। নিকটতম প্রতিপক্ষ বলছি এই জন্যে, মামার ধারণা, মামা যদি নির্বাচনে বিজয়ী হতে না পারেন, তা হলে কালা জাকির হবে।

ছেলে চুরি যাওয়ার পর থেকে ছোট মামী তীক্ষ্ণ স্বরে কাঁদতে-কাঁদতে একটু পর পর মূর্ছা যাচ্ছেন। মামার চোখও বারবার ভিজে উঠছে। আমি মামাকে সান্ত্বনা দিচ্ছি। মামার মত একজন ক্ষমতাবান দাপটশালী লোকের চোখে পানি দেখতে কেমন অন্য রকম লাগছে। কী আশ্চর্য ব্যাপার, সৃষ্টিকর্তা ধনী, গরিব, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান...সবার রক্তের রঙ যেমন লাল বানিয়েছেন তেমন সবার চোখের পানির রঙও একই করেছেন।

মামার ছেলের খোঁজে চারদিকে লোক বেরিয়ে পড়েছে। ধারণা করা হচ্ছে—বাচ্চা যে চুরি করেছে সে এখন পর্যন্ত গ্রামের সীমানার বাইরে যেতে পারেনি। ট্রলার ঘাটে, খেয়া ঘাটে লোক রাখা হয়েছে। যাতে ট্রলারযোগে বা নৌকাযোগে কেউ গ্রামের বাইরে না যেতে পারে।

মামা এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। যে তাঁর ছেলের খোঁজ এনে দিতে পারবে সে টাকাটা পাবে।

মামার নির্বাচনী অফিসের কর্তা লোক গাঁজাখোর আবুল বাসারকেও দেখলাম একটা কানা টর্চলাইট নিয়ে মামার ছেলেকে খুঁজতে বেরিয়েছে। টর্চলাইটটাকে কানা বলছি এই জন্যে—সেই টর্চলাইট দিয়ে যে আলো বেরুচ্ছে তাতে দৃষ্টিভ্রম হয়ে পথে হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়ার সম্ভাবনা আছে। আবুল বাসারের চোখ দুটো টকটকে লাল। কথাবার্তা জড়ানো। জড়ানো গলায় সে বলে গিয়েছে, 'ব্রাদার, ইনশাল্লাহ বড় মিয়ার ছেলেকে আমিই খুঁজে পামু।'

রাত বেড়েছে। বাড়ি ভর্তি লোকজন। সরগরম পরিবেশ। বৈঠকখানায়

মামা তাঁর ঘনিষ্ঠজন বন্ধুসম লোকজন নিয়ে বসে আছেন। মামার সবচেয়ে কাছের বন্ধু, তাঁর ডান হাত দবির বেপারীও উপস্থিত। মামা ছেলে হারানোর শোকে হা-হুতাশ করে যাচ্ছে। সবাই তাকে ভরসা দিচ্ছে। দবির বেপারী, ঘন ঘন মোবাইল ফোনে কাকে যেন নির্দেশ দিচ্ছে, কালা জাকিরের কান ধরে এখানে নিয়ে আসতে। স্বেচ্ছায় না আসতে চাইলে জোর করে নিয়ে আসতে।

দবির বেপারীসহ মামার সমস্ত ঘনিষ্ঠজনদের বদ্ধমূল ধারণা মামার ছেলে চুরি যাওয়ার পিছনে কালা জাকিরেরই হাত আছে। কালা জাকিরকে ধরে ঠিকমত প্যাঁদানি দিতে পারলে সব রহস্য বের হয়ে আসবে।

বিভিন্ন উড়ো খবর আসছে। দক্ষিণ পাড়ায় সন্দেহজনক এক লোক ধরা পড়েছে। খেয়াঘাটে অপরিচিতা সুন্দরী এক মহিলাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর আসে ট্রলারঘাট থেকে। বোরখা পরা এক মহিলাকে রাত সাড়ে দশটার দিকে ট্রলারযোগে বন্দরের দিকে যেতে দেখা গিয়েছে। মহিলার বোরখার নীচে কিছু বোধহয় লুকানোও ছিল। তৎক্ষণাৎ বন্দরের উদ্দেশে লোক পাঠানো হয়েছে সেই মহিলার খোঁজে।

বৈঠকখানার এক কোনায় বসে দবির বেপারী আর মামার ঘনিষ্ঠজনদের মামার ছেলে খুঁজে বের করার বিভিন্ন পদক্ষেপ দেখা ছাড়া আমার আর কোনও কিছু করার নেই। আমি এখানকার অতিথি, পথঘাট ভাল করে চিনিও না। কোথাও খুঁজতে বের হব সেটা সম্ভব নয়। অবশ্য আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী চান্দু মিয়া আমার পাশেই আছে। তাকে নিয়ে কোথাও যাওয়া যায়। কোথাও যেতে আমার ইচ্ছে করছে না। শরীর কেমন বিবশ লাগছে। আজ সারাদিন অনেক হেঁটেছি। আমি শহুরে ছেলে, জীবদ্দশায় এমন ম্যারাথন হাঁটাহাঁটি আর হয়নি। প্রচণ্ড খিদেও পেয়েছে। বাড়ির এমন পরিস্থিতিতে খেতে বসা যায় না। কী আশ্চর্য ব্যাপার, সব পরিস্থিতিতেই মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণা লাগে! খুব নিকটজন কেউ মারা গেলেও আমরা কিছুক্ষণ কেঁদেকেটে খেতে বসি। ক্ষুধা তখন আরও বেশি পায়। কাঁদলে চোখের জলের সাথে শরীর থেকে প্রচুর প্রোটিন বেরিয়ে যায়। তাই শরীর ঘাটতি প্রোটিন পূরণের জন্য তখন খাবার চায়।

বৈঠকখানা থেকে বাইরে বের হলাম সিগারেট ধরানোর জন্য। আমার পিছনে পিছনে চান্দু মিয়াও বের হলো। আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকার যে দায়িত্ব চান্দু মিয়াকে দেয়া হয়েছে তা সে নিষ্ঠার সাথে পালন করছে।

টানা বারান্দার একেবারে দক্ষিণ মাথায় গিয়ে দাঁড়ালাম। সিগারেট ধরিয়ে দু-তিনটা টান দিয়ে দেখি কেমন গা গুলাচ্ছে। পেটে ক্ষুধা নিয়ে সিগারেট খেতে চাইলে সাধারণত এমনই হয়।

আমার ছায়াসঙ্গী চান্দু মিয়া বলল, 'ভাইজান, চলেন ইমামসাবের কাছে

যাই।'

আমি সিগারেট ফেলে দিয়ে গলায় বিরক্তি নিয়ে বললাম, 'এত রাতে ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে কী হবে?'

'ইমাম সাব জিনেরে দিয়া বড় মিয়ার পোলার খোঁজ কইতে পারবে।'

চান্দু মিয়ার প্রস্তাবটা খারাপ লাগল না। এটা স্বীকার করতেই হবে সত্যিই ইমাম সাহেব লোকটার চেহারার মাঝে কেমন আধ্যাত্মিক নূরানী ছাপ আছে। এমন চেহারার লোক দেখলে যে কোনও মানুষেরই মনে হতে পারে, লোকটার মাঝে কোনও অলৌকিক ক্ষমতা থাকলেও থাকতে পারে। আমার মনের গভীরেও খানিকটা কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। কৌতূহল মেটানোর এটা একটা মোক্ষম সময়।

পাঁচ

মসজিদে পৌঁছে অবাক হলাম।

ইমাম সাহেব খিচুড়ি রান্না করে, পিঁয়াজ-কাঁচা মরিচ কুচানো দিয়ে ডিম ফেটে রেখে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমরা আসার পর ডিম ভেজে আমাদের নিয়ে খেতে বসবেন। ইমাম সাহেব কী করে বুঝলেন এত রাতে আমি আর চান্দু মিয়া ক্ষুধা পেটে তাঁর কাছে আসব?! তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু কোনও সদুত্তর পেলাম না।

তিনি স্টোভে ডিম ভাজতে-ভাজতে কোমল গলায় বললেন, 'আল্লাহ্পাক আজ রাতে আপনাদের দু'জনার রিজিক আমার সাথে লিখেছেন। তাই আমি আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করেছি আর আপনারাও এসেছেন।'

মসজিদের ভিতরেই আমরা গোল হয়ে খেতে বসেছি। ঝাল-ঝাল খিচুড়ি, গরম ডিম ভাজা দিয়ে খেতে খুবই ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে যেন স্বর্গীয় খাবার খাচ্ছি। এমন সুস্বাদু খাবার বোধহয় আমি আর জীবনেও খাইনি। অথচ খুবই সাধারণ দ্রব্য দিয়ে খিচুড়ি রান্না করা হয়েছে। খুব সম্ভব মুগ, মসুর, দুই-তিন প্রকারের ডালের সাথে ছোট-ছোট টুকরো করে কাটা আলু আর যা যা প্রয়োজন–চাল, পিঁয়াজ, রসুন, হলুদ, লবণ, গরম মসল্লা...এসব দিয়েই খুব সাধারণ ভাবে রান্না খিচুড়ি। অতিরিক্ত শুধু বোম্বাই মরিচ। বোম্বাই মরিচের ঝাঁজ-ঝাঁজ ঘ্রাণ আর ঝাল পাওয়া যাচ্ছে। বোম্বাই মরিচের ঝাল শীতের রাতে শরীর গরম করে দিচ্ছে।

খিচুড়ি খাওয়া শেষ হতেই ইমাম সাহেব ছুটে বাইরে গেলেন। একটু পর ফজলি আমের মত বড় সাইজের একটা পাকা আম হাতে ভিতরে ঢুকলেন।

আমটার রঙ সিঁদুরে লাল।

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই অসময়ে আম পেলেন কোথায়? এখন তো আমের সিজন না।'

ইমাম সাহেব কোনও উত্তর না দিয়ে রহস্যময় স্নিগ্ধ হাসি দিলেন। তারপর বটি দিয়ে আমটা কাটতে লাগলেন।

আমার বিস্ময় আকাশ ছুঁয়ে গেল, যখন দেখলাম আমের খোসা ছেলার পর আমের ভিতরটা টুকটুকে লাল। সাধারণত পাকা আমের রঙ হয় হলুদ। এমন লাল রঙের আম আমি জীবনেও দেখিনি। আগে আমি এমন আম দেখেছি যে আমের খোসা সিঁদুরে লাল, কিন্তু ভিতরে ঠিকই হলুদ। আমের ভিতরটা অমন টুকটুকে লাল জীবনে এই প্রথম দেখলাম।

ইমাম সাহেব আমের একটা বড় টুকরো আমাকে দিলেন, টুকটুকে লাল রঙের আম হাতে নিয়ে প্রথমে কিছুক্ষণ মুগ্ধ চোখে আমের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এরপরে মুখে দিয়ে দেখি মধুর মত মিষ্টি। স্বাদ যেমন, মিষ্টিও তেমন, মন মাতানো মিষ্টি গন্ধ। নরম মাখনের মত মুখের ভিতরে যেন গলে-গলে যাচ্ছে।

ইমাম সাহেব চান্দু মিয়াকেও আমের টুকরো দিলেন। নিজেও একটা টুকরো মুখে নিলেন। এবং খাওয়া শেষে গলায় অনেকখানি তৃপ্তি নিয়ে বললেন, 'শুকুর আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আমটা খুবই মিষ্টি।'

আম কাটার এক পর্যায়ে আরও আশ্চর্য হলাম। আমের কোনও বিচি নেই!!! চান্দু মিয়াকে দেখলাম–সে নির্বিকার। সে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই আম খাচ্ছে। চান্দু মিয়ার ভাব দেখে মনে হচ্ছে, ইমাম সাহেবের আমের রঙ তো এমনই লাল হবে! বিচি ছাড়া হবে! এটাই স্বাভাবিক। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই!

খাওয়া শেষ হতেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে যেতে চাইল। চান্দু মিয়ারও দেখি একই অবস্থা। সে মসজিদের ডান পাশে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল। তাই দেখে ইমাম সাহেব বললেন, 'মসজিদের ডান দিকে শোয়া উচিত নয়, বাম দিকে শুতে হয়।'

ইমাম সাহেব বালিশ আর কাঁথা এনে দিলেন। চান্দু মিয়া, ইমাম সাহেবের নির্দেশ মত মসজিদের বাম দিকে গিয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়েও পড়ল। ভারী শ্বাস নিতে লাগল।

মসজিদের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ, বাইরের ঠাণ্ডা ভিতরে ঢুকতে পারছে না। মেঝেতে সস্তা দরের পাটের কার্পেট বিছানো। সব মিলিয়ে এই শীতের রাতে মসজিদের ভিতরটা ঘুমানোর জন্য যথেষ্টই আরামপ্রদ।

আমি ঘুম জড়ানো গলায় হাই চাপতে-চাপতে ইমাম সাহেবকে বললাম, 'আপনার কাছে মূলত যে জন্যে এসেছিলাম, সেই প্রসঙ্গ তো তোলাই হলো না।'

ইমাম সাহেব আমার চোখে চোখ রেখে থমথমে গলায় বললেন, 'আপনার মামার ছেলের খোঁজ জানতে তো?' কিছুক্ষণ চুপচাপ পলকহীন থেকে, 'আর সত্যিই আমার কোনও ক্ষমতা আছে কিনা সেটা দেখতে তো?' আমার চোখ থেকে চোখ নামিয়ে, 'অনেক রাত হয়েছে, ঘুমিয়ে পড়ুন। আল্লাহতায়ালা রাত দিয়েছেন ঘুমানোর জন্য।' একটু থেমে গলায় কেমন রহস্যময় গাম্ভীর্য এনে, 'হয়তো ঘুমের মধ্যেই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।'

কথা শেষ করেই ইমাম সাহেব কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমিও ইমাম সাহেবের কাছ থেকে কিছুটা দূরে শুয়ে পড়লাম। সম্ভবত শোবার সাথে সাথেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম এবং সেই সাথে দেখতে শুরু করলাম একটা জীবন্ত স্বপ্ন।

স্বপ্নে ছোট মামীকে দেখছি। ছোট মামীর চিন্তা চেতনাগুলো আমি যেন সব স্পষ্ট বুঝতে পারছি। ছোট মামী সারাক্ষণ শুধু কাঁদেন, তাঁর কোলের দুধের বাচ্চার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে কাঁদেন। বাচ্চাটাকে তিনি প্রচণ্ড ঘৃণা করেন। তাঁর মনের ভিতরে প্রতিহিংসার জন্ম দিয়েছে ওই বাচ্চা। কারণ এই বাচ্চা তাঁর ভালবাসার ফসল নয়, তাঁর ঘৃণার ফসল।

ছোট মামীর মনে অনেক দুঃখ। বিয়ের আগে তিনি রূপবান এক যুবকের সাথে প্রেম করতেন। মনের ভিতরে তখন কত রঙিন স্বপ্ন। একদিন তারা দুজনে মিলে ঘর বাঁধবে, ভালবাসার রঙিন স্বপ্নগুলো বাস্তবে ধরা দেবে, তাদের ফুটফুটে একটা বাচ্চা হবে...দু'জনার অভিভাবকদেরও সেই বিয়েতে সম্মতি ছিল। হঠাৎ একদিন প্রতাপশালী বয়স্ক হালিম মিয়া লোকজন দিয়ে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে জোর করে বিয়ে করেন। রঙিন স্বপ্নগুলো ভেঙেচুরে পথের ধুলোয় মিশে যায়।

হালিম মিয়ার আরও তিন স্ত্রী আছে। তাঁর কোনও ছেলে সন্তান নেই। তিনি একটি ছেলের জন্য মরিয়া হয়ে আছেন। সময়ের স্রোতে এক সময় ছোট মামী একটা ছেলে সন্তানের জন্ম দেন। হালিম মিয়ার স্বপ্ন পূরণ হয়।

হালিম মিয়া তো ছেলে পেয়ে খুশিতে আটখানা। আর ছোট মামীর মনে মাথা চাড়া দেয়–এই তো প্রতিশোধ নেয়ার যোগ্য জিনিস। ছোট মামী ভাবেন, হালিম মিয়া তাঁর জীবনের সমস্ত সুখ-আনন্দ কেড়ে নিয়েছে, তাকেও তিনি সুখে থাকতে দেবেন না। বুড়ো হাবড়াটা কম বয়সী স্ত্রী আর ছেলে নিয়ে সুখে জীবন কাটাবে তা হতে পারে না। প্রতিশোধ নিতে হবে–প্রতিশোধ। সারাক্ষণ মাথার ভিতরে ভন-ভন করে প্রতিশোধ।

ছোট মামী সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। এক সময় তাঁর সুযোগ এসে যায়। হালিম মিয়া দিন-রাত ব্যস্ত থাকেন নির্বাচনের প্রচারণায়। এই তো অঘটন ঘটানোর সঠিক সময়।

হালিম মিয়ার জগতের সবচেয়ে প্রিয়জন তাঁর চার মাসের শিশুপুত্রকে ছোট মামী রাতের আঁধারে সবার অগোচরে, বাড়ির সামনের বড় পুকুরটায় ফেলে আসেন। তিনিই কিন্তু শিশুটির মা! কিন্তু তাতে তাঁর হাত একটুও কাঁপেনি। তিনি স্বীকার করেন না এই শিশুটির মা তিনি। শিশুটি শুধুই হালিম মিয়ার। হালিম মিয়া তাঁকে শিশুটির মা হতে বাধ্য করেছিলেন। তাঁর জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন ওই পাষণ্ড হালিম মিয়া। আজ তিনি প্রতিশোধ নিতে পেরেছেন। হালিম মিয়ার সবচেয়ে প্রিয়জনকে আজ তিনি মেরে ফেলেছেন। সামান্য হলেও মনে শান্তি লাগছে। তাঁর নিজেরও বেঁচে থাকার কোনও ইচ্ছে নেই। বেঁচে থাকার ইচ্ছে মরে গেছে সেই কবে। শুধু আজকের এই দিনটার জন্যই এত দিন ধরে অপেক্ষা। প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে, এখন করবেন আত্মহত্যা!

স্বপ্নের এর পরের অংশ আমি যা বাস্তবেই দেখেছিলাম তাই। নিজের রুম থেকে ছেলে চুরি যাওয়ার ছোট মামীর মিথ্যে নাটক। ছোট মামীর কান্নাকাটি আর মূর্ছা যাওয়ার অভিনয়। মামার রাগারাগি, হম্বিতম্বি, হা-হুতাশ। মামার এক লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা। চুরি যাওয়া ছেলেকে খুঁজতে দলে-দলে লোকজন বের হওয়া। খেয়াঘাটে-ট্রলারঘাটে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। কালা জাকিরকে সন্দেহ...

পরিশিষ্ট

মামার শত আদরের ধন তাঁর শিশুপুত্রের ভাসমান লাশ পাওয়া যায় বাড়ির সামনের বড় পুকুরের মাঝে। পুত্রের মৃত্যু শোকে মামা একেবারে ভেঙে পড়েন। সেই শোক সামলাতে না সামলাতে তিন দিনের মাথায় ছোট মামীও বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। সবাই মনে করে ছোট মামী আত্মহত্যা করেছেন পুত্রের শোকে। নির্বাচনেও মামার ভরাডুবি হয়। বিপুল ব্যবধানে মামা হেরে যান। গ্রামের একটা সাধারণ লোকও মামাকে ভোট দেয় না। কালা জাকিরও নির্বাচনে জয়ী হতে পারে না। নির্বাচনে জয়ী হন মকবুল মাস্টার নামে এক লোক। অত্যন্ত সাদাসিধা ভাল মানুষ তিনি। তাঁর চেয়েও বড় কথা, তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। আর আমার মামা হচ্ছেন একাত্তরের রাজাকার।

আমার খুব ভাল লাগছে এই ভেবে—মামাদের গ্রামের অশিক্ষিত সহজ-সরল লোকরাও আজ একাত্তরের রাজাকারকে প্রত্যাখ্যান করে একজন মুক্তিযোদ্ধার যোগ্য সম্মান দিতে শিখেছে। এমন এক দিন আসবে এই

গ্রামের মত, যেদিন বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হবে।

যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায়ও মামার নাম উঠেছে। আমার আপন মামা–এর পরেও আমি মনে-প্রাণে চাই, যুদ্ধাপরাধের দায়ে মামার যেন উপযুক্ত শাস্তি হয়। ভেবে অবাক লাগে, আমাদের দেশের বড়-বড় রাজনৈতিক দল কীভাবে তাদের ছত্রছায়ায় একাত্তরের ঘাতক রাজাকার, আলবদর, আলশামস্‌দের মত যুদ্ধাপরাধীদের আশ্রয় দেয়! যুদ্ধাপরাধীর মুক্তির জন্য তারা মিটিং-মিছিল-হরতাল ডাকে। সেই সব রাজনীতিবিদদের কি দেশের জন্য কোনও দায়িত্ববোধ, সম্মানবোধ, ভালবাসা নেই??? দেশকে যারা ভালবাসে না, তাদের রাজনীতি করার কোনও অধিকার নেই। ষোলো কোটি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করার কোনও যোগ্যতাই তাদের নেই। ওই সব মুখোশধারী রাজনীতিবিদদের অবশ্যই একদিন এ-দেশের জনগণ টেনে-হিঁচড়ে তাদের অবস্থান থেকে হটিয়ে দেবে।

সেই রাতে ইমাম সাহেবের খাওয়ানো বিচিবিহীন টুকটুকে লাল রঙের আমের কথা অনেককেই বলেছি। সবাই-ই শুনে প্রচণ্ড অবাক হয়েছে। আমি আর চান্দু মিয়া ছাড়া চেনাজানা আর কাউকেই এখন পর্যন্ত পেলাম না, যার ভাগ্যে অমন আম খাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে।

আমাদের ভার্সিটির বোটানি বিভাগের চেয়ারম্যান স্যরকেও সেই আম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। স্যর রাগান্বিত স্বরে বলেছেন, 'আমার সাথে এ ধরনের সস্তা রসিকতা আর কখনও করবে না। আমি তোমার বন্ধু বা ইয়ারমেট নই। বিচিবিহীন, টুকটুকে লাল রঙের আবার আম হয় নাকি!'

আমার পরিচিত এক বড় ভাই মুহম্মদ পারভেজ মুন্না। সংক্ষেপে মুন্না ভাই। অসংখ্য বই পড়ার জ্ঞান যাঁর রয়েছে। তাঁকেও আমটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। সব শুনে তিনি বললেন, 'ইমাম সাহেব সেই রাতে তোমাকে এবং চান্দু মিয়াকে হিপনোটাইজ করেছিলেন। হিপনোটাইজড অবস্থায় হিপনোটিস্ট যে ধরনের হিপনোটিক সাজেশন দেয় তাই সত্যি মনে হয়। হিপনোটিস্ট যদি এক মুঠ কাদা মাটিও হাতে দিয়ে হিপনোটিক সাজেশন দেয়–এটা আমের মত দেখাচ্ছে, এটার রঙ টুকটুকে লাল, এটা খেতে খুব মিষ্টি, তখন সেটাই মনে হবে।'

আমি মুন্না ভাইয়ের যুক্তিটা মন থেকে মানতে পারলাম না। এর পরেও যুক্তি খণ্ডনের দিকে না গিয়ে বললাম, 'তা হলে স্বপ্নের ব্যাপারটা! স্বপ্নে আমি কীভাবে আসল তথ্য জানলাম?'

মুন্না ভাই মাথা চুলকাতে-চুলকাতে বললেন, 'ইমাম সাহেব বোধহয় উচ্চ ক্ষমতার টেলিপ্যাথির মাধ্যমে তাঁর জানা তথ্য তোমাকে স্বপ্নে দেখিয়েছেন।'

সুবাসওয়ালা

ঘুঘু ডাকা দুপুর। সবেমাত্র ভাত খেয়ে উঠেছি। বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে খবরের কাগজের পাতা উল্টাতে-উল্টাতে হাই চাপছি। শরীর দুপুরের ভাত ঘুমের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এমন সময় পিপ-পিপ, মোটরসাইকেলের হর্নের শব্দে মুখ তুলে দেখি, বাসার সামনে আমার প্রাণের দোস্ত সুমন মোটরসাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে তাকাতে দেখেই, আন্তরিক ভঙ্গিতে হাসি দিয়ে, চেঁচিয়ে বলল, 'প্যান্ট পরে চলে আয়।'

ছেলেবেলা থেকেই সুমন খেয়ালী স্বভাবের। যখন যা মন চায় তাই করে। বাধা দিয়েও কোন লাভ হয় না। আর মোটরসাইকেলটা কেনার পর উড়নচণ্ডী স্বভাবটাও পেয়েছে। কথা নেই বার্তা নেই বলবে, 'চল।'

'কোথায়!'

'ডৌয়াতলা।'

ডৌয়াতলা এক অজ পাড়া গাঁয়ের নাম। কাদা প্যাকপ্যাকে রাস্তাঘাট। প্রায় হাঁটু সমান কাদায় ডজন খানেক আছাড় খেয়ে যেখানে পৌঁছেছিলাম, তা হলো এক মহিলাপীরের আস্তানা। পীরসাহেবা বিভিন্ন কঠিন রোগের চিকিৎসা করেন। সব চিকিৎসারই ওষুধ হচ্ছে কলা পাতায় মোড়ানো এক মুঠ কাদা। বড়ি বানিয়ে, রোদে শুকিয়ে, প্রতিদিন সকালে খালি পেটে খেতে হবে। সুমনের পাল্লায় পড়ে এমন মহিলাপীর, শিশুপীর, সাধুবাবা, মেয়ে ছেলে হয়ে গিয়েছে, চল্লিশ দিনের জিন্দা কবর, গণ্ডগ্রামের মেলা-উৎসব এ ধরনের বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার অগণিত পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। এসব ক্ষেত্রে ও এমনভাবে অধিকার নিয়ে প্রস্তাব করে, যে না বলতে পারি না, শেষ পর্যন্ত যেতেই হয়।

প্যান্ট পরে, পরিপাটী করে চুল আঁচড়িয়ে, সানগ্লাসটা চোখে লাগিয়ে সুবোধ বালকের মত গিয়ে সুমনের মোটরসাইকেলের পিছনে চেপে বসলাম। কাশিপুরের পোস্ট অফিস, বাজার অতিবাহিত হওয়ার পর কৌতূহল চেপে না রাখতে পেরে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, 'কোথায় যাচ্ছি?'

'আজ রাসপূর্ণিমা।'

রাসপূর্ণিমা! তার মানে আজ মাধবপাশার দুর্গারসাগরের (বরিশালের ঐতিহ্যবাহী দিঘি) পশ্চিম পাড়ে রাসউৎসব উপলক্ষে মেলা বসেছে। আমরা সেই মেলায় যাচ্ছি।

আমরা অনেকক্ষণ ধরে মেলার ভিতরে ঘুরছি। হঠাৎ লক্ষ করলাম সুমন

আমার পাশে নেই। আমি তেমন উদ্বিগ্ন হলাম না—এমনটাই বরাবর হয়। ও হয়তো এখন কোন মেয়েকে পটানোর কাজে ব্যস্ত। ও পারেও! ওর সুদর্শন চেহারা আর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মার্জিত ব্যবহারে যে কোন মেয়েই প্রথম দেখাতেই মোমের মত গলে যায়। দুশ্চিন্তার কিছুই নেই, সময় মত ওর দেখা পেয়ে যাব—এই ভেবে একা-একাই মেলার ভিতরে ঘুরতে শুরু করলাম।

ঘুরতে-ঘুরতে উত্তর মাথার বট গাছের গোড়ায় বসে থাকা এক লোকের উপর আমার দৃষ্টি পড়ল। লোকটার গায়ে কালো আলখাল্লার মত পোশাক। পিঠ পর্যন্ত ছড়ানো কোঁকড়ানো জট পাকানো চুল। সারা মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফ। দাড়ি বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলের মধ্যে জ্বলজ্বলে জ্যোতির্ময় দুটো চোখ। লোকটার সামনে সাদা ধবধবে এক টুকরো কাপড় বিছানো। সেই কাপড়ের উপরে লাল, নীল, সাদা, হলুদ বিভিন্ন রঙের ছোট-ছোট শিশি সাজানো। শিশিগুলোর মুখ ছিপি দিয়ে আটকানো। দেখে মনে হচ্ছে আতরের শিশি। হিন্দুদের রাস উৎসবের মেলায় কেউ আতর বিক্রি করতে এসেছে, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই শিশিগুলোতে কী?'

খসখসে গলায় উত্তর এল, 'সুবাস।'

'সুবাস! মানে সুগন্ধ! তা সুগন্ধই তো, না দুর্গন্ধ?' এই বলে নুয়ে একটা শিশি তুলতে গেলে, লোকটা আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'আপনি কি বিবাহিত না অবিবাহিত?'

'অবিবাহিত!'

'প্রেমিকা আছে?'

এবার আমি কিছুটা চটে গেলাম। কঠিন গলায় বললাম, 'আবোল-তাবোল এসব কী জিজ্ঞাসা করছেন?'

'এই শিশিগুলোর প্রতিটায় ভিন্ন-ভিন্ন সুবাস। আর প্রতিটা সুবাসের বিশেষ-বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে।'

'দয়া করে একটু খুলে বলুন!'

লোকটা আমার দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলতে শুরু করলেন, 'আপনি যদি বিবাহিত হতেন,' আঙুল তুলে লাল রঙের একটা শিশি দেখিয়ে, 'তা হলে আপনাকে ওই শিশির সুবাস নিতে বলতাম। কারণ ওই শিশিতে যে সুবাস রয়েছে তা গায়ে মেখে কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে রাত্রি যাপন করে তা হলে তারা দু'জনেই এমন সুখ পাবে যা তারা জীবনেও পায়নি।'

নীল রঙের একটা শিশির দিকে আঙুল তুলে,'এই শিশির সুবাস কেউ গায়ে মেখে কোন মেয়েকে গিয়ে "ভালবাসি" বললে, সাথে-সাথে সেই মেয়ে তার প্রেমে পাগল হয়ে যাবে।'

সবুজ রঙের একটা শিশি দেখিয়ে, 'এই সুবাস গায়ে মাখলে পৃথিবীর সমস্ত জন্তু-জানোয়ার তার বশ হয়ে যাবে। তা বাঘ-সিংহই হোক আর বিষাক্ত সাপই হোক।'

গোলাপি রঙের শিশি দেখিয়ে,–'মাঝ রাতে এই সুবাস গায়ে মাখলে পরীস্থান থেকে দলে-দলে পরীরা ছুটে আসবে। তবে খুব সাবধান! অপবিত্র অবস্থায় থাকলে বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

রোগ সারাবার, ব্যবসায় উন্নতি করার, অনিদ্রা দূর করবার, সুন্দর স্বর্গীয় স্বপ্ন দেখবার—এ ধরনের বিভিন্ন সমস্যার জন্য বিভিন্ন রঙের শিশির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন সুবাসওয়ালা। যত্ত সব বুজরুকি!

রং-বেরঙের শিশির সারির এক কোনায় মিশমিশে কালো রঙের একটা শিশি রয়েছে। সেই শিশিটার সাথে এখন পর্যন্ত আমার পরিচয় হয়নি। কালো শিশিটা দেখিয়ে বললাম, 'ওই শিশিতে কী ধরনের সুবাস?'

সুবাসওয়ালা এবার যেন কেমন একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। থমথমে গলায় বললেন, 'রাত যখন ঠিক বারোটা তখন এই সুবাস গায়ে মাখলে মৃত আত্মারা এসে দেখা দেবে। অবশ্য ব্যবহারের প্রথম দিকে নিকট আত্মীয়, প্রিয়জন, পরিচিতজন কেউ মারা গিয়ে থাকলে, তাদের আত্মা এসে দেখা দেয়।'

'নিকট আত্মীয়ের আত্মা এসে দেখা দেয়' সুবাসওয়ালার এই কথাটা শুনে আমার হৃদয়ে সূক্ষ্ম খোঁচা অনুভব করলাম। খুব ছোট সময় আমার একমাত্র মামাকে হারিয়েছিলাম। মামার চেহারাও এখন আর ঠিক মত মনে করতে পারি না। মামার কথা ভাবলে ভাসা-ভাসা মনে পড়ে, এক বৃষ্টির দিন মামা আমাকে স্কুল থেকে আনতে গেলেন। গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল তখন। মামা তাঁর ঘাড়ের উপর আমাকে বসিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। আমি মামার মাথার কোঁকড়ানো চুল মুঠো করে ধরে শক্ত ভাবে বসে আছি। কী আনন্দ মনে, সবার চেয়ে উঁচুতে আমি!

বেশ কয়েক বছর আগে বিনা নোটিশে বাবাও চলে গেলেন। বাবা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সহকারী রেজিস্ট্রার ছিলেন। সেই সুবাদে তাঁকে ঢাকা থাকতে হত। মাসে একবার এসে দুই-তিন দিন থেকে চলে যেতেন। এই সময়ে আমাদের প্রয়োজনীয় বাজার-সদাই করে দিতেন। বাজারে যেতেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে। যেহেতু তাঁর দূরে থাকতে হয় তাই আমাকে বাজার করা শিখাতে চাইতেন। মাছের বাজারে ঘোরাঘুরির এক পর্যায়ে বাবা আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলতেন, 'তোর কী মাছ খেতে ইচ্ছে করছে?' বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে আমি নিজেই বাজার করি। মাছের বাজারে ঘুরে-ঘুরে মাছ পছন্দ করি। কিন্তু বহুদিন হয়ে গেল কেউ আর আমাকে মমতা ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে না, 'তোর কী মাছ খেতে ইচ্ছে

করছে?'

সুবাসওয়ালাকে নরম গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'কত দাম ওই কালো শিশির সুবাসের?'

'বিশ টাকা।'

'মাত্র বিশ টাকা! এত মূল্যবান জিনিসের দাম মাত্র বিশ টাকা?' মনে-মনে ভাবি যতসব বুজরুকি আর ভণ্ডামি, মানুষের আবেগ নিয়ে ব্যবসা।

আমার প্রশ্ন শুনে সুবাসওয়ালা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসি দিলেন। তাঁর হাসি দেখে আমার পিলে চমকে উঠল। মনে হলো, এই হাসির উৎস চেনা পৃথিবীর নয়, কোন অদেখা ভুবনের।

শেষ বিকেলে সুমনকে পেয়ে গেলাম। দিঘির দক্ষিণ দিকের একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে বসে এক রূপবতীর সঙ্গে বাদাম চিবুচ্ছে। আমাকে দেখেই লাজুক হাসি দিয়ে বলল, 'এতক্ষণ মনে-মনে তোকেই খুঁজছিলাম।' চেহারায় কেমন অনুতপ্ত ভাব ফুটিয়ে তুলল। আমি কিছুই বললাম না, শুধু কটমট করে তাকালাম। সন্ধ্যা হয়ে আসছে বলে রূপবতীও যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

রূপবতী বিদেয় হওয়ার পর সুমন বলল, 'চল, আপার বাসায় যাই।'

আমি বললাম, 'অসম্ভব!' সুমনের বড় বোন নূপুর আপার শ্বশুরবাড়ি বানারীপাড়ায়। প্রায় সাত-আট কিলোমিটার দূরে। এখন সেখানে গেলে রাত সেই বাড়িতেই কাটাতে হবে।

সুমন আমতা-আমতা করে বলল, 'এতদূর আসার পরেও আপার সাথে দেখা না করে চলে গেলে আপা শুনলে তো কষ্ট পাবে!'

'বাড়িতে মা একা। এখন নূপুর আপার বাড়িতে গেলে রাতে ফেরা যাবে না। তা হলে তুই-ই ভেবে দেখ, আমার পক্ষে কি যাওয়া সম্ভব?'

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো–সুমন একা বানারীপাড়া যাবে, আমি ফিরে আসব। কিছুক্ষণ পর নতুল্লাবাদগামী একটা লোকাল বাসে উঠে পড়লাম।

রাত বারোটা। আমি আমার ঘরে। সুবাসওয়ালার কাছ থেকে কিনে আনা কালো শিশিটার ছিপি খুললাম। অদ্ভুত একটা গন্ধ নাকে লাগল, হাসনাহেনা ফুলের গন্ধের সাথে কাঠ পোড়া ঝাঁঝাল গন্ধ মেশালে যেমন গন্ধ হবে, কিছুটা সেরকম মনে হচ্ছে। শিশির ভিতরে আতরের মতই ঘোলাটে এক ধরনের তরল। এক টুকরো তুলোয় শিশি থেকে খানিকটা তরল মাখিয়ে আমার দু'হাতের পিঠে ঘষে লাগালাম। সমস্ত ঘর হাসনাহেনা ফুল আর কাঠ পোড়া ঝাঁঝাল গন্ধে ভরে গেল।

মনের ভিতরে বিচিত্র সব ভাবনা এসে ভর করল। এই গন্ধেই কি আকৃষ্ট হয়ে আত্মারা চলে আসবে! ভাল কথা, সুবাসওয়ালাকে তো জিজ্ঞেস করা হয়নি, সুবাস গায়ে মাখার পর ঘর কি অন্ধকার করে ফেলতে হবে! নাকি

আলোতেও আত্মারা আসবে! ভূত, প্রেত, আত্মারা অন্ধকার পছন্দ করে এই ভেবে আলো নিভিয়ে, বিছানায় শুয়ে আবার ভাবতে শুরু করলাম, আত্মা কী? কোথায় আত্মার বাস? প্রতিটা জীবিত প্রাণীর মধ্যেই সুপ্ত অবস্থায় যে সত্তা বিরাজ করে সেটাই তো আত্মা। যখন সেই আত্মা দেহ ছেড়ে চলে যায় তখন সেই নিথর দেহটাকে আমরা মৃতদেহ বলি, লাশ বলি। কোথায় চলে যায় এই আত্মা? হয়তো অপার্থিব কোন জগতে!

ভাবতে-ভাবতে কখন যেন গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম। দরজায় অনবরত কড়া নাড়াবার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম জড়ানো গলায় প্রশ্ন করলাম, 'কে?'

উত্তর এল, 'আমি।'

গলা শুনেই বুঝলাম কে এসেছে। আলো জ্বেলে দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি দুটো বেজে পাঁচ মিনিট। এত রাতে সুমন এসেছে! কী ব্যাপার!

দরজা খুলে দেখি বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে সুমন দাঁড়িয়ে আছে। রেশমি কোমল চুলগুলো এলোমেলো হয়ে কপালের উপর ছড়িয়ে রয়েছে। চেহারায় কেমন বিষণ্ন ছাপ। মেলায় যাওয়ার সময় গায়ে থাকা কফি কালারের ফুলহাতা শার্ট আর ব্লু জিন্স এখনও পরনে। শার্টের পকেটের কাছটা ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে। শার্টের বুকের কাছের দুটো বোতামও নেই। প্যান্টের হাঁটুর কাছটা ছিঁড়ে ছিবড়ের মত সুতো বেরিয়ে আছে।

আমি উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'এ কী অবস্থা তোর!'

সুমন ম্লান হাসি দিয়ে বলল, 'ছোট-খাট একটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছি। উদ্বিগ্ন হবার কিছুই নেই।'

'ব্যথা পাসনি?'

'অ্যাক্সিডেন্ট করে প্রথমে যখন মোটরসাইকেল নিয়ে পড়ে যাই তখন প্রচণ্ড ব্যথা লাগছিল। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করি কিছুক্ষণ পরে কোন ব্যথা নেই!'

'কই দেখি, কী রকম ক্ষত হয়েছে।'

'আরে, দেখতে হবে না! হাঁটুর চামড়া সামান্য একটু ছড়ে গিয়েছে, অ্যান্টিসেপটিক লাগিয়ে নিয়েছি, এখন সব ঠিক।'

'তা তোর আর নূপুর আপার বাড়িতে যাওয়া হয়নি?'

'কী করে যাব, মোটরসাইকেলটা বিকল হয়ে গেল আর শার্ট-প্যান্টের যে অবস্থা! মোটরসাইকেলটা সামসু মিয়ার গ্যারেজে রেখে একটা বাস ধরে চলে এলাম।'

সুমন যেন দম নেওয়ার জন্য একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল, 'এত রাতে বাসায় যাওয়া সম্ভব নয়। ইদানীং বাবার ব্লাড প্রেশার খুব

বেড়েছে। এত রাতে, এই অবস্থায় বাসায় গেলে, বাবা-মা ঘুম থেকে উঠে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে। তাই তোর কাছে থাকতে এসেছি।'

'তা হলে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? শার্ট-প্যান্ট ছেড়ে আমার একটা লুঙ্গি পরে হাত-মুখ ধুয়ে আয়। রাতে কিছু খাওয়া হয়েছে?'

দেখা গেল, লুঙ্গি পরে হাত-মুখ ধোয়ার ব্যাপারে সুমনের কোন আগ্রহই নেই। ক্লান্ত ভঙ্গিতে বিছানায় বসে বলল, 'মোহনা হোটেল থেকে মোরগ পোলাও খেয়ে এসেছি।'

সুমন আর আমি বিছানায় শুয়ে পড়েছি। আলো নিভানো। খাটের ডান পাশে শুয়েছে সুমন। ও শার্ট-প্যান্ট পরা অবস্থায়ই শুয়ে পড়েছে।

আমি নরম গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'বিকেলে যে রূপবতীর সাথে বাদাম চিবাচ্ছিলি, তার নাম কী?'

ক্লান্ত গলায় উত্তর দিল, 'সুমনা।'

'তা সুমনার সাথে সুমনের মন দেওয়া-নেওয়া হলো, নাকি বাদাম চিবানো পর্যন্তই শেষ?'

ভারী নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'জানি না।'

আমি আর সুমনকে ঘাঁটালাম না। ভাবলাম ও বোধ হয় খুব ক্লান্ত, ওকে ঘুমোতে দেই। শুধু-শুধু বেচারাকে বিরক্ত করে লাভ নেই।

ভোরবেলা মায়ের বিলাপের মত কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। তড়াক করে উঠে, বিছানা থেকে নেমে মায়ের কাছে ছুটে গেলাম।

'মা, তুমি এভাবে কাঁদছ কেন?' ভিতু গলায় জিজ্ঞেস করলাম।

'ওরে, সর্বনাশ হয়ে গেছে রে! সর্বনাশ!' ডুকরে-ডুকরে কেঁদে উত্তর দিল মা।

উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'কী হয়েছে, মা! কী হয়েছে! বলো আমায়!'

'ওরে, সুমন আর নেই। ও আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। গতরাতে ও অ্যাক্সিডেন্ট করেছে।'

'তুমি কোন্ সুমনের কথা বলছ?'

'আমাদের সুমন! তোর বন্ধু সুমন!' ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মা।

কথাটা শোনার পর মনে হলো, কেউ আমার গায়ে এক বালতি ফুটন্ত গরম পানি ঢেলে দিয়েছে। আমার বুকের ভিতরটা জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে। কাঁদতে পারছি না আমি। চোখ-মুখ দিয়ে গরম হলকা বেরুচ্ছে। মা এসব কী আবোল-তাবোল কথা বলছে! গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে মোটরসাইকেল নিয়ে মাধবপাশার দুর্গারসাগরের পূর্ব পাড়ের রাস্তার মোড় ঘোরার সময় নাকি সুমন একটা ট্রাকের সাথে অ্যাক্সিডেন্ট করে। স্থানীয় লোকজন অচেতন অবস্থায় সুমনকে শের-ই-বাংলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না, রাত ১০ টা ১০ মিনিটে সুমন মারা যায়। ওর

পকেটে থাকা কলেজ আইডি কার্ড দিয়ে ঠিকানা খুঁজে বের করে, ভোরবেলা ওদের বাসায় খবর পাঠানো হয়। আমি এসব কথা বিশ্বাস করি না! গতরাতে সুমন আমার সঙ্গে ঘুমিয়েছে। আমার বিছানার ডান পাশের বালিশটা, যে বালিশটায় ও শুয়ে ছিল, সেটা এখনও ঢালু হয়ে রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি না সুমন মারা গিয়েছে! সুমন যদি সত্যিই মারা গিয়ে থাকে, তা হলে গতরাতে ২টা ৫ মিনিটে কে এসেছিল আমার কাছে? তা হলে কি সুবাসওয়ালার কাছ থেকে কিনে আনা কালো শিশির সুবাস গায়ে মাখায় সুমনের আত্মা এসেছিল?

শের-ই-বাংলা হাসপাতালের মর্গের ট্রলির উপরে সুমনের দেহটা পড়ে আছে। অ্যাক্সিডেন্টের মৃত্যু বলে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ লাশের পোস্ট মর্টেম না করে নিতে দেবে না। সুমনের গায়ে সেই কফি কালারের শার্ট আর ব্লু জিন্স। শার্টের পকেটের কাছটা ছেঁড়া আর প্যান্টের হাঁটুর কাছটাও ছিঁড়ে ছিবড়ের মত সুতো বেরিয়ে রয়েছে। রাতে ও যে অবস্থায় আমার কাছে এসেছিল ঠিক তেমন! শুধু বুকের কাছে শার্টের ছেঁড়া জায়গাটা রক্তে মাখামাখি হয়ে চপচপে হয়ে আছে। হাঁটুর কাছে প্যান্টের ছেঁড়া জায়গাটাও ছোপ-ছোপ রক্তের দাগে একাকার। রাতের মতই রেশমি চুলগুলো এলোমেলো ভাবে কপালে বিছানো! ঠোঁটের কোণে জমে থাকা রক্তে চার-পাঁচটা পিঁপড়া মুখ ডুবিয়ে রয়েছে। গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছে সুমন। আর কখনওই ওকে জাগানো সম্ভব নয়।

আসরের নামাজের পরে সুমনের লাশ দাফন করা হয়ে গেলে আমি চলে আসি দুর্গারসাগরের পশ্চিম পাড়ের সেই রাসউৎসবের মেলায়। আজও মেলা বসেছে। সারা মেলার মাঠ তন্নতন্ন করে খুঁজে ফিরি সেই সুবাসওয়ালাকে। কোথাও তাকে পাই না। আমার পকেটে সেই কালো শিশিটা। যে শিশির প্রায় গলা পর্যন্ত ভরা তরল সুবাস রয়েছে এখনও। এই সুবাস গায়ে মাখলে মৃত প্রিয়জনদের আত্মা এসে দেখা দেবে। কিন্তু সেটা আর আমি চাই না। এক সময় যে প্রিয়জনদের সাথে সুখ-দুঃখের কত দিন-রাত্রি পার করেছি, আজ তাদের মৃত আত্মার দেখা পেয়ে কোন লাভই নেই। তাতে কষ্টটা বরং আরও বেড়ে যাবে—একটুও কমবে না। এসেছিলাম শিশিটা সুবাসওয়ালাকে ফেরত দেবার জন্য। সন্ধ্যা মিলিয়ে যাবার পরেও তাঁর দেখা পেলাম না। শিশিটা ছুঁড়ে মারলাম দিঘির জলে। ক্লুপ করে শব্দ তুলে ডুবে গেল শিশিটা।

নতুল্লাবাদগামী একটা বাসে উঠে পড়লাম। বাসের সিটে বসেও দিঘির টলমলে জলে পূর্ণিমার চাঁদের প্রতিবিম্বের লাফালাফি দেখা যাচ্ছে। বাস ছুটতে আরম্ভ করল, ঠিক সেই মুহূর্তে চোখে যেন বিভ্রম দেখলাম। দেখলাম, ছায়ার মত কালো একটা অবয়ব শূন্য থেকে ভেসে-ভেসে নেমে, দিঘির জলে মিলিয়ে গেল। অবয়বটা ছিল সেই অদ্ভুত চেহারার সুবাসওয়ালার।

ইতিকথা

পাঠকদের অনেকেরই হয়তো মনে আছে, ২০০০ সালে একটা গুজব উঠেছিল, সে বছরের পঞ্চম মাসের পঞ্চম তারিখে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। অর্থাৎ মে মাসের ৫ তারিখ। এই গুজবে অনেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। আমার বন্ধু সুমনও বেশ উদ্বিগ্ন হয়েছিল। মে মাসের ৪ তারিখ সকালে সে নিজের হাতে বাজার করে এনেছিল। তরিতরকারি, ইলিশ মাছ এবং দুটো মুরগি। তার মায়ের হাতে বাজার দিয়ে বলেছিল, 'মা, মোরাগ পোলাও, সরিষা ইলিশ আর মুরগির চামড়া পাখনা দিয়ে মুগ ডাল রান্না করবে। কাল যদি সত্যিই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায় তবে তার আগে পছন্দের খাবারগুলো শেষবারের মত খেয়ে নিতে চাই।' সুমনের মা তাঁর ছেলের পছন্দের খাবার রান্না করে রাত ১০টা ১০ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ছেলে আর ফিরে আসেনি!

মে মাসের ৫ তারিখে পৃথিবী ধ্বংস হয়নি। ভোর বেলার সূর্যটা ঠিক আগের মতই সোনালি আলো ছড়িয়ে জেগে উঠেছিল। কিন্তু সুমন আর জেগে ওঠেনি। সে তখন ঘুমে-ঘুমে পাড়ি দিচ্ছিল অদেখা ভুবনের পথ।

মনসার অভিশাপ

দুর্গাপূজার অষ্টমীর রাত। রাত প্রায় সোয়া বারোটা। বৃহত্তর দুর্গাপুরের দেড়শো বছরের পুরানো ঐতিহ্যবাহী পূজা মণ্ডপের পূজা দেখতে আসা দূর-দূরান্তের গ্রাম-গঞ্জের লোকজন এক-এক করে বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে।

তিমিরকাঠী গ্রামের সদরুল। বয়স বাইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে। মাঝারি উচ্চতা। অবিবাহিত। রোদে পোড়া বাউণ্ডুলে চেহারা। এমনিতে সে প্রতিটা সন্ধ্যা পার করে গ্রামের সমবয়সী বখাটে ছেলে-ছোকরাদের সাথে তাস পিটিয়ে আর গাঁজার কলকে টেনে। কিন্তু আজ বিকেলে সে গিয়েছিল দুর্গাপুরের পূজা দেখতে। তার বয়সী মুসলমান ঘরের ছেলে-ছোকরাদের পূজা দেখতে যাওয়ার পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য থাকে সেজে-গুজে পূজা দেখতে আসা হিন্দু রূপবতী মেয়েদের দু-চোখ ভরে দেখা। আর ভাগ্য ভাল থাকলে ভিড়ের মধ্যে সামান্য স্পর্শ পাওয়া।

সদরুল রিকশা ভ্যানে করে দুর্গাপুর থেকে কুমারখালী বাজারে এসে পৌঁছয়। দুদু মিয়ার চায়ের দোকানে বসে পর-পর দুই কাপ মালাই চা খেয়ে বাড়ির উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করে। কুমারখালী বাজার থেকে ইঁট বিছানো যে রাস্তা তিমিরকাঠী গ্রামের মধ্যে গিয়েছে, সেই রাস্তা ধরে না গিয়ে সে যেতে শুরু করে জঙ্গলের পথ ধরে। জঙ্গলের পথ ধরে যাওয়ার পিছনে তার দুটো উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমত, এই পথে খুব অল্প সময়ে বাড়ি যাওয়া যাবে। আর পকেটে থাকা পাঁচটা গাঁজা ভরা বিড়ি নিরিবিলিতে আয়েশ করে টানা যাবে।

বিড়ি ধরিয়ে, ভারী ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে নির্জন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দ্রুত পা ফেলে হাঁটতে থাকে সদরুল। চারদিকে লতা, গুল্ম, ঝোপঝাড়, কোথাও-কোথাও অবহেলা আর অযত্নে বড় হওয়া গাব গাছ, সুপারি গাছ, তালগাছ আর বাঁশঝাড়। রাতের বেলা সাধারণত লোকজন এই পথে যাওয়া-আসা করে না। কারণ এই জঙ্গলটায় অনেক বিষধর সাপের বাস। গত বছরও দক্ষিণ পাড়ার বেলায়েত চাচাকে এই পথ ধরে যাওয়ার সময় সাপে কাটে। নামি-দামী ওঝা এনেও শেষ রক্ষা হয় না। কাতরাতে-কাতরাতে তিনি মারা যান।

পথের মাঝে সন্দেহজনক কিছু রয়েছে মনে হলে সদরুল তার নকিয়া এগারোশো মডেল মোবাইল সেটটার ছোট্ট টর্চটা জ্বেলে দেখে নিচ্ছে। হঠাৎ একটা বাঁশঝাড়ের গোড়ায় ঝোপের মধ্যে তার চোখ আটকে যায়। কিছু একটা উজ্জ্বল দ্যুতি ছড়াচ্ছে সেখানে। ভীত পায়ে আলোর উৎসের কাছে

কিছুটা এগিয়ে গিয়ে মোবাইলের ছোট্ট টর্চের আলো ফেলে দেখতে পায় মেয়েদের কানের দুলের মত একটা গয়না পড়ে আছে। সাপের ফণা তোলার মত একটা আংটার দু'পাশে দুটো গোল বল। আর সেই বলের চারপাশে ছোট-ছোট উজ্জ্বল পাথর বসানো। গয়নার মত সদরুলের চোখ দুটোও চকচক করে উঠল। মুহূর্ত সময়ও দেরি না করে গয়নাটা তুলে পকেটে রাখল।

বিকেলে জঙ্গলের পথ ধরে পূজা দেখতে যাওয়া কোন হিন্দু বনেদি ঘরের মেয়ে মানুষের গয়না হয়তো খুলে পড়েছে। এখন বাড়ি গিয়ে গয়না হারানোর ব্যাপারে টের পেয়ে নিশ্চয়ই সে বাড়ির লোকজন খুঁজতে আসবে--এই ভেবে সদরুল কিছুটা পূর্ব দিকে এগিয়ে কৃষ্ণার খালের সাঁকো পার হয়ে ইঁট বিছানো রাস্তায় উঠে আসে।

মনের ভিতর চাপা আনন্দ নিয়ে ঝড়ের গতিতে সদরুল ইঁট বিছানো রাস্তা দিয়ে বাড়ির দিকে এগোতে থাকে। মাঝিবাড়ির সামনে শিমুল গাছটার নীচে এসে সে থমকে দাঁড়ায়। কালো পোশাকে বরফ সাদা রঙের একটা মেয়ে দু'হাত উঁচিয়ে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্য মেয়েটার গায়ে রঙের এই ভিন্নতা সদরুলের নজরে পড়ে না!

চড়া গলায় সদরুল জিজ্ঞেস করে, 'কেডা তুই! এই আন্ধারে ভূতের লাহান দাঁড়াইয়া রইছ?'

মেয়েটা অপার্থিব গলায় বলে উঠল, 'জঙ্গলের মধ্যে যেটা পেয়েছিস, সেটা আমাকে দিয়ে দে। ওটা আমার।'

'কইলেই হইল ওনার! কোন প্রেমাণ আছে? মাইয়া মানুষ রাইত-বিরাইতে ত্যক্ত না কইরা বাড়িতে চইলা যা। নাইলে এমন কিছু কইরা দিমু... শেষে গলায় দড়ি দেওন ছাড়া উপায় পাবি না।'

ভোজবাজির মত মেয়েটার পিছন থেকে আরও দুটো মেয়ে উদয় হলো। প্রথম মেয়েটার মতই একই পোশাক, একই গায়ের রং। তিনজনই আগুন জ্বলা চোখে সদরুলের দিকে এগোতে থাকে। সদরুল শার্টের বুক পকেটে রাখা গয়নাটা চেপে ধরে পিছন দিকে সরতে-সরতে বিভিন্ন অশ্লীল গালি-গালাজ শুরু করে। উত্তেজনায় হয়তো সদরুল তখন লক্ষ করেনি—তিনটি মেয়ের চেহারাও একই!

হঠাৎ মেয়ে তিনজন থমকে দাঁড়িয়ে সমস্বরে বলে উঠল, 'আজ রাত পোহাবার আগে যা পেয়েছিস, যেখানে পেয়েছিস, সেখানে রেখে না আসলে তোর বংশ নির্বংশ হয়ে যাবে। আর কথা মত কাজ করলে অঢেল সম্পদ উপহার দেব।'

কথা শেষ হওয়ার পর আচমকা তিন জনই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। পিছন থেকে ভেসে এল, 'ওই, সদরুল্যা, এহানে বইয়া একলা-একলা কারে

গালিগালাজ করোস?'

সদরুল ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখে টর্চ হাতে সবুর বেপারী দাঁড়িয়ে আছেন। অত্যন্ত দুষ্ট চরিত্রের লোক। আসল ঘটনা চেপে যেতে হবে।

'না... ওই বাদুড়রে গালি দিচ্ছি। শিমুল গাছটার নীচে আইলাম পর গায়ে হাইগ্যা দিছে।'

সদরুল সবুর বেপারীকে অনুসরণ করতে করতেই বাড়িতে পৌঁছে গেল। ঘরের দরজায় কয়েকবার কড়া নাড়বার পর ভাবির গলা শোনা গেল, 'ওই... কেডা?'

'ভাবি, মুই সদরুল।'

সদরুলের বড় ভাবি সালমা। সদরুলকে দু'চোখে দেখতে পারে না। রোজ রাতে নেশা-ভাঙ করে ঘরে ফেরায় সে খুবই ক্ষিপ্ত। সদরুলের বড় ভাই গত বছর সিঙ্গাপুর গিয়েছে। স্বামী দেশে না থাকায় এমনিতেই তার মন সব সময় দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। শুনেছে ওই সব দেশে গেলে পুরুষ মানুষের চরিত্র নাকি আর চরিত্র থাকে না!

সালমা দরজার ছিটকিনি খুলে দেওয়ার পর সদরুল নিজেই কপাটে ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকে, ভাবির দিকে তাকিয়ে ভয় পাওয়া গলায় বিকট শব্দে চিৎকার শুরু করে, 'সাপ... সাপ... কাল সাপ... কালনাগিনী...' সদরুলের চোখ তার ভাবিকে দেখছে–রাজ গোখরোর মত বড়সড় কালো রঙের একটা সাপ ফণা তুলে রয়েছে।

সদরুলের কাণ্ড দেখে প্রথমে সালমা খুবই হতভম্ব হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর যখন বুঝতে পারে তাকে দেখেই সদরুল সাপ-সাপ বলছে, তখন সদরুলের চেয়েও তীক্ষ্ণ গলায় পাশের কামরায় ঘুমানো শাশুড়িকে উদ্দেশ্য করে, 'ও, আম্মা, দেইখা যান... সদরুল্যা গাঞ্জা টাইন্যা আইয়া কী শুরু করছে... মুই বোলে কালনাগিনী!!! ও, আম্মা, এহনো আহেন না ক্যান...সদরুল্যা মোরে মারবার লাইগ্যা লাডি হাতে লইছে...'

সত্যিই সদরুল দরজার পাশে থাকা গাব গাছের একটা মোটা লাঠি হাতে নিয়ে সালমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সদরুলের বিধবা মা, ষাট বছরের বৃদ্ধা ও ঘর থেকে রুদ্ধশ্বাসে কাঁপতে-কাঁপতে ছুটে এসে বলে, 'ও বউ, কী হইছে... সদরুল্যা হারমজাদা কী করছে...?'

সদরুল তার মাকে দেখে হাত থেকে লাঠি ফেলে দিয়ে আরও ভয়ঙ্কর ভাবে বলে ওঠে, 'সাপ... সাপ... দুইডা সাপ...' বলে চিৎকার করতে-করতে ঘরের বাইরে ছুটে গিয়ে, উঠানের মধ্যে ধপাস করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।

সদরুলের চোখ তার মাকেও দেখেছে–আর একটা সাপ ফণা তুলে রয়েছে। মা ও ভাবি–দুটো বড়-বড় সাপকে এক সাথে ফণা তুলে তার দিকে

এগোতে দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে, হাতের লাঠি ফেলে, ছুটে ঘরের বাইরে উঠানে গিয়ে দেখে, উঠান ভরতি হাজার-হাজার সাপ কিলবিল করছে। সাপগুলো হিসহিস শব্দ তুলে হিংস্র ভাবে তার দিকে তেড়ে আসছে। প্রচণ্ড ভয়ে তখন সে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায়।

উঠানে পড়ে থাকা সদরুলকে ছুঁয়ে দেখা যায় তার গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। চেঁচামেচিতে আশ-পাশের বাড়ি-ঘর থেকেও দু-চারজন লোক ছুটে এসেছে। সবাই মিলে ধরাধরি করে সদরুলকে ঘরে নিয়ে গিয়ে, বিছানায় শুইয়ে, মাথায় পানি ঢালা এবং চোখে-মুখে পানি ছিটানোর এক পর্যায়ে তার জ্ঞান ফিরে আসে। জ্ঞান ফিরে পাবার পর চোখ খুলেই আবার সাপ-সাপ বলে চিৎকার শুরু করে। সদরুলের চোখ আশ-পাশের সব কিছুকেই সাপ রূপে দেখছে। বিছানার পাশে বসা-দাঁড়ানো মা, ভাবি, পাশের বাড়ির লোকজন এমন কী বিছানার কাঁথা-বালিশ সবই তার চোখে সাপের রূপ ধরেছে।

সাপ-সাপ বলে চিৎকার করা পাগলপ্রায় সদরুলকে সবাই মিলে চেপে ধরে বুঝাতে থাকে, 'তুই যা দেখছিস ভুল দেখছিস, কোনহানে কোন সাপ নাই... তোর কী হইছে খুইল্যা ক... কোতায় ভয় পাইছোস...?'

সদরুলও এতক্ষণে কিছুটা বুঝতে পেরেছে, সে চোখে ধাঁধা দেখছে। তাই সে চোখ বন্ধ করে জঙ্গলে সেই গয়না পাওয়ার ঘটনা এবং পাওয়ার পর কী ঘটেছে সব খুলে বলল। বলা শেষ হলে, শার্টের বুক পকেট থেকে সেই গয়নাটা বের করল। ঘরে একটা মোম জ্বলছিল। মোমের মৃদু আলোতে নিমেষেই গয়নার উজ্জ্বল দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ল গোটা ঘরে। উপস্থিত সবাই চোখ ছানাবড়া করে অবাক গলায় বলে উঠল, 'এইডা কী জিনিস!!!'

বাতাসের গতিতে সমস্ত গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল এই ঘটনা। গভীর রাতেও অনেক লোকজনে ভরে গেল সদরুলদের ঘর, বসার ঘর, উঠান। প্রত্যেকেই সেই আকর্ষণীয় গয়নাটা একবার দেখতে চায়। হিন্দু বাড়ি থেকে আসা এক বৃদ্ধা গয়নাটা দেখে আঁতকে উঠে বলল, 'ওরে অনর্থ হইছেরে... এ তো সর্পমাতা মনসা দেবীর অলংকার!!!... আইজ রাইতের মধ্যে দেবীর কথা মত এই অলংকার ফেরত দিয়া না আইলে, সদরুল তো মরবোই লগে গ্রামবাসীগো কী হইব তা ভগবানই জানেন!'

গ্রামের মুরব্বীরা মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন—আজ রাত পোহাবার আগেই সদরুল যেখান থেকে গয়নাটা পেয়েছে সেখানেই রেখে আসা হবে। কিন্তু কে যাবে! যে কোন একজনকে যেতে হবে। বেশি লোক গেলে মনসা দেবী আবার ক্ষিপ্ত হতে পারে! আলোচনার এমন পর্যায়ে শায়েস্তাবাদ থেকে খবর পেয়ে সদরুলের ভগ্নিপতি ইদরিস চলে আসে। অত্যন্ত ধূর্ত চরিত্রের লোক। গয়নাটা দেখার পর তার চোখ লালসায় চকচক করে ওঠে। মনে-

মনে ফন্দি আঁটতে শুরু করে, যে করেই হোক গয়নাটা হাতিয়ে নিতে হবে।

শেষ রাতের দিকে ইদরিসকেই দায়িত্ব দেওয়া হয় গয়না যথাস্থানে রেখে আসার। যেন মেঘ না চাইতে বৃষ্টি! ইদরিস সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। গয়না নিয়ে কুমারখালী বাজার থেকে ট্রলার যোগে সোজা সদরে চলে যায়। সদরের বড় একটা সোনার দোকানে গয়নাটা দেখালে দোকান মালিক বিস্মিত চোখে তৎক্ষণাৎ ইদরিসকে গয়নার বিনিময়ে পাঁচ লাখ টাকা দিতে রাজি হয়। কিন্তু দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন ইদরিস ভাবে, ঢাকা গেলে এই জিনিসের আরও অনেক বেশি দাম পাওয়া যাবে।

এদিকে সদরুলদের বাড়িতে যেন অভিশপ্ত ঝড় নেমে এসেছে। সকাল থেকে সদরুলের অবস্থা আরও ভয়াবহ। সাপ-সাপ বলে চিৎকার করতে-করতে একেবারে উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে, গ্রামের অনিল ডাক্তারকে ডেকে আনা হয়েছিল। ডাক্তার ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে বলে গিয়েছে যত দ্রুত সম্ভব উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যেতে।

সদরুলদের গোয়াল ঘরে দুটো দুধের গাভী ছিল। গাভী দুটোর দুটো বাছুরও ছিল। ভোরবেলা দেখা গেল চারটি জন্তুই মরে পড়ে রয়েছে। প্রত্যেকটি জন্তুর পায়ে সাপের ছোবলের দাগ। চোদ্দটা মুরগি ছিল। ভোরে খোপ খোলার পর দেখা গেল একটা মুরগিও বের হচ্ছে না। সব কটা মুরগি খোপের ভিতরে মরে পড়ে রয়েছে। এমনকী ঘরের পোষা বিড়ালটাও খাটের নীচে মরে পড়ে রয়েছে!

সদরুলের মা শুকনো উঠানে আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়ে ডান পায়ের হাঁটুতে প্রচণ্ড আঘাত পায়। আঘাত পাওয়া হাঁটুটা নীল হয়ে যায়। আশ্চর্য ব্যাপার হাঁটুর সেই নীলচে ভাব অতি দ্রুত সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে! তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরুতে থাকে এবং নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত। উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাবার আগেই অঘটন ঘটে যায়।

মা-ভাইয়ের দুর্ভোগের কথা শুনে সদরুলের বোন আকলিমা, (ইদরিসের বউ) শায়েস্তাবাদ থেকে টেম্পোতে চড়ে তিমিরকাঠী আসার পথে টেম্পো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদের মধ্যে উল্টে পড়ে। ঘটনাস্থলেই ঘাড় ভেঙে আকলিমা মারা যায়।

সদরুলের ভাবি সালমা, শাশুড়ির দাফন-কাফন হওয়ার আগেই ব্যাগ গুছিয়ে বাপের বাড়ি চড়ে যায়। বাড়িতে পড়ে থাকে অসুস্থ বিকৃত মস্তিষ্কের সদরুল একা।

৬-৭ দিন কেটে গেল। সদরুল এখন কিছুটা শান্ত। নির্জন প্রেতপুরীর মত বাড়িটা থেকে বিকটভাবে 'সাপ-সাপ' চিৎকারের শব্দ এখন আর তেমন পাওয়া যায় না। সদরুলদের পাশের বাড়ির লোকজন দুই বেলা গিয়ে সদরুলের খোঁজ-খবর নিয়ে আসে। খাবার-দাবার খাওয়াবার চেষ্টা করে।

কিন্তু সম্ভব হয় না, প্রতিটা খাবারের দিকে তাকিয়েই সদরুল হিসহিসে গলায় বলে ওঠে, সাপের বাচ্চা কিলবিল করছে। এখন আর তাকে বেঁধে রাখতে হয় না। লাল এক জোড়া পলকহীন চোখ নিয়ে সারাদিন বিছানায় মড়ার মত পড়ে থাকে। আর দিনে-দিনে তার শরীরটাও শুকিয়ে লিকলিকে হয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন সাপের মত! আজকাল তার গা থেকেও তীব্র আঁশটে গন্ধ পাওয়া যায়। ঠিক যেন সাপের গায়ের গন্ধ!

এমনি এক ভোরবেলা পাশের বাড়ির লোকজন সদরুলের খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে সদরুলের লতার মত দেহটা চিরনিদ্রায় শুয়ে আছে। মুখটা হাঁ হয়ে জিভ বেরিয়ে রয়েছে। জিভটা স্বাভাবিকের চেয়ে লম্বা এবং কালচে রঙের। তার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার জিভটা মাঝখান থেকে চেরা। লাল চোখ জোড়া আগের মতই পলকহীন, স্থির। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে কেমন দৃষ্টিভ্রম হয়। মনে হয় একটা মৃত সাপ পড়ে রয়েছে!

অনেক দিন হলো সদরুলদের বাড়িটা পোড়োবাড়ির মত পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। বর্তমানে বাড়িটা গ্রামবাসীদের ভয়ের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। রাতের বেলা তো দূরে থাক দিনের বেলাও কেউ ও বাড়ির ভিতরে ঢোকে না। সমস্ত বাড়ির এখানে-সেখানে বিষাক্ত সব সাপের আনাগোনা। এমনকী বাড়িটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ও প্রকট ভাবে সাপের গায়ের আঁশটে গন্ধ পাওয়া যায়! কেউ কেউ তো বলে, গভীর রাতে, কালো-মোটা অজগরের মত বড় একটা সাপ, অঙ্গারের মত লাল দুটো চোখ নিয়ে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায়! আর একটু পর পর তার কালো জিভটা লক-লক করে ওঠে!

ও বাড়িতে এ সব সাপের আবাসস্থলের খবর পেয়ে, দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে বড়-বড় সাপুড়েরা এসেছিল সাপ ধরতে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছে। যাওয়ার সময় বলে গিয়েছে, বস্তুত ওগুলো কোন সাপ নয়! ওগুলো অলৌকিক জগতের কায়াহীন জীব। মানুষকে মায়াজালে বন্দি করে চোখে সাপ রূপে দেখা দেয়।

সদরুলের ভগ্নীপতি ধূর্ত ইদরিস এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বেডে শুয়ে সাপের মত পলকহীন চোখ নিয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। সর্বনেশে সেই মহামূল্যবান গয়না নিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে সে ঢাকা গিয়েছিল। পুরানা পল্টন থেকে রাস্তা ক্রস করে বায়তুল মোকাররমের সোনার দোকানগুলোর দিকে যাওয়ার সময় যাত্রী বোঝাই একটা মাইক্রোবাস তাকে ধাক্কা মেরে চলে যায়।

অ্যাক্সিডেন্টের পর অজ্ঞান হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে সে দেখতে পায়, বোরখার মত কালো পোশাক পরা একটা মেয়েমানুষ, যার গায়ের রং বরফের মত সাদা, মূল্যবান সেই গয়নাটা নিয়ে চলে যাচ্ছে। যাওয়ার আগে

অপার্থিব, অদ্ভুত সেই মেয়েমানুষটা শরীর হিম করা ক্রুদ্ধ একটা হাসি দেয়।

[এই কাহিনি আমি শুনেছি হানিফ মোল্লা নামে তিমিরকাঠী গ্রামের এক অশিক্ষিত যুবকের কাছ থেকে। যে যুবক, পঞ্জিকাকে বলে পুঞ্জিকা, হাসপাতালকে বলে হোসপাতাল, আর বিখ্যাত লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে বলে সোনাল গঙ্গোপাদা। অতিশয় সহজ-সরল টাইপের লোক। তার কাছ থেকে এই কাহিনি শোনার পর আমার তেমন বিশ্বাস হয়নি, এখনও যে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছি তা জোর দিয়ে বলব না। ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য, তিমিরকাঠী গ্রামের বদমেজাজি, রুক্ষ স্বভাবের জহিরুল নামের সামান্য পরিচিত আরেক যুবককে ফোন করলাম। সে জানাল, 'ঘটনা এক্কেবারেই হাছা।' পুরো কাহিনি সেল ফোনে আবার আমাকে শুনতে হলো। কাহিনি শেষ করে জহিরুল বলল, 'আফজাল ভাই, এই ঘটনা যদি কেউ মিছা কয় তাইলে হের মুহে মুই "ইয়ে" করি।'– লেখক।]

পরী

এক

মাঘ মাসের কুয়াশা ঢাকা নিশুতি রাত। নির্জন নিস্তব্ধ চারদিক। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। সাহাবুদ্দিন স্যর ঠাণ্ডা ভাত খেয়ে শীতে কাঁপতে-কাঁপতে লেপের ভিতর ঢুকে জবুথুবু হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর হাত-পায়ের তালু বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে তিনি লেপের ভিতরে, কিন্তু হাত-পা গরম হচ্ছে না।

সাহাবুদ্দিন স্যর আজ নেছারাবাদ গিয়েছিলেন ওয়াজ-মাহফিল শুনতে। বড়-বড় অনেক আলেম-মাওলানারা ওয়াজ করেছেন সেখানে। ওয়াজের এক পর্যায়ে বিশিষ্ট আলেম হাফেজ মাওলানা মোঃ শওকত হোসেন যখন মৃত্যু ও পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে ওয়াজ করছিলেন তখন সাহাবুদ্দিন স্যরের চোখ বারবার ভিজে উঠছিল। কী ছোট্ট আমাদের এই জীবন! কিছু সময়ের জন্য এই পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছি আমরা। মৃত্যুর পরেই হচ্ছে আসল জীবন, অনন্ত জীবন। পৃথিবীতে আমরা যদি ভাল কাজ করি তা হলে মৃত্যুর পরে পাব অনাবিল চিরসুখের বেহেস্ত আর খারাপ কাজ করলে...

ওয়াজ শুনে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। বাড়িতে সাহাবুদ্দিন স্যর একা। দুই দিন আগে তাঁর স্ত্রী ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছেন। দুপুরের রান্না করা ঠাণ্ডা ভাত ছিল। একটা ডিম ভেজে সেই ঠাণ্ডা ভাতই তৃপ্তি সহকারে খেয়ে ফেলেন। ভাত খাওয়ার পরই খুব শীত লাগতে লাগল। দেরি না করে লেপের ভিতরে ঢুকে পড়লেন।

অনেক রাত হয়ে গিয়েছে, জলদি ঘুমানো উচিত। ভোরে ঘুম থেকে উঠে রান্না-বান্না করে, গোসল সেরে, খেয়ে দেয়ে স্কুলে যেতে হবে। কিন্তু শীতে ঘুম আসছে না। তা ছাড়া ওয়াজে শোনা আলেমদের বিভিন্ন কথা মাথার ভিতরে ঘুরপাক খাচ্ছে।

সাহারা খাতুন হাই স্কুলের বাংলার শিক্ষক সাহাবুদ্দিন স্যর। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মাঝারি উচ্চতা। স্বাস্থ্য ভাল। মুখ ভর্তি চাপ দাড়ি ছোট করে ছাঁটা। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। উঁচু নাক। সহজ-সরল চোখের চাহনি। অত্যন্ত সাদাসিধা ভদ্র গোছের মানুষ।

আজকে ওয়াজ শুনে সাহাবুদ্দিন স্যর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন–তিনি জীবনে আর কোন দিন কোন পাপের কাজ করবেন না। এমনিতেও তিনি তেমন

কোন পাপের কাজ করেন না, মাঝে-মাঝে হয়তো নিজের অজান্তে ছোট-খাট দু'একটা পাপ করে ফেলেন। আজ থেকে ছোট-খাট পাপও আর করবেন না।

ভাবতে-ভারতে কখন যেন সাহাবুদ্দিন স্যর গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন। দরজায় অনবরত কড়া নাড়ার শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?'

'মাস্টার সাহেব, আমি। দরজাটা খোলেন।'

সাহাবুদ্দিন স্যর চমকে উঠলেন। একটা নারী কণ্ঠ। এত রাতে মেয়ে মানুষ! তিনি ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠলেন। গলায় সন্দেহ নিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এত রাতে! কে আপনি???'

'দরজাটা খোলেন, তা হলেই বুঝতে পারবেন আমি কে।'

সাহাবুদ্দিন স্যর আলো জ্বেলে দরজা খুললেন। দরজা খুলে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন। দরজার সামনে উলঙ্গ এক মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। অত্যন্ত মিষ্টি চেহারা। সারা শরীরে উপচে পড়া যৌবনের ঢেউ।

মেয়েটা সাহাবুদ্দিন স্যরের ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া চেহারা দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল। চেহারায় আহ্বানের হাতছানি।

সাহাবুদ্দিন স্যর 'অস্তাক ফিরুল্লা' বলে খটাস করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বন্ধ দরজার ওপাশে মেয়েটা খিলখিল করে হেসেই চলছে। নিঝুম রাতে হাসির শব্দটা কেমন অদ্ভুত গা ছমছমে লাগছে।

প্রচণ্ড শীতের মাঝেও ঘরের ভিতরে সাহাবুদ্দিন স্যর ঘেমে নেয়ে উঠলেন। তাঁর বুকের ভিতরটাও টিপটিপ করছে। উলঙ্গ মেয়েটা কে!? রাস্তার কোন পাগলি! পাগলি তাঁর কাছে কী চায়! গত এক মাসেও তো রাস্তায় কোন পাগলি চোখে পড়েনি! এমন নিশুতি রাতে মেয়েটা কোত্থেকে এল! প্রচণ্ড এই শীতের মাঝেও মেয়েটা কী করে বিবস্ত্র অবস্থায় স্বাভাবিক আছে!

বিভিন্ন চিন্তা মাথার ভিতরে ঘুরপাক খাচ্ছে সাহাবুদ্দিন স্যরের। মেয়েটার মুখের আদলটা কেমন পরিচিত-পরিচিত লাগছে। এর আগে কোথায় যেন দেখেছেন, ঠিক মনে করতে পারছেন না।

মেয়েটার একঘেয়ে হাসির শব্দ এক সময় থেমে গেল। দূর থেকে ভেসে এল ফজরের আযানের ধ্বনি।

দুই

সকালে নাওয়া-খাওয়া কিছুই করলেন না সাহাবুদ্দিন স্যর। চেহারায় ছন্নছাড়া ভাব নিয়েই স্কুলে চলে গেলেন। ভেবে রেখেছেন, একটা ক্লাস নিয়েই স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে ফিরে আসবেন। বলতে গেলে গত রাতটা সম্পূর্ণই নির্ঘুম কেটেছে।

স্কুলে যাওয়ার পথে চারপাশটা খুব ভালভাবে লক্ষ করলেন। না, রাস্তাঘাটে কোন পাগলি চোখে পড়েনি। গত রাতে ঘটে যাওয়া ঘটনার কোন ব্যাখ্যাই তিনি দাঁড় করাতে পারছেন না।

স্কুলে ঢোকার পর প্রথমেই দেখা হলো দপ্তরি হেদায়েতের সাথে। হেদায়েত পান খাওয়া লাল দাঁত বের করে জিজ্ঞেস করল, 'ছ্যারের শইলডা খারাব নাহি? ক্যামন জানি দেহাইতেছে।'

সাহাবুদ্দিন স্যর আস্তে করে বললেন, 'রাতে ঘুম হয়নি।'

হেদায়েত গলায় কৌতূহল নিয়ে বলল, 'ক্যান, ছ্যার, ঘুম হয় নাই ক্যান?'

'এমনি,' বলে সাহাবুদ্দিন স্যর চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে বললেন, 'হেদায়েত, গত দু-এক দিনে রাস্তাঘাটে কোন উলঙ্গ পাগলি দেখেছ?'

হেদায়েত মুখে কিছুই বলল না, চোখ বড় বড় করে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল, না, সে দেখেনি।

একটা ক্লাস শেষে হেডস্যর তাঁর রুমে সাহাবুদ্দিন স্যরকে ডেকে পাঠালেন।

স্কুলের হেডস্যর হচ্ছেন বদিউল আলম। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বেঁটে-খাট, মোটাসোটা শরীরের অধিকারী। মাথায় সব সময় গোল টুপি পরে থাকেন। চোখে সুরমা লাগান। ক্লিন শেইভ। মাঝে-মাঝে পাঞ্জাবি পরে স্কুলে আসেন। গায়ে কড়া গন্ধের আতর মাখেন। সারাক্ষণ জর্দা দেওয়া পান খান। কাছে গেলে, জর্দা আর আতরের মিশ্রিত মাথা ঝিমঝিম করা এক ধরনের তীব্র গন্ধ পাওয়া যায়।

হেডস্যর বদিউল আলমের বিরুদ্ধে স্কুলের মেয়েদের অনেক অভিযোগ রয়েছে। তিনি নাকি সব সময় মেয়েদের বুকের দিকে কুকুরের মত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। স্কুলের কোন মেয়ে ছুটি চাইতে বা অন্য কোন কারণে তাঁর কাছে গেলে তিনি মেয়েদের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পিঠে হাত বোলাতে-বোলাতে

নানা রকমের প্রশ্ন করেন। '...কী জন্যে ছুটি লাগবে, সোনা?...অসুস্থ?...জ্বর হয়েছে?' মেয়েদের কপালে-গালে হাত রেখে কিছুক্ষণ ঝিম ধরে থেকে, 'কই, জ্বর তো নেই...তা হলে?' মাঝে মাঝে খুবই আপত্তিকর প্রশ্নও করে ফেলেন, 'লক্ষ্মী সোনা, তোমার কি এখন ঋতুকাল চলছে?'

মেয়েরা আড়ালে-আবডালে তাঁকে লুচ্চা হেডস্যার বলে ডাকে। তাঁর চরিত্রের ওই সব গুণাবলীর জন্য স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দিনে-দিনে কমে যাচ্ছে।

সাহাবুদ্দিন স্যার, হেডস্যারের মুখোমুখি চেয়ারে বসলেন। হেডস্যারের মুখ হাসিহাসি। চেহারায় কৌতূহল লুকোচুরি খেলছে।

হেডস্যার পিকদানিতে পানের পিক ফেলে, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পান চিবুতে-চিবুতে গলায় যতটা সম্ভব গাম্ভীর্য এনে বললেন, 'আপনাকে তো ভাল মানুষ বলেই জানতাম, এ-কী শুনলাম আপনার নামে!'

সাহাবুদ্দিন স্যার অবাক হয়ে বললেন, 'কী শুনেছেন?'

'গত রাতে আপনি নাকি একটা উলঙ্গ পাগলিকে নিয়ে রাত কাটিয়েছেন! তাই সারা রাত নাকি ঘুমাতে পারেননি।'

সাহাবুদ্দিন স্যার ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। স্কুলের দপ্তরি ধূর্ত হেদায়েত যে এমন কথা রটাচ্ছে তা বুঝতে তাঁর দেরি হলো না।

হেডস্যার আবার গম্ভীর গলায় বললেন, 'দেখুন, আমাদের স্কুলের একটা সম্মান আছে, স্কুলের শিক্ষকদের সম্মান আছে। এখন যদি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, গার্ডিয়ানরা জানতে পারে যে স্কুলের কোন এক শিক্ষক রাস্তা থেকে পাগলি ধরে এনে রাত কাটায়, তা হলে কী অবস্থা হবে বুঝতে পারছেন! আমাদের মান-মর্যাদা-সম্মান কোথায় যাবে?'

হেডস্যার নুয়ে মেঝে থেকে পিকদানি তুলে পানের ছিবড়া ফেলে আবার বললেন, 'স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে বাড়িতে নেই এই সুযোগে আপনি এমন একটা অপকর্ম করবেন! বুঝি পুরুষ মানুষের স্বভাব হচ্ছে পাখির মত উড়ে-উড়ে এক ডাল থেকে আর এক ডালে বসা। এক ডালে বেশিক্ষণ ভাল লাগে না। তাই বলে রাস্তা থেকে পাগলি ধরে এনে...শহরে গিয়ে কোন হোটেলে রাত কাটাতে পারতেন। আজকাল তো প্রায় সব হোটেলেই...'

হেডস্যারের এ ধরনের কথাবার্তা শুনে ঘেন্নায় মাথা নুইয়ে বসে থাকেন সাহাবুদ্দিন স্যার। কথাবার্তার এক পর্যায়ে হেডস্যার টেবিলের উপরে ঝুঁকে সাহাবুদ্দিন স্যারের দিকে মুখ বাড়িয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের মত নিচু গলায় বললেন, 'তা পাগলিটাকে পেয়েছিলেন কোথায়?...বয়স কেমন? দেখতে নিশ্চয়ই সুন্দর?...'

সাহাবুদ্দিন স্যার হেডস্যারের রুম থেকে বেরিয়ে সরাসরি বাসায় ফিরে এলেন। তাঁর নিজের উপর খুব রাগ লাগছে। কেন যে স্কুলের দপ্তরি দুষ্টমতি

হেদায়েতের কাছে উলঙ্গ পাগলির কথা জিজ্ঞেস করতে গেলেন। এখন হেদায়েত আর বদ চরিত্রের হেডস্যার বদিউল আলম দু'জনে মিলে আরও কত কী রটায় তার কোন ইয়ত্তা নেই।

সাহাবুদ্দিন স্যার টের পেলেন প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। এখন বেলা বারোটা। রান্না-বান্না করে, গোসল সেরে, পেট ভরে খেয়ে এক চোট ঘুমানো দরকার। ঘুম থেকে উঠে গত রাতের সেই নগ্ন পাগলিকে নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে।

তিন

মাগরিবের আযানের শব্দে সাহাবুদ্দিন স্যারের ঘুম ভাঙল। ওযু করে তিনি মাগরিবের নামাজ আদায় করলেন।

গতকালের চেয়ে আজকে শীত যেন আরও বেশি পড়েছে। ভালভাবে শীতের পোশাক পরে তার উপরে একটা চাদর জড়িয়ে, মাফলার দিয়ে মাথা, কান, গলা পেঁচিয়ে, চা খাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বাইরে বেরুলেন সাহাবুদ্দিন স্যার। শীত থেকে রক্ষার এত ব্যবস্থা গ্রহণের পরেও গায়ে যেন শীতের কাঁটা বিঁধছে। অবশ্য শীতের দিনে ঘুম থেকে জাগার পরে বেশ কিছুক্ষণ শীতটা বেশি অনুভব হয়। ধীরে-ধীরে গা গরম হয়ে শীত কমে যায়।

সাহাবুদ্দিন স্যার চায়ের দোকানে অনেকক্ষণ ধরে বসে রইলেন। দুই কাপ চা আর চার পিস সল্টেড বিস্কিট খেয়ে শেষ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল চায়ের দোকানের লোকজনের আলাপ আলোচনা শুনে আন্দাজ করবেন এলাকায় কোন পাগলির আবির্ভাব ঘটেছে কিনা। কমবয়সী পাগলি রাস্তাঘাটে উলঙ্গ অবস্থায় ঘুরে বেড়ালে, তা যে কারও-কারও আলোচনার মুখ্য বিষয়বস্তু হবে তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পাগলি নিয়ে কোন আলাপ-আলোচনাই শোনা গেল না।

সাহাবুদ্দিন স্যার চায়ের দোকান থেকে উঠে একটা ফোনের দোকানে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর কাছে ফোন করলেন।

মোবাইল ফোনের এই স্বর্ণ যুগেও তিনি মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন না। মোবাইল ফোনকে তাঁর কাছে একটা বাড়তি ঝামেলা বলে মনে হয়। কথা নেই বার্তা নেই যখন-তখন পকেটের মধ্যে টুং-ট্যাং করে বেজে ওঠা। নিজের ব্যক্তিগত মুহূর্ত বলে কিছু থাকে না। সময়ে-অসময়ে কেউ একজন ফোন করে প্যাঁচাল শুরু। কই আগের দিনের মানুষের তো মোবাইল ফোন

ছিল না, তারা সুন্দরভাবে জীবন কাটাত না? বর্তমানের চেয়ে বরং আগের মানুষের জীবন আরও সুখী, আনন্দময়, সাবলীল ছিল।

সাহাবুদ্দিন স্যারের স্ত্রীর ফিরতে আরও তিন দিন লাগবে। স্ত্রী হ্যান-ত্যান অনেক কিছু জিজ্ঞেস করে, '...তুমি ভাল আছো তো? শরীর সুস্থ তো? প্রতিবার শীতে তো ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসো, ঠাণ্ডা লাগেনি তো? খাওয়া-দাওয়া ঠিক মত হচ্ছে তো?...'

যত সব আলগা দরদ! স্ত্রীর এ ধরনের ন্যাকামি সাহাবুদ্দিন স্যারের কাছে অসহ্য লাগে। এমন ভান করে যেন স্বামীর চিন্তায় সে অস্থির। অথচ...নারী জাতি মানেই ভান। মনে এক আর মুখে আর এক। অন্তরে বিষ মুখে মধু।

স্ত্রীর কাছে গত রাতের সেই পাগলির কথা মোটেই উল্লেখ করেন না। স্ত্রী এমনিতেই সন্দেহবাতিকগ্রস্ত। কী বলতে কী বুঝবে। শেষে দেখা যাবে দপ্তরি হেদায়েত আর হেডস্যারের মত ভয়ঙ্কর কিছু ভেবে বসবে।

স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলা শেষে, ফোনের দোকান থেকে বেরিয়ে এলাকার বিভিন্ন রাস্তায়-রাস্তায় হাঁটাহাঁটি শুরু করেন। তাঁর উদ্দেশ্য গত রাতের পাগলিটার যদি দেখা মেলে।

পাক্কা দুই ঘণ্টা এলাকার প্রায় সব রাস্তা, অলি-গলিতে ঘোরাঘুরি করেও কোন পাগলির দেখা মেলে না।

সাহাবুদ্দিন স্যার যখন বাসায় ফিরলেন তখন রাত সাড়ে নয়টা। ইলেকট্রিসিটি নেই। লোডশেডিং চলছে। শীতের দিনেও যে কেন লোডশেডিং হয় এর কোন ব্যাখ্যা নেই।

তিনি ঘরে ঢুকে মোম জ্বাললেন। মোমের টিমটিমে আলোতে ঘরটা সামান্য আলোকিত হওয়ার পরে, বিছানার উপরে চোখ পড়তেই তিনি চমকে উঠলেন। এতক্ষণ ধরে যে পাগলিকে সমস্ত এলাকায় খুঁজে বেড়িয়েছেন সেই পাগলি তাঁর বিছানার উপরে শুয়ে গুনগুন করে গান গাইতে-গাইতে পা নাচাচ্ছে। সেই আগের মতই সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায়। পাগলির গা থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

তাঁকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে পাগলি খুব স্বাভাবিক গলায় বলে উঠল, 'শীতের মধ্যে এত রাত পর্যন্ত বাইরে কী করেছেন?'

সাহাবুদ্দিন স্যার কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, তার আগেই পাগলি আবার বলে উঠল, 'বাইরে গিয়ে প্রথমে চা খেয়েছেন, এর পরে স্ত্রীর কাছে ফোন করেছেন, তার পরে রাস্তায়-রাস্তায় আমাকে খুঁজেছেন।' কথা শেষ করে পাগলি খিলখিল করে হাসতে লাগল।

সাহাবুদ্দিন স্যার জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলেন, তুমি কে? তার আগেই পাগলি বলে উঠল, 'আমি কে তা আপনার চেয়ে কেউ ভাল জানে না।'

সাহাবুদ্দিন স্যার খুবই অবাক হলেন। পাগলি কি তাঁর মনের কথা বুঝতে

পারছে! কিছু বলার আগেই পাগলি নিজে থেকেই বলে উঠছে।

পাগলি আবার খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, 'ঠিকই ধরেছেন। আপনি যা ভাবেন আমি তা বুঝতে পারি, আপনি যা জানেন আমিও তা জানি।'

পাগলির বলা শেষ হতেই সাহাবুদ্দিন স্যর বলে উঠলেন, 'আমি যা ভাবি তা তুমি বুঝতে পারো! আমি যা জানি তা তুমিও জানো! এর মানে কী?'

'বুঝলেন না আপনার মনের নাড়ী-নক্ষত্র সবখানেই আমার বিচরণ।'

সাহাবুদ্দিন স্যর চিন্তিত হয়ে বললেন, 'তা হলে আমার মনের এমন কোন গোপন কথা বলো তো যা আমি ছাড়া এই পৃথিবীর আর কেউ জানে না।'

'এটা তো খুব সহজ কাজ। শুনুন তা হলে আপনার মনের কিছু গোপন কথা। আপনি আপনার স্ত্রী রুমাকে মোটেই পছন্দ করেন না। বিয়ের সময়ই তাকে আপনার পছন্দ হয়নি। এর পরেও তাকে বিয়ে করেছেন তার বাপের টাকা-পয়সা দেখে। আপনার স্ত্রীর গায়ের রং যেমন ময়লা তেমন বিদঘুটে চেহারা, তার উপরে রাতে যখন আপনার পাশে সে শোয় তখন তার গা থেকে ঘামের বিশ্রী বোটকা গন্ধ পান। সব কিছু মেনে নিয়ে মুখ বুজে পড়ে আছেন শুধু শ্বশুরের অগাধ টাকা-পয়সার লোভে। আপনার স্ত্রী তো আবার বাপের এক মেয়ে। শ্বশুরের মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি, টাকা-পয়সার মালিক হবে আপনার স্ত্রী। আর স্ত্রী মানেই তো আপনি। স্ত্রীকে তো ভয়ানক ভাবে সন্দেহও করেন। আপনার গায়ের রং কালো, স্ত্রীর গায়ের রং কালো তা হলে আপনার মেঝ ছেলেটা অমন ফর্সা রং, সুন্দর চেহারা পেল কী করে! মেঝ ছেলেটা চেহারা পেয়েছে আপনার শ্বশুরের ম্যানেজার আজিজ সাহেবের। আজিজ সাহেবের সঙ্গে তো আপনার স্ত্রীর দহরম-মহরম ভাব। স্ত্রী যে কেন এত ঘনঘন বাপের বাড়ি যায়...'

সাহাবুদ্দিন স্যর পাগলি মেয়েটার কথা শুনে ঝিম মেরে গেলেন। ভাবতে লাগলেন—মেয়েটা কে? কোত্থেকে এসেছে? কী করে তাঁর মনের গোপন কথা গড়গড় করে বলে যাচ্ছে! মেয়েটার মধ্যে অস্বাভাবিকতা বলতে সে উলঙ্গ, এ ছাড়া তার কথাবার্তা, লজিক শুনে মোটেই মনে হচ্ছে না সে মস্তিষ্কবিকৃত।

মেয়েটা সাহাবুদ্দিন স্যরের ভাবনা বুঝে ফেলল। খিলখিল করে হাসতে-হাসতে বলল, 'আমি কে, কোত্থেকে এসেছি, তা আপনার চেয়ে কেউ ভাল জানে না।'

সাহাবুদ্দিন স্যর অস্বস্তি নিয়ে বললেন, 'তুমি উলঙ্গ কেন?'

'আপনি আমাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে চান তাই আমি উলঙ্গ।'

সাহাবুদ্দিন স্যর বেশ লজ্জা পেলেন। সত্যিই মেয়েটাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে তাঁর খুব ভাল লাগছে। অমন ভরা যৌবনা টসটসে একটা মেয়েকে

উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে কার না ভাল লাগে।

মেয়েটা সাহাবুদ্দিন স্যারের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে দু-ঠোঁটে দুষ্টুমি আর কামনা মিশিয়ে রহস্যময় হাসি দিল।

সাহাবুদ্দিন স্যার প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলেন—তুমি কি ভূত-পেত্নী, জিন-পরী বা ওই জাতীয় কিছু—এমন সময় ইলেকট্রিসিটি চলে এল। ইলেকট্রিকের উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠতেই মেয়েটা একটা কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলি হয়ে হাওয়ায় মিশে গেল। আতংকে সাহাবুদ্দিন স্যারের মুখ হাঁ হয়ে গেল।

চার

এশার নামাজ শেষে, দোয়া-দরূদ পড়ে সাহাবুদ্দিন স্যার অনেকক্ষণ আল্লার কাছে কান্নাকাটি করলেন। একী হচ্ছে তাঁর সাথে! তাঁর মত সহজ-সরল একটা মানুষের উপর শেষ পর্যন্ত পরী ভর করেছে!

দোয়া-দরূদ পড়ে বুকে ফুঁ দেয়ার পর ভয় অনেকটাই কেটে গেছে। আরও একটা কথা ভেবে ভয় কেটেছে—পরীটা তো তাঁর কোন ক্ষতি করছে না, শুধু খিলখিল করে হাসে আর অপরূপ চেহারার রূপ ধরে নগ্ন অবস্থায় তাঁর চোখে ধরা দেয়। পরীটার শরীরটা বেশ আকর্ষণীয়, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে ভিতরের আদিম পশুটা জেগে উঠতে চায়। সাহাবুদ্দিন স্যারের মনটা খারাপ হয়ে গেল—ছিঃ-ছিঃ এসব কী কথা ভাবছেন তিনি।

অনেক রাত পর্যন্ত সাহাবুদ্দিন স্যার জেগে-জেগে পরীটার কথা ভাবলেন। এই বুঝি পরীটা এল—সেই ভাবনায় বুকটা কেঁপে-কেঁপে উঠল। একটা ব্যাপার লক্ষ করে তিনি অবাক হলেন—পরীটার জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন। ভয় লাগছে আবার মনের ভিতর অন্য রকম একটা অনুভূতিও হচ্ছে।

ডিম লাইট জ্বেলে, সাহাবুদ্দিন স্যার বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ঘর একেবারে অন্ধকার করতে ভয়-ভয় লাগছে।

শেষ রাতে আচমকা সাহাবুদ্দিন স্যারের ঘুম ভেঙে গেল। তাঁর শরীরের সঙ্গে একটা উষ্ণ নরম শরীর জড়িয়ে রয়েছে। ঘুমের রেশ পুরোপুরি কাটতেই পাশ ফিরে ডিম লাইটের অস্পষ্ট আলোতে দেখেন পরী মেয়েটা তাঁকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রয়েছে। খুব একটা খারাপ লাগছে না, তবে কিছুটা ভয়-ভয় লাগছে।

সাহাবুদ্দিন স্যার মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিলেন, ভোর হতেই ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে চলে যাবেন। ফিরবেন একেবারে স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে সঙ্গে নিয়ে। কোন বাড়িতে, একা একটা মানুষ থাকলেই দেখা

যায়–ভূত-পেত্নী বা জিন-পরী আছর করে। তাঁকেও একলা পেয়ে পরীটা তাঁর উপর আছর করেছে।

পাঁচ

সাহাবুদ্দিন স্যার শ্বশুর বাড়ি থেকে স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে নিয়ে ফেরার পরে আবার আগের মতই তাঁর নির্ঝঞ্ঝাট ঝামেলাহীন সহজ-সরল জীবন চলতে শুরু করে। সেই রাতের পর আর তিনি পরীটার দেখা পাননি। পরীর আছরের কথা কাউকে তিনি বলেনওনি, এমন কী স্ত্রীকেও নয়। স্ত্রীর প্রতি সন্দেহটা আগের মতই রয়েছে। রাতে স্ত্রী যখন তাঁর পাশে শোয় তখন আগের মতই স্ত্রীর গায়ের ঘামের বোটকা গন্ধে অন্য পাশে ফিরে মুখ বুজে পড়ে থাকেন। তখন সুন্দরী পরীটার কথা খুব বেশি মনে পড়ে।

চার-পাঁচ মাস পরে সাহাবুদ্দিন স্যারের স্ত্রী ছেলে-মেয়ে নিয়ে আবার সপ্তাহখানেকের জন্য বাপের বাড়ি বেড়াতে যান। বাড়িতে একলা পড়ে থাকেন সাহাবুদ্দিন স্যার। গতবারের সেই উলঙ্গ পরীর কথা এত দিনে তিনি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। কিন্তু স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে বেড়াতে যাওয়ার প্রথম রাতেই পরীটার আবার আবির্ভাব ঘটে। আগের মতই পরীটা খিলখিল করে হাসে আর মনের গোপন কথাগুলো বলে দেয়।

সাহাবুদ্দিন স্যারের তিন-চার দিন কেটে যায় পরীকে সঙ্গে নিয়েই। সারা দিন-রাত পরীটার সঙ্গে গুটুর-গুটুর করে গল্প করেন আর মাঝে-মাঝেই মেতে ওঠেন আদিম খেলায়। তিন-চার দিন পর প্রচণ্ড অনুশোচনায় ভরে ওঠে তাঁর মন। একী করছেন তিনি। ছিঃ-ছিঃ। তাঁর মত নম্র-ভদ্র একটা মানুষ শেষ পর্যন্ত সুন্দরী পরীর সঙ্গে...

সাহাবুদ্দিন স্যারের মনে পড়ে তাঁর বাল্যবন্ধু আতিকুর রহমানের কথা। আতিকুর রহমান একজন বড় সাইকিয়াট্রিস্ট। ঢাকার একটা মেণ্টাল হসপিটালের সিনিয়র ডাক্তার। আতিকুর রহমান ভূত-পেত্নী, জিন-পরীতে মোটেও বিশ্বাস করে না। ভূত-পেত্নী, জিন-পরী সব কিছুর ব্যাখ্যাই তার কাছে আছে।

সাহাবুদ্দিন স্যার সিদ্ধান্ত নেন, ঢাকা গিয়ে সাইকিয়াট্রিস্ট বন্ধু আতিকুর রহমানের কাছে পরী বিষয়ক সব কিছু খুলে বলবেন। খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তার কাছে সব কিছু খুলে বলতে লজ্জাও লাগবে না। বন্ধু নিশ্চয়ই কোন ভাল পরামর্শ দিতে পারবে।

সাইকিয়াট্রিস্ট আতিকুর রহমান বন্ধু সাহাবুদ্দিনের পরী সংক্রান্ত সব কথা

শুনে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে থাকেন। তিনি ভাবছেন মফস্বল শহরের স্কুল শিক্ষক সহজ-সরল বন্ধুকে কীভাবে বললে তাকে বোঝানো যাবে যে পরী সমস্যাটা সে নিজে-নিজেই সৃষ্টি করছে, বাস্তবে পরীর অস্তিত্ব বলে কিছুই নেই।

নীরবতা ভেঙে এক সময় গলা খাঁকারি দিয়ে আতিকুর রহমান মুখ খুললেন, 'দেখ্, সাহাবুদ্দিন, আমি যতটুকু জানি তুই একজন সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, আদর্শবান, নম্র-ভদ্র, লাজুক স্বভাবের মানুষ। তোর মত মানুষ সাধারণত মনের খারাপ ভাবনা বা কুপ্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয় না। তোর মত মানুষরা আদর্শ ও সততাকে আঁকড়ে ধরেই সারা জীবন পার করে দেয়। কিন্তু একটা বিষয় কি জানিস, প্রতিটা মানুষের মনের দুইটা দিক থাকে—একটা আলোকিত দিক অন্যটা অন্ধকার দিক। তা মানুষটা যতই ভাল হোক আর খারাপ হোক, তোর মত ভাল মনের মানুষদের মনের অন্ধকার দিকটা অবচেতন মনের খুব গভীরে গোপনে থাকে। আবার কেউ-কেউ ভাল মানুষের মুখোশ পরে থাকে অথচ তাদের মনের ভিতরের অন্ধকারটা যে কতটা বিস্তৃত তা তারা কখনওই প্রকাশ করে না। মুখোশের আড়ালে নিজের প্রকৃত রূপ লুকিয়ে রাখে। আজকাল খবরের কাগজ, পত্রিকা ঘাঁটলেই দেখবি—ষাট বছরের সাদাসিধা বৃদ্ধ, আট-নয় বছরের বাচ্চা মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। পাশে ঘুমিয়ে থাকা সুন্দরী স্ত্রীকে ফেলে রেখে কেউ আবার গভীর রাতে কুৎসিত চেহারার কাজের মেয়ের কাছে যায়...এগুলো হচ্ছে মানুষের মনের কুপ্রবৃত্তি। তোর মত ভাল মনের মানুষরা মনের ওই সব কুপ্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় না দিয়ে মনের ভিতরেই দমিয়ে রাখে। কখনও কখনও দেখা যায় মনের সেই সুপ্ত কুপ্রবৃত্তিগুলো অন্যভাবে রূপ নিয়ে দেখা দেয়।

'তোর কাছে যে উলঙ্গ পরীটা আসে সেই পরীর বসবাস তোর অবচেতন মনের অন্ধকারের গভীরে। তোর স্ত্রীর প্রতি অনীহা, সন্দেহ, দূরত্ব থেকে সুন্দরী পরীটা তোর মনের ভিতরে জন্ম নিয়েছে। তোর অবচেতন মন সারাক্ষণ চায় অমন একটা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গ। তুই যেমন নম্র-ভদ্র তেমন লাজুক, ভীতু স্বভাবের। বাস্তবে কোন সুন্দরী মেয়ের কাছে গিয়ে তোর চাহিদা পূরণের পথে ভয়, চক্ষুলজ্জা যেমন বাধা দেয় তেমন চেতন মনের বিবেকটাও সারাক্ষণ আগলে রাখে। ওদিকে মনের গভীরে অন্ধকারটা তো দিনে-দিনে বেড়েই চলছে। এক সময় অবচেতন মন নিজে-নিজেই সৃষ্টি করে নেয় সুন্দরী উলঙ্গ পরী।

'আমি যা বলছি তা যে যুক্তিসঙ্গত তুই নিজেও একটু ভালভাবে বিশ্লেষণ করে ভাবলে বুঝতে পারবি। তুই নিজেই বলেছিস পরীটাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, "তুমি কে? কোত্থেকে এসেছ?" তখন পরীটা উত্তর দেয়, "আমি কে, কোত্থেকে এসেছি তা আপনার চেয়ে কেউ ভাল জানে না।" বাস্তবিকই

তুই-ই জানিস পরীটা কোত্থেকে এসেছে। পরীটা তোর মনের ভাবনা বুঝতে পারে, তুই যা জানিস সে-ও তা জানে। কারণ সে তোর মনেরই একটা অংশ। তুই যখন বাড়িতে একা থাকিস তখনই পরীটার আবির্ভাব হয়। তোর স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে থাকাকালীন সময়ে পরীটা আসে না। এর মানে তোর একাকীত্বে অবচেতন মনের ভিতর থেকে পরীর সত্তা জেগে ওঠে। প্রথম দেখায়ই পরীটার মুখের আদল তোর কেমন পরিচিত-পরিচিত মনে হয়েছে কারণ এমন চেহারার একটা মেয়ের কথা তুই সবসময় ভাবিস।

'পরী মেয়েটা নিজে কিন্তু কখনওই বলেনি সে পরী। সে যে পরী তা তুই বুঝলি কী করে? নিজের কল্পনাকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য তুই নিজেই নিজেকে বলেছিস সে পরী। তোর মনের একটা দিক পরী মেয়েটাকে চাচ্ছে আবার অন্য দিকটা চাচ্ছে না। মাঝে-মাঝে তুই নিজেও বুঝতে পারছিস কোথাও বড় রকমের কোন ভুল হচ্ছে। তুই যে তাকে চাচ্ছিস না এর বড় প্রমাণ হচ্ছে তুই তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমার কাছে এসেছিস। আবার তুই যে তাকে চাচ্ছিস সেটার যুক্তি হচ্ছে তার সম্পর্কে বলার সময় তোর গলায় ছিল আগ্রহ, আনন্দ আর উচ্ছ্বাস, চোখ-মুখ ছিল উজ্জ্বল। পরী মেয়েটার সঙ্গ তোর খুবই ভাল লাগে। তোর মন এখন কী চায় তা তুই নিজেও বুঝতে পারছিস না।'

ডা. আতিকুর রহমান একটু থেমে প্রেসক্রিপশন লিখতে-লিখতে আবার বলতে লাগলেন, 'পরীটার জন্ম তোর অবচেতন মনে। যখন থেকে তুই মনে-প্রাণে ভাববি পরী বলতে কিছু নেই, তখন থেকে দেখবি পরী আর আসে না। পরীর অস্তিত্ব বলতে বাস্তবে কিছুই নেই, শুধুই তোর মনের অতিকল্পনা।'

সাহাবুদ্দিন স্যর তাঁর সাইকিয়াট্রিস্ট বন্ধুর কথা পুরোপুরি বিশ্বাসও করেননি আবার অবিশ্বাসও করেননি। বন্ধুর কাছ থেকে ফেরার পথেই তিনি প্রেসক্রিপশনটা ছিঁড়ে ফেলে দিলেন।

পরী সত্যি হোক আর মিথ্যে, পরীর সঙ্গ তাঁর খুবই ভাল লাগে, তিনি পরীকে হারাতে চান না।

একটা কথা সাইকিয়াট্রিস্ট বন্ধুকে বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। পরী তাঁকে একটা আংটি উপহার দিয়েছে। পরী বলেছে, আংটিটা সব সময় পরে থাকতে আর ওই আংটিটার দিকে তাকিয়ে যখনই পরীর কথা ভাববেন তখনই পরী উপস্থিত হবে। লাল হীরের পাথর বসানো চমৎকার একটা আংটি। আংটিটা যে-ই দেখে তার চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। সামান্য স্কুল শিক্ষক এত দামী আংটি পেল কোথায়! সেদিন তো স্কুলের হেডস্যার বদিউল আলম জিজ্ঞেস করেই ফেললেন, 'এত দামী আংটি আপনি পেলেন কোথায়?'

সাহাবুদ্দিন স্যর লজ্জিত গলায় বলেছেন, 'শ্বশুরবাড়ি থেকে দিয়েছে।'

অদেখা ভুবনের সে

এক

'স্যর, রাতে কি আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়! দয়া করে এই সেলের আলোটা নিভাবেন না। অন্ধকারে খুব ভয় লাগে।'

কারারক্ষীদের নেতা আরিফুর রহমান অবাক হয়ে কনডেম সেলের আসামী কালা খাঁ-এর দিকে তাকান। প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, মিশমিশে কালো কালা খাঁর লাল বড়-বড় দুটি চোখ, থ্যাবড়ানো নাক ও মোটা ঠোঁটের দিকে তাকালে মনে হয় জলজ্যান্ত একটা দানব। এমন দানব আকৃতির লোকটা এ কী কথা বলছে! আলো নিভালে অন্ধকারে ভয় লাগে!

কালা খাঁ কাতর স্বরে আবার মিনতি করল, 'স্যর, দয়া করে আলোটা নিভাবেন না।'

সেন্ট্রাল জেলে কালা খাঁকে আজই আনা হয়েছে। জোড়া খুনের দায়ে তার ফাঁসির আদেশ হয়েছে। আট ও দশ বছরের দুই সহোদরা বোনকে ধর্ষণ করে হত্যা করেছে সে। মামলার বিবরণে বলা হয়েছে–রামনগর গ্রামের চেয়ারম্যান মান্নান খানের দুই মেয়ে নিপা ও দিপাকে গত বছর ফেব্রুয়ারির ৮ তারিখ ধর্ষণ করে হত্যা করে সে। ঘটনার দিন দুপুর থেকে চেয়ারম্যানের মেয়ে দুটিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। মেয়ে দুটি বাড়ির সামনের উঠানে খেলছিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে, গ্রামের উত্তর দিকের জঙ্গলে ঝোপ-ঝাড় ঘেরা ভাঙা মন্দিরের ভিতরে তাদের মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। মেয়ে দুটি রক্তে মাখামাখি হয়ে পড়ে ছিল। পাশে বসে কালা খাঁ চিৎকার করে কাঁদছিল আর বলছিল, 'আমি পারলাম না, আমি বাঁচাতে পারলাম না...'

লোকজন কালা খাঁকে হাতেনাতে ধরে পুলিশে সোপর্দ করে। তবে একটা বিষয়–গ্রামের কেউ এর আগে কালা খাঁকে সেই গ্রামে দেখেনি। জেল-হাজতে রিমাণ্ডে কালা খাঁকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও তার পরিচয়, তার বাবার নাম, তার গ্রামের নাম, তার আত্মীয়-স্বজন, সে কোথা থেকে এসেছে কিছুই জানা যায়নি। সব প্রশ্নের উত্তরে সে একই কথা বলেছে–আমি কিছুই জানি না।

এমনকী সে তার নিজের নামও বলতে পারেনি। পুলিশ চার্জশীট লেখার সময় কাজের সুবিধার জন্যে নিজেরাই নাম দিয়ে নেয় কালা খাঁ।

তার ব্যবহারের মধ্যেও কেমন অপ্রকৃতিস্থ ভাব। যখন তাকে খেতে দেওয়া হয় তখন সেই খাবারের দিকেও সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তার ভাবলেশহীন চেহারা দেখে তখন মনে হয় খাবার দিয়ে সে কী করবে, কীভাবে খাবে, তা সে বুঝতে পারছে না।

কারারক্ষী আরিফুর রহমান ফাঁসির আসামী কালা খাঁ-এর আচরণে বেশ কিছুটা হতচকিত হয়ে গিয়েছেন। লোকটা দেখতে দানবের মত, কিন্তু আচার-আচরণ সহজ সরল আত্মভোলা লোকদের মত। তাকে দেখে মনে হয় পৃথিবীর কোনওকিছুর সাথেই সে পরিচিত নয়। তার ফাঁসির হুকুম হয়েছে–কথাটা শুনে, চোখ বড়-বড় করে শুধু তাকিয়ে ছিল। সন্দেহ হয়েছে ফাঁসি ব্যাপারটা কী সেটাও হয়তো সে বুঝতে পারেনি।

দুই

কারারক্ষীদের হেড আরিফুর রহমান বেশ কয়েক বছর ধরে একটা মারাত্মক রোগে ভুগছেন। ডাক্তারি ভাষায় যে রোগের নাম ইউরেথ্রাইটিস। মূত্রনালীতে ক্লামাইডিয়া ট্রাকোমটিস নামে এক ধরনের জীবাণুর সংক্রমণে এই রোগ হয়। প্রস্রাব করার সময় প্রচণ্ড ব্যথা ও জ্বালাপোড়া হয়। এতই জ্বালাপোড়া হয় যে কখনও ভালভাবে আরাম করে প্রস্রাবই করতে পারেন না। বেশ কয়েকজন ডাক্তারের চিকিৎসা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি, বরং দিনে দিনে রোগের প্রকোপ আরও বাড়ছে। এখন তো বেশ কয়েক মাস ধরে রাতে স্ত্রীকেও এঁড়িয়ে চলতে হয়। ধীরে ধীরে জীবনটা একেবারে দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। অথচ আরিফুর রহমানকে উপর থেকে দেখে কেউ একটুও টের পান না তিনি কতটা যন্ত্রণাদায়ক জীবন অতিবাহিত করছেন।

গত দুই দিন ধরে আরিফুর রহমান বেশ ব্যস্ততার মধ্যে আছেন। হানিফ মোল্লা নামে এক ফাঁসির আসামীর ফাঁসি আগামী সপ্তাহে কার্যকর করা হবে। ফাঁসির মঞ্চ তৈরি হচ্ছে। বর্তমানে এই জেলে কোনও জল্লাদ না থাকায় যশোর থেকে এক জল্লাদ আনা হবে। সেই জল্লাদের ব্যাপারে যশোর জেলের সাথে যোগাযোগ করতে হচ্ছে।

এতসব ব্যস্ততার মধ্যে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত হারুন মৃধা হয়ে উঠেছে গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মত। সে যে সব কর্মকাণ্ড করে বেড়াচ্ছে তাতে ইচ্ছে করে থাবড়িয়ে মাড়ি সহ সব কটা দাঁত ফেলে দিতে। তার আবার দূর সম্পর্কের কেমন যেন মামা হয় বর্তমান এক সংসদ সদস্য। সেই মামার জোরেই তো কারারক্ষীর চাকরিটা পেল। কাজে যোগ দেয়ার পর থেকে

প্রতিদিন একটার পর একটা উল্টাপাল্টা কাজ করছে হারুন মৃধা। কয়েদিদের সাথে পশুর মত আচরণ করে। বিশেষ করে ফাঁসির আসামীদের দেখলেই বিভিন্ন তিরস্কারমূলক গালি-গালাজ করে। আসামীরা যখন গারদের শিক ধরে দাঁড়িয়ে থাকে তখন হঠাৎ বাইরে থেকে তাদের হাতে রোলার দিয়ে প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতায় আঘাত করে। সেদিন ফাঁসির আসামী হানিফ মোল্লার আঙুলে আঘাত করে একটা আঙুল ভেঙে ফেলে। আর এক আসামী পানি খেতে চাইলে তাকে গ্লাসে প্রস্রাব করে তা খেতে দেয়।

এই সব কাজ কর্ম দেখে আরিফুর রহমান প্রচণ্ড রেগে, চড়া গলায় বলেছেন, 'আপনার সমস্যা কী? আপনি কয়েদিদের সাথে এমন পিশাচের মত আচরণ কেন করেন?'

রগচটা হারুন মৃধা ঘাড় বাঁকিয়ে উত্তর দিয়েছে, 'আমি এমনই। আমার যা ইচ্ছে হয় তা-ই করি। আপনার কোনও অসুবিধে আছে?'

হারুন মৃধার কথা শুনে আরিফুর রহমানের মেজাজ পুরোপুরি বিগড়ে গেছে। এর পরেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে অসহিষ্ণু গলায় বলেছেন, 'আপনি এই জেল কয়েদিদের দায়িত্বে না থেকে ট্রান্সফার হয়ে কোনও থানা হাজতে চলে যান।'

'না, আমি এখানেই থাকব। ফাঁসি দেওয়া দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। খুব ইচ্ছে নিজের হাতে একটা ফাঁসি দেওয়া।'

হারুন মৃধার কথা শুনে আরিফুর রহমান অবাক হয়েছেন। ফাঁসি দেওয়া দেখতে ভাল লাগে! কী অদ্ভুত কথা! অতি নিষ্ঠুর মানুষও কখনও বলবে না চোখের সামনে একটা মানুষ ছটফট করে মরবে সে দৃশ্য দেখতে ভাল লাগে। মনে হচ্ছে লোকটা স্যাডিস্ট টাইপের।

তিন

রাত আটটার মত বেজেছে। প্রত্যেক সেলের আসামীদের রুটি আর সবজি ভাজি খেতে দেওয়া হয়েছে।

আরিফুর রহমান, আব্দুল হক, হারুন মৃধা ও জয়ন্ত চার কারারক্ষী জেলের প্রতিটা সেলের সামনে চক্কর দিচ্ছে। আসামীদের আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ করছে। ফাঁসির আসামী কালা খাঁ উদাস ভঙ্গিতে রুটি ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাচ্ছে। কালা খাঁয়ের পাশের সেলের আর এক ফাঁসির আসামী হানিফ মোল্লা একটা কালো ইঁদুর কোলে নিয়ে বসে, রুটি ছিঁড়ে-ছিঁড়ে নিজে খাচ্ছে এবং ছোট ছোট টুকরো করে ইঁদুরটাকে খেতে দিচ্ছে। স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যার

দায়ে লোকটার ফাঁসির হুকুম হয়েছে। লোকটা কেমন যেন পাগলাটে ধরনের। ফাঁসির হুকুম হওয়ার পর এই কনডেম সেলে আনার কিছুদিনের মধ্যেই কেমন করে যেন একটা নেংটি ইঁদুরের সাথে খাতির জমিয়ে ফেলে। প্রতি বেলায় খাওয়ার সময় ইঁদুরটাকে সাথে নিয়ে খাবার খায়। নিজ সন্তানের মত ইঁদুরটার প্রতি তার স্নেহ-মমতা। ইঁদুরটার বাসা বোধহয় সেলগুলোর দক্ষিণ পাশের কোনার স্টোর রুমটায়। প্রতি বেলায় খাওয়ার সময় ইঁদুরটা হানিফ মোল্লার কাছে উপস্থিত হয়। কখনও যদি এমন হয় যে ইঁদুরটা আসতে দেরি করছে, তা হলে হানিফ মোল্লা অস্থির হয়ে ওঠে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে শুরু করে। ইঁদুরটার একটা নামও রেখেছে, 'সুজন'। আরিফুর রহমান একদিন হানিফ মোল্লাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ইঁদুরের নাম সুজন রাখলে কেন?'

হানিফ মোল্লা সে প্রশ্নের উত্তরে অবাক হয়ে রাগান্বিত ভঙ্গিতে বলেছিল, 'কে বলেছে ও ইঁদুর! ও তো আমার ছেলে–সুজন।'

চারজনের পর্যবেক্ষণ দলটা ফাঁসির আসামী হানিফ মোল্লার সেলের আরও কাছে এসে দাঁড়াল। হানিফ মোল্লা তাদের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে মৃদু হাসল। হানিফ মোল্লার কোলে থাকা ইঁদুরটা এত লোকজন দেখে আতঙ্কিত হয়ে কোল থেকে লাফিয়ে পড়ল, সেলের বাইরে এসে লুকিয়ে থাকার স্থান স্টোর রুমের দিকে যেতে শুরু করল। আচমকা হারুন মৃধা হাতের রোলারটা ছুঁড়ে মারল ইঁদুরটার গায়ে। রোলারটা ইঁদুরের গায়ে লেগে, পিঠের মাঝ বরাবর থেঁতলে দিল। রক্তাক্ত অবস্থায় ইঁদুরটা ছটফট করতে শুরু করল। এই দৃশ্য দেখে সেলের মধ্যে হানিফ মোল্লা পাগলের মত হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল।

'আমার সুজন মরে যাচ্ছে, আমার সুজন মরে যাচ্ছে... কেউ ওকে বাঁচান...'

ঘটনার আকস্মিকতায় আরিফুর রহমান একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। অগ্নি দৃষ্টিতে হারুন মৃধার দিকে চাইলেন। ইঁদুরটার ছটফট করে মরে যাওয়া আর হানিফ মোল্লার চিৎকার করে কান্না দেখে কুৎসিত ভঙ্গিতে হাসছে লোকটা।

হানিফ মোল্লার পাশের সেলের কালা খাঁ গারদের ফাঁক দিয়ে হাত বের করে উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, 'ইঁদুরটাকে জলদি আমার হাতে তুলে দিন। আমার হাতে তুলে দিন...'

কালা খাঁর অবিরাম অনুরোধে জয়ন্ত মৃতপ্রায় রক্তাক্ত ইঁদুরটা কালা খাঁর হাতে তুলে দিল। কালা খাঁ তার ডান হাতের তালুতে ইঁদুরটাকে রেখে, বাম হাতটা উপুড় করে ইঁদুরকে দুই হাতের তালুর মধ্যে বন্দি করল, তারপর চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে কী যেন আওড়াতে শুরু করল। দু-হাতের

তালুর মধ্যে বন্দি ইঁদুরের শুধু লেজটা একটা আঙুলের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে থাকল। সেই লেজটা মৃদু নড়াচড়া করছে। কয়েক মুহূর্ত পর, দু-হাতের তালুর মাঝে তীব্র আলোর ঝলকানির সৃষ্টি হলো। আঙুলের ফাঁক-ফোকর দিয়ে সেই তীব্র রশ্মির কিছুটা বাইরে বেরিয়ে এল। সেলটা উজ্জ্বল আলোর প্রখরতায় ভরে উঠল। অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল এই সময়। জেলের সমস্ত বৈদ্যুতিক বাল্বের আলো কমে প্রায় নিভু-নিভু অবস্থা হলো।

কালা খাঁর হাতের তালুর ভিতরে আলোর ঝলকানি নিভে যাওয়ার সাথে-সাথে বালবগুলো আবার আগের অবস্থা ফিরে পেল। কালা খাঁ ডান হাতের তালুর উপরে উপুড় করা বাম হাতটা ধীরে-ধীরে সরিয়ে ফেলল। ডান হাতের তালুতে ইঁদুরটাকে দেখা গেল। সুস্থ সবল একটা ইঁদুর। ইঁদুরের গায়ে বিন্দুমাত্র কোনও ক্ষতচিহ্ন নেই।

এ কী করে সম্ভব! আরিফুর রহমান, আব্দুল হক, জয়ন্ত—সবাই প্রচণ্ড অবাক হয়ে গেল। নীরবে পলকহীন ভাবে তারা কালা খাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে।

নীরবতা ভেঙে প্রথম কথা বলল হারুন মৃধা। জেদী গলায় তিরস্কার করার ভঙ্গিতে বলল, 'ও একটা কালো জাদুকর। ওকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে না মেরে আগুনে পুড়িয়ে মারা উচিত। ও যতদিন বেঁচে থাকবে...'

আরিফুর রহমান হারুন মৃধাকে কড়া গলায় ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন। ধীর পায়ে তিনি কালা খাঁর সেলের কাছে গিয়ে গারদের শিক ধরে দাঁড়িয়ে, নরম গলায় বললেন, 'আপনি এটা কীভাবে করলেন?'

কালা খাঁ ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঝিম ধরা গলায় বলল, 'স্যর, আমি এখন খুব ক্লান্ত, খুব ঘুম পাচ্ছে আমার। আপনি বরং ইঁদুরটা আমার হাত থেকে নিন। যা জানতে চান তা পরে কোনও এক সময় বলব।'

কালা খাঁ সেলের ভিতরে এক কোনায় গিয়ে ময়লা কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে পড়ল।

চার

আরিফুর রহমান চিন্তিত ভঙ্গিতে অফিস-ঘরে বসে আছেন।

হানিফ মোল্লার ফাঁসি কার্যকর করার দিন এগিয়ে আসছে। আর মাত্র চারদিন বাকি। এদিকে জল্লাদ পাওয়া যাচ্ছে না। যশোর থেকে যে জল্লাদ আসার কথা ছিল, সে আসতে পারবে না। তার নাকি ম্যালেরিয়া হয়েছে। ঢাকা, খুলনা বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করা হয়েছে, কিন্তু সেখানেও কোনও

জল্লাদকে পাওয়া যাচ্ছে না।

চিন্তায় আরিফুর রহমানের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে আছে। অবশ্য শুধু চিন্তার কারণে ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে আছে বললে ভুল হবে। আজ সকাল থেকে তাঁর মূত্রনালীর জ্বালাপোড়া ও ব্যথার তীব্রতা আরও বেড়েছে। প্রস্রাবে পেট ভরে আছে কিন্তু এক ফোঁটাও প্রস্রাব করতে পারছেন না।

আরিফুর রহমান টয়লেট থেকে আর একবার প্রস্রাব করার চেষ্টা করে এলেন। কোনও কাজ হলো না, যন্ত্রণা আরও বেড়েছে। যন্ত্রণায় তিনি মুখ বিকৃত করে বসে আছেন।

ভিতর থেকে শোরগোলের শব্দ হচ্ছে। কে যেন উচ্চ শব্দে চিৎকার চেঁচামেচি করছে। জয়ন্ত উত্তেজিত ভঙ্গিতে ছুটে এল, উত্তেজনা আর বিরক্তি নিয়ে আরিফুর রহমানকে জানাল, 'হারুন মৃধা সেলের পাশের স্টোর রুমটা তছনছ করে খোঁজাখুঁজি করছে সেই ইঁদুরটাকে মারার জন্যে।'

আরিফুর রহমান যন্ত্রণা চেপে রেখে সেলের পাশের স্টোর রুমের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। হারুন মৃধা স্টোর রুমের ভাঙা চেয়ার-টেবিলগুলো এক-এক করে সরিয়ে ইঁদুরটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।

আরিফুর রহমান কড়া গলায় কয়েকবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করছেন আপনি?'

হারুন মৃধা আরিফুর রহমানের উপস্থিতির কোনও তোয়াক্কা না করে, নিজের মনে রাগে গজগজ করতে করতে স্টোর রুমের মাল-পত্র সরাতেই থাকল। সব কিছু সরানোর পর এক কোনায় পড়ে থাকা ছেঁড়া কম্বলটা তুলতেই দেখা গেল ইঁদুরটাকে। ইঁদুরটা ভয়ে চুপসে ছোট হয়ে আছে, এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে, কোন্‌দিকে ছুটে পালিয়ে যাওয়া যায়।

হারুন মৃধা হাতের কাছে টেবিলের একটা ভাঙা পায়া পেয়ে সেটা নিয়ে মারার উদ্দেশ্যে ছুটল। আরিফুর রহমান তড়িৎ গতিতে গিয়ে হারুন মৃধাকে জাপটে ধরলেন। সুযোগ বুঝে ইঁদুরটাও দৌড়ে পালাল। হারুন মৃধা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে আরিফুর রহমানের হাতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে জোরাজুরি শুরু করল। আচমকা হাঁটু দিয়ে আরিফুর রহমানের তলপেট ও পুরুষাঙ্গ বরাবর আঘাত করল। ব্যথার স্থানে আঘাত লেগে প্রচণ্ড কষ্ট পেলেন আরিফুর রহমান, হারুন মৃধাকে ছেড়ে কুঁকড়ে বসে পড়লেন। ব্যথা আর যন্ত্রণায় আরিফুর রহমানের নাক-মুখ লাল হয়ে উঠল। হারুন মৃধা বন্ধন মুক্ত হয়েই, ইঁদুরের পিছনে তেড়ে ছুটতে শুরু করল। ইঁদুরটা হানিফ মোল্লার সেলের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। হানিফ মোল্লার কোলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল ওটা।

আরিফুর রহমান বসা অবস্থা থেকে হেলে মেঝেতে পড়ে যাচ্ছিলেন, জয়ন্ত ছুটে এসে ধরে ফেলল। আরিফুর রহমানের অবস্থা দেখে কনডেম

সেলের ভিতরে কালা খাঁ উদ্বিগ্ন গলায় বিলাপের মত করে বলতে লাগল, 'স্যরকে আমার কাছে নিয়ে আসেন, আমার কাছে নিয়ে আসেন...'

হারুন মৃধা ইঁদুরটাকে না মারতে পেরে হানিফ মোল্লার সেলের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ রাগে গজর-গজর করল। এদিকে তাকিয়ে আরিফুর রহমানকে ব্যথায় কাতরাতে দেখে ঠোঁট বাঁকিয়ে মিটিমিটি করে হাসতে থাকল। তাকে দেখে মনে হলো সে কোনও মজার দৃশ্য দেখছে।

কালা খাঁর কণ্ঠস্বর শুনে আরিফুর রহমান তাঁর লাল চোখ খুলে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললেন, 'জয়ন্ত, আমাকে কালা খাঁর সেলের সামনে নিয়ে যাও।'

জয়ন্তর কাঁধে ভর দিয়ে আরিফুর রহমান কালা খাঁর সেলের সামনে দাঁড়াতেই কালা খাঁ গরাদের ফাঁক দিয়ে তার ডান হাতটা বের করল, তারপর আরিফুর রহমানের পুরুষাঙ্গের উপর চেপে ধরল। ব্যথায় আরিফুর গুঙিয়ে উঠলেন। কালা খাঁ মোলায়েম গলায় আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল, 'একটু সহ্য করেন, স্যর, সব ব্যথা ঠিক হয়ে যাবে।'

কালা খাঁ তার ডান হাত আরিফুর রহমানের পুরুষাঙ্গের উপরে চেপে রাখা অবস্থায়, চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে কী যেন আওড়াতে থাকল। কয়েক মুহূর্ত পর তার চেপে থাকা ডান হাতের মধ্যে উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি দেখতে পাওয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর আলোর ঝলকানি শেষ হয়ে গেল। কালা খাঁ চোখ খুলল। পুরুষাঙ্গের উপর থেকে ডান হাতটা সরিয়ে নিল। মুখটা হাঁ করল, অমনি তার মুখের মধ্য থেকে এক ঝাঁক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকার মত কী যেন বেরিয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল!

দৃশ্যটা আরিফুর রহমান, জয়ন্ত, হারুন মৃধা প্রত্যেকেই দেখতে পেল। আরিফুর রহমান ও জয়ন্ত ইঁদুরকে সারিয়ে তোলার পর যতটা অবাক হয়েছিল তার চেয়েও অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। হারুন মৃধা চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলতে থাকল, 'ও একটা পিশাচ, এই জেলে পিশাচ এসে জুটেছে। আজই জেলার সাহেবকে জানাতে হবে।'

আরিফুর রহমান কিছুটা ধাতস্থ হয়ে টের পেলেন তাঁর সমস্ত ব্যথা-যন্ত্রণা সেরে গিয়েছে। ভাবলেন, কালা খাঁকে তার এই ক্ষমতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। কিন্তু তার আগেই কালা খাঁ ক্লান্ত ভঙ্গিতে কম্বলটা মুড়ি দিয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে পড়ল।

আরিফুর রহমানের রোগটা সম্পূর্ণ সেরে গেছে। টয়লেটে গিয়ে আরাম করে তিনি প্রস্রাব করলেন। আজ থেকে তিনি পরিপূর্ণ সুস্থ একজন মানুষ!

পাঁচ

আজ রাতে হানিফ মোল্লার ফাঁসি কার্যকর করা হবে।

জল্লাদ পাওয়া যাচ্ছিল না বলে জেলার সাহেব এবং আরিফুর রহমান বেশ চিন্তিত ছিলেন। দু-জনে আলোচনার মাধ্যমে একটা উপায় বের করেছেন।

বেশ কিছুদিন ধরে জেলার সাহেব ঠিকভাবে কাজে মন বসাতে পারছেন না। তিনি এক মহা বিপদে আছেন। তাঁর স্ত্রীর ব্রেইন ক্যানসার হয়েছে। রোগটার কাছে ডাক্তাররা হার মেনে নিয়েছেন। মৃত্যুর প্রহর গুনতে বলেছেন তাঁরা। জেলার সাহেব তাই মানসিক দিক দিয়ে একেবারে ভেঙে পড়েছেন। বর্তমানে বলতে গেলে জেলের সব দায়িত্ব আরিফুর রহমানের উপর।

হানিফ মোল্লার ফাঁসি কার্যকর করতে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, তা হলো, হারুন মৃধা জল্লাদের দায়িত্ব পালন করবে। হারুন মৃধার অনেক দিনের শখ পূরণ হবে। সে খুব আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। গত এক সপ্তাহ ধরে হারুন মৃধা ফাঁসির রশিতে কলা, মাখন, মবিল মাখিয়ে বালির বস্তা ঝুলিয়ে, ফাঁসি দেওয়ার মহরৎ করছে। আর মাঝে মধ্যে কর্কশ কণ্ঠে গান গাইছে, 'আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে...'

রাত এগারোটা আটান্ন মিনিট। আর তিন মিনিট পরে বারোটা এক মিনিটের সময় হানিফ মোল্লার ফাঁসি কার্যকর করা হবে। আরিফুর রহমান, জেলার সাহেব, একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, মেডিকেল অফিসার ডা. আতিক, জেলা প্রশাসক আব্দুল হক, জয়ন্ত—বেশ কয়েকজন উপস্থিত।

হানিফ মোল্লাকে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড় করানো হয়েছে। তার হাত পিছন দিকে বাঁধা। মাথা, মুখমণ্ডল কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে, গলায় ফাঁসির রশি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। হারুন মৃধা জল্লাদের দায়িত্ব পালন করছে। সে আনন্দিত ভঙ্গিতে কপিকলের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ডান হাতে সাদা রুমাল উঁচিয়ে রেখে বাম হাতের ঘড়ির দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে আছেন। বারোটা এক বাজতে এখনও এক মিনিট বাকি।

উপস্থিত সবাই যেন শ্বাস বন্ধ করে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু হারুন মৃধার মধ্যে কেমন চঞ্চলতা দেখা যাচ্ছে। তার দৃষ্টিতে কৌতূহল খেলা করছে। মনে হচ্ছে, বারোটা এক মিনিট বাজতে দেরি হওয়ায় সে অস্থির হয়ে উঠেছে।

নীরবতার মাঝে ক্ষীণ ফুস-ফুস শব্দ হচ্ছে। এই শব্দ হানিফ মোল্লা করছে। লোকটা কাঁদছে। মুখমণ্ডল ঢাকা কালো কাপড়টার গালের দু-পাশ ভিজে চুপচুপে হয়ে উঠেছে। দৃশ্যটা দেখে আরিফুর রহমানের চোখ আর্দ্র হয়ে উঠছে। হানিফ মোল্লাকে যখন হাঁটিয়ে ফাঁসির মঞ্চের দিকে নিয়ে আসা হয়েছিল তখনও লোকটা কত স্বাভাবিক ছিল। হাতের মুঠে সেই কালো ইঁদুরটা ছিল। ফাঁসির মঞ্চে ওঠার ঠিক আগ মুহূর্তে ইঁদুরটা আরিফুর রহমানের হাতে দিয়ে বলল, 'স্যর, আমার সুজনকে একটু দেখে রাখবেন।'

বারোটা এক মিনিট। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হাতের রুমাল ছেড়ে দিলেন। রুমাল মাটিতে পড়ার সাথে সাথে হারুন মৃধা কপিকলের হাতলে চাপ দিল। মুহূর্তের মধ্যে হানিফ মোল্লার পায়ের নীচের পাটাতন সরে গিয়ে ফাঁসি কার্যকর হলো। তবে বড় ধরনের একটা দুর্ঘটনা ঘটল—হানিফ মোল্লার ধড়টা মাথা থেকে ছিঁড়ে পাটাতনের নীচে পড়ে গেল, আর মাথাটা রশির সাথে ঝুলে রইল। রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল ফাঁসির মঞ্চ।

জেলার সাহেব রাগে হম্বিতম্বি শুরু করলেন। তিনি গর্জন করে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কী করে হলো?'

আরিফুর রহমান জেলার সাহেবকে বোঝালেন, 'হারুন মৃধা জল্লাদ হিসেবে অনভিজ্ঞ, তাই এই দুর্ঘটনা। রশিটার ঝুল রাখা উচিত ছিল আসামীর বুক বরাবর কিন্তু সবার অলক্ষে রশির ঝুল হয়তো নাভির নীচে দেওয়া হয়েছিল, তাই এই বীভৎসতা।'

অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে জেলার সাহেবকে শান্ত করা হলো। তবে এই কাজের জন্য হারুন মৃধার মধ্যে কোনও অনুতাপ বা অপরাধ বোধ দেখা গেল না। সন্দেহ হলো আরিফুর রহমানের, হারুন মৃধা জেনে-বুঝেই এই অপকর্মটা করেছে। ফাঁসি দেওয়ার মহড়া করার সময় তাকে অনেকবার বলে দেওয়া হয়েছে, রশির ঝুল আসামীর বুক বরাবর দিতে হয়, তার চেয়ে বেশি ঝুল দিলে, মাথা ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ছয়

আরিফুর রহমান কালা খাঁর কেস রিওপেন করাতে চান। তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, এই লোক খুনি হতে পারেন না, নিশ্চয়ই কোথাও বড় ধরনের কোনও ভুল হয়েছে।

কালা খাঁ কেস রিওপেন করাতে রাজি হননি। তিনি বলেন, 'এই যন্ত্রণাময় পৃথিবী থেকে যত দ্রুত চলে যাওয়া যায় ততই ভাল। যেখানে

সত্যের চেয়ে মিথ্যের দাপট বেশি, ভালর চেয়ে খারাপের স্থান ওপরে, সেখানে আর এক দিনও থাকতে চাই না।'

কালা খাঁ কেস রিওপেন করাতে রাজি না হওয়ায় আরিফুর রহমান বেশ ব্যথিত হয়েছেন। তিনি ক্লান্ত স্বরে কালা খাঁকে বলেছেন, 'রামনগর গ্রামে চেয়ারম্যানের ওই দুই মেয়ে যেদিন খুন হয়েছিল, সেদিন আসলে কী ঘটেছিল একটু খুলে বলবেন? আর খুন হওয়া মেয়ে দুটিকে আপনার কোলেই বা কীভাবে পাওয়া গেল? আপনাকে নাকি ওই গ্রামে এর আগে কেউ কখনও দেখেনি, তা হলে আপনি এলেনই বা কোত্থেকে? আপনার কাছে অনুরোধ এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অন্তত আমাকে দিন।'

কালা খাঁ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে, সেলের গরাদের ফাঁক দিয়ে তাঁর হাত বের করে বললেন, 'স্যর, আমার হাতটা ধরুন।'

আরিফুর রহমান কিছুটা এগিয়ে কালা খাঁর হাত ধরলেন, হ্যাণ্ডশেক করার ভঙ্গিতে। কালা খাঁ তাঁর হাত তীব্র ভাবে চেপে ধরে বললেন, 'এখন চোখ বন্ধ করুন।'

চোখ বন্ধ করার সাথে সাথে আরিফুর রহমানের মনে হলো, তাঁর শরীরের ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ চলে যাচ্ছে। এক সময় বিদ্যুৎ প্রবাহ থামল। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল ছায়াঘেরা একটা গ্রাম। গ্রামের বড় একটা বাড়ি। দুই-চালা টিনের বিশাল ঘর। সেই ঘরের সামনের উঠানে দুটি ফুটফুটে মেয়ে খেলা করছে। মেয়ে দুটি গ্রামের চেয়ারম্যানের মেয়ে। শহর থেকে চেয়ারম্যানের ভাগ্নে বেড়াতে এসেছিল। সে আজ চলে যাচ্ছে। ভাগ্নের কারারক্ষীর চাকরি হয়েছে তাই চাকরিতে জয়েন করার আগে মামার বাড়িতে কিছুদিন থেকে গেল। ঘরের ভিতরে থাকা চেয়ারম্যান ও তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে ভাগ্নে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল উঠানে। উঠানে তার দুই মামাতো বোন নিপা ও দিপা খেলা করছে। তাদের কাছ থেকেও সে বিদায় নিল।

চেয়ারম্যানের পাষণ্ড ভাগ্নের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে তার দুই মামাতো বোনের প্রতি। সে একটা প্ল্যান করে রেখেছে। চেয়ারম্যানবাড়ির অদূরে পেয়ারা বাগানে সে লুকিয়ে থাকবে। গ্রামের বাজারে মামার একটা কাঠ চেরাইয়ের মিল আছে। সেই মিলে প্রতিদিন মামা দশটা-এগারোটা নাগাদ চলে যায়। মামিও তখন রান্নাবান্নায় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। সেই সময় গিয়ে মামাতো বোনদের ভুলিলে-ভালিয়ে পেয়ারা বাগানে নিয়ে যাবে।

চেয়ারম্যানের ভাগ্নে তার মামাতো বোনদের পাকা পেয়ারার লোভ দেখিয়ে বাগানে নিয়ে গেল। পাষণ্ড ভাগ্নের সুচতুর কথার জালে আটকে অবুঝ মেয়ে দুটি চলে গেল বাগানের একেবারে উত্তর দিকে জঙ্গুলে ঝোপ-ঝাড়ে ঘেরা ভাঙা মন্দিরের কাছে। মন্দিরের ভিতরে ঢুকিয়ে পাষণ্ড লোকটা মেয়ে দুটির হাত-পা বেঁধে, মুখের ভিতর কাপড় গুঁজে দিয়ে, পর্যায়ক্রমে ধর্ষণ

করল। তার অসৎ উদ্দেশ্য সফল করে, মেয়ে দুটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেল।

আরিফুর রহমান চোখ খুলে নিজেকে আবিষ্কার করেন জেলের ২০১ নম্বর কনডেম সেলের সামনে। সেলের ভিতরে কালা খাঁ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর চোখ দিয়ে টপ-টপ করে পানি পড়ছে। আরিফুর রহমানের হাত ছেড়ে দিয়েছেন তিনি।

রামনগর গ্রামের দৃশ্য দেখে আরিফুর রহমান হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন। চেয়ারম্যানের সেই পাষণ্ড ভাগ্নে আর অন্য কেউ নয়, এই জেলেরই কারারক্ষী হারুন মৃধা। আরিফুর রহমান নিজের হতভম্ব ভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে, অবাক হওয়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তা হলে মেয়ে দুটিকে আপনার কোলে পাওয়া গেল কী করে!'

কালা খাঁ চোখ মুছতে-মুছতে বললেন, 'তা আমি জানি না। আমার কিছুই মনে নেই। আমার স্মৃতি এই থেকে...আমি মেয়ে দুটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি কিন্তু তার আগেই মেয়ে দুটি মারা গেছে।'

সাত

আরিফুর রহমান, আব্দুল হক, জয়ন্ত মিলে একটা পরিকল্পনা করেছে। রাত বারোটার পরে কালা খাঁকে নিয়ে জেলার সাহেবের বাড়িতে যাবে। জেলার সাহেবের স্ত্রীকে বাঁচানোর জন্য কালা খাঁকে দিয়ে শেষ চেষ্টা করাবে। কিন্তু উদ্দেশ্যের পথে বাধা হয়ে আছে হারুন মৃধা। ফাঁসির আসামীকে জেলের বাইরে নেওয়া আইনত অপরাধ। হারুন মৃধার চোখের সামনে কালা খাঁকে বাইরে নিলে সে নির্ঘাত উপর মহলে নালিশ জানাবে। তখন সকলের চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে।

হারুন মৃধার জন্য একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার রাতের চায়ের মধ্যে কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘুমের ওষুধ মিশানো চা খেয়ে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই চেয়ারে বসা অবস্থায় টেবিলের উপরে মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কালা খাঁকে নিয়ে জেলার সাহেবের বাড়িতে পৌছালে জেলার সাহেব ফাঁসির আসামীকে বাইরে দেখে প্রচণ্ড রেগে গেলেন। আরিফুর রহমান যখন তাঁর উদ্দেশ্যের কথা বুঝিয়ে বললেন, তখন তিনি কিছুটা শান্ত হলেন। কিন্তু অবিশ্বাসী গলায় বললেন, 'যে রোগের কাছে বড় বড় ডাক্তারই হার মেনেছে সে রোগ কী করে এই সামান্য লোকটা সারাবে!'

কালা খাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় জেলার সাহেবের স্ত্রীর কাছে। রুগ্ন, মৃতপ্রায় মহিলা এমন ভাবে বিছানায় পড়ে আছেন যেন জীবন্ত একটা কঙ্কাল বিছানার উপরে। চোখের নীচ, ঠোঁট শুকিয়ে কালো হয়ে গিয়েছে। মাথায় চুল নেই বললেই চলে। রুগ্ন মহিলার পাশে গিয়ে বসলেন কালা খাঁ। পরম যত্নে হাত রাখলেন মহিলার কপালের উপরে। আগের মত চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে কী যেন আওড়াতে থাকলেন। কিছু সময় পর হাতের মধ্যে সৃষ্টি হলো তীব্র আলোর ঝলকানি। এই মুহূর্তে বাড়ির সমস্ত বৈদ্যুতিক বাতি নিভু-নিভু অবস্থা হলো।

কালা খাঁর কাজ শেষ হওয়ার পর পরই জেলার সাহেবের স্ত্রী সহজ স্বাভাবিক ভাবে উঠে বসলেন। মুহূর্তেই যেন রুগ্ন মহিলার চেহারার মাঝে সুস্থতার ঝিলিক দেখা দিল। জেলার সাহেব খুশিতে দৌড়ে এসে কালা খাঁকে জড়িয়ে ধরলেন আর বলতে থাকলেন, 'গত তিন মাস পর ও শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসল।'

আরিফুর রহমানরা কালা খাঁকে নিয়ে জেলে ফিরে আসার পর ঘটল এক অঘটন। হারুন মৃধা ঘুম থেকে উঠে দেখেছে কালা খাঁকে সেলের ভিতরে ঢোকানো হচ্ছে। তার আর বুঝতে বাকি নেই কী ঘটেছে--তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে কালা খাঁকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সে কালা খাঁয়ের সেলের সামনে গিয়ে রাগে ফুঁসতে শুরু করল। কালা খাঁ গারদের শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ হারুন মৃধা হাতের রোলার দিয়ে কালা খাঁর হাতে আঘাত করতে ছুটে গেল। কালা খাঁ তড়িৎ গতিতে খপ করে হারুন মৃধার রোলার ধরা হাতটা ধরলেন, হারুন মৃধাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে, মুখটা বিকট ভাবে হাঁ করলেন। হাঁ করা মুখের ভিতর থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা বেরিয়ে এল। ওগুলো হারুন মৃধার নাকের ভিতরে ঢুকতে শুরু করল। জয়ন্ত ছুটে গিয়ে হারুন মৃধাকে টেনে কালা খাঁর হাত থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল। কিন্তু এক চুলও নড়ানো সম্ভব হলো না। কালা খাঁর শক্তির কাছে জয়ন্ত ও হারুন মৃধা দুজনেই হার মানল

কিছুক্ষণ পর কালা খাঁ নিজেই হারুন মৃধাকে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু ততক্ষণে কালা খাঁর মুখ দিয়ে বের হওয়া হাজার-হাজার পোকার ঝাঁকের সবটাই হারুন মৃধার নাকের ভিতরে ঢুকে গেছে।

কালা খাঁর হাত থেকে মুক্ত হওয়ার পর হারুন মৃধা অদ্ভুত আচরণ করতে থাকল। সে শিশুদের মত হাম্বা দিতে শুরু করল, মুখ দিয়ে কুকুরের মত জান্তব এক ধরনের শব্দ করতে থাকল।

আট

রাত তিনটা। আর এক মিনিট পরে কালা খাঁর ফাঁসি কার্যকর করা হবে। মাথা, মুখমণ্ডল কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে গলায় ফাঁসির রশি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কালা খাঁর কেস রিওপেন করানোর ব্যাপারে জেলার সাহেবও উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু কালা খাঁ রাজি হননি। জেলার সাহেবের স্ত্রীর ব্রেইন ক্যান্সার পুরোপুরি সেরে গেছে। তাঁর মস্তিষ্ক স্ক্যান করে বড় বড় ডাক্তাররা অবাক হয়ে গেছেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হাতের রুমাল ছেড়ে দিলেন। রুমাল নীচে পড়ার সাথে সাথে জল্লাদ কপিকলের হাতলে চাপ দিল। পায়ের নীচের প্যাটাতন সরে গিয়ে মুহূর্তে ফাঁসি কার্যকর হলো।

কালা খাঁর ফাঁসি হওয়ার পর পরই জেলের প্রতিটি বৈদ্যুতিক বাল্ব বিকট শব্দ করে চূর্ণবিচূর্ণ হতে শুরু করল। শহরের সমস্ত স্ট্রিট বাল্বও একে একে ফাটতে লাগল। কিছু সময়ের জন্যে শহর ডুবে গেল গভীর অন্ধকারে।

একশ' বছর পর।

ঢাকা চিড়িয়াখানা।

বয়সের ভারে নুয়ে পড়া এক বৃদ্ধ ধীরে ধীরে হেঁটে বেড়াচ্ছেন চিড়িয়াখানায়। বৃদ্ধের শার্টের বুক পকেটে একটা ইঁদুর। ইঁদুরটার গায়ের পশম বাদামি মলিন ধরনের। দেখে মনে হচ্ছে ইঁদুরটাও বৃদ্ধের মতই বয়সী। অদেখা ভুবনের একজনের আশীর্বাদে তারা আজও বেঁচে আছে।

বৃদ্ধ তাঁর ইঁদুর সঙ্গী সহ চিড়িয়াখানার একটা নির্দিষ্ট খাঁচার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। গত একশ' বছর ধরে প্রতিমাসে একবার বৃদ্ধ এই খাঁচাটার সামনে এসে দাঁড়ান। এই খাঁচার ভিতরে অদ্ভুত একটা প্রাণী। প্রাণীটা দেখতে কিছুটা কুকুরের মত। কিন্তু ওটার মুখের সাথে মানুষের চেহারার বেশ মিল।

অদ্ভুত জন্তুটা এতক্ষণ চাপা গর্জন করছিল। বৃদ্ধকে দেখে, গর্জন থামিয়ে বৃদ্ধের চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। বৃদ্ধ তাঁর বুক পকেট থেকে ইঁদুরটাকেও বের করে সেই অদ্ভুত জন্তুটাকে দেখালেন, আর ইঁদুরের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'সুজন, চিনতে পেরেছিস পাষণ্ড হারুন মৃধাকে!'

জন্তুটার অবাক হওয়া চাহনি দেখে বোঝা গেল সেও বুঝতে পারছে, এই বৃদ্ধ আসলে আরিফুর রহমান!

[বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে]

অভিশপ্ত হোস্টেল

রুবি সরকারী মহিলা কলেজের উচ্চ মাধ্যমিকের ১ম বর্ষের ছাত্রী। তার বাড়ি আগৈলঝড়া, সেখান থেকে শহরে এসে কলেজের হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করছে। তার বাবার আগৈলঝড়া বাজারে একটি মুদি দোকান রয়েছে। সেই দোকানের আয় থেকেই তাদের সংসার চলে। কলেজের হোস্টেলে না থেকে, কোন মেসে বা ঘর ভাড়া করে থাকার মত অর্থনৈতিক সামর্থ্য তার নেই। যদি থাকত তা হলে সে অনেক আগেই হোস্টেল ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেত।

তিন তলা ও দুই তলা দুইটি হোস্টেল বিল্ডিং, সুবিশাল কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যেই। দুটি বিল্ডিংয়ের একটি পুরানো বিল্ডিং, অন্যটি নতুন বিল্ডিং নামে পরিচিত। পুরানো বিল্ডিংটি উত্তর দিকে আর নতুন বিল্ডিংটি পূর্বপাশে। বড় বড় গাছপালা ঘেরা কলেজ ক্যাম্পাসের চারপাশ। শুধু কলেজের অফিস ঘর এবং পাঁচতলা মূল ভবনটির সামনে ছোট্ট করে একটা ফুলের বাগান। ছায়া ঘেরা, পাখি ডাকা, হালকা মৃদু মন্দ হাওয়া বয়ে যাওয়া কলেজ ক্যাম্পাস। ক্লাসের ফাঁকে মেয়েদের কণ্ঠের কলকাকলিতে ভরে ওঠে সারা ক্যাম্পাস। ক্লাস শেষে বিকেলের পর থেকে, পরের দিন সকাল দশটা পর্যন্ত এবং ছুটির দিনগুলোতে নীরব নিভৃতই থাকে ক্যাম্পাস। শুধু হোস্টেল দুটিতে থাকা মেয়েগুলোর হাসি ঠাট্টার শব্দ পাওয়া যায় মাঝে মাঝে।

কলেজের পরিবেশ, পরিস্থিতি, নিয়ম-কানুন সবই পছন্দ হয়েছে রুবির। কলেজটি মহিলা কলেজ বলে অফিস টাইম ছাড়া কোন পুরুষ লোক ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারে না। কোন মেয়ের কোন আত্মীয়, ভাই বা বাবা দেখা করতে আসলেও ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। গেটে দারোয়ানের কাছে স্লিপ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। পরে ওই মেয়েটি এসে দেখা করে যায়। এই নিয়মও আবার রাত আটটা পর্যন্ত। আটটার পর থেকে কোন মেয়ে গেটের বাইরে যেতে পারবে না, শুধু বিশেষ প্রয়োজনে হোস্টেল সুপার জাহানারা ম্যাডামের লিখিত অনুমতি ছাড়া।

সব কিছুই ঠিক ছিল, সবই পছন্দ হয়েছিল রুবির। শুধু পুরানো বিল্ডিংয়ের হোস্টেলে তার সিট পড়েছে বলে তার মনের মধ্যে এক ধরনের চাপা ভয় কাজ করছে। পুরানো বিল্ডিংয়ের দুই তলার ২১ নং রুমে তার সিট পড়েছে, তার রুমমেট ঝর্না নামের আর একটি মেয়ে। রুম নিয়েও

সমস্যা নেই, সমস্যাটা হচ্ছে পশ্চিম দিকের একেবারে শেষ মাথার গাছ-গাছালি ঘেরা বাথরুমটা নিয়ে। আর এই বাথরুমটার একটু দূরত্বের রুমটাই হচ্ছে ২১ নং রুম। দুই তলায় থাকা সব মেয়েরাই নির্বিঘ্নে ওই বাথরুমটিই ব্যবহার করে। কিন্তু ওই বাথরুম সম্পর্কে অনেক ভীতিকর কথা শোনা যায়। বাথরুমটায় মাঝে মাঝে নাকি ভৌতিক কর্মকাণ্ড হয়। হোস্টেলের প্রাক্তন অনেক ছাত্রীর ওই বাথরুম সম্পর্কে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে এগুলো শোনা কথা, সাক্ষী-প্রমাণ নেই। কিন্তু কলেজের অধিকাংশ ছাত্রী, শিক্ষক, কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে ওই হোস্টেলটায় কিছু একটা অপার্থিব ব্যাপার রয়েছে।

শোনা যায় হোস্টেলের আগের অনেক মেয়েই নাকি বলেছে ওই বাথরুমে কেমন যেন একটা অশরীরী অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। অনেক রাতে মেয়েরা ওই বাথরুম থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েছে। মেয়ে মানুষের কান্নার শব্দ। হঠাৎ কান্নার শব্দ ছাপিয়ে অট্টহাসির শব্দ। এমন কী দিনের বেলায়ও মেয়েরা ভয় পেয়েছে। একবার ঈদের আগে আগে, অধিকাংশ মেয়েরাই বাড়ি চলে গেছে, এমন এক ভর দুপুরে, এক মেয়ে একা একা বাথরুমে যায়। মেয়েটা বন্ধ বাথরুমের ভিতরে, হঠাৎ দেখতে পায়, বাথরুমের ভিতরটা কেমন যেন ধোঁয়া-ধোঁয়া ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে তীব্রভাবে পচা মাংস পোড়া গন্ধ। মেয়েটা ভয় পেয়ে জলদি করে বাথরুমের দরজার ছিটকিনি খুলতে চায়, কিন্তু সে দেখতে পায় ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকানো একটা অদৃশ্য হাত তার হাতটা চেপে আছে। মেয়েটা প্রাণপণে চিৎকার শুরু করে, তখন অন্য মেয়েরা এসে দরজা ধাক্কাধাক্কি শুরু করলে, মেয়েটা কোনভাবে দরজা খুলে বাইরে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এর পর ওই মেয়ে আর কখনও হোস্টেলে থাকেনি।

হোস্টেলের ওই বাথরুমটা সম্পর্কে সব ছাত্রীই কিছু না কিছু জানে। অনেকে বলে এই হোস্টেলটা এক সময় এক জমিদারের বাগান বাড়ি ছিল। সে বিভিন্ন কুমারী মেয়েদের এখানে ধরে নিয়ে এসে নির্যাতন করত অনেক মেয়ে কষ্ট সইতে না পেরে ওই বাথরুমে ঢুকে গায়ে কেরোসিন মেখে, আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করেছে। ওই মেয়েদের অতৃপ্ত আত্মাই নাকি এখনও এই হোস্টেলে রয়ে গিয়েছে। আবার অনেক ছাত্রীরা বলে, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও এই বিল্ডিংটি মেয়েদের হোস্টেলই ছিল, হিন্দু মেয়েদের হোস্টেল। এক রাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এসে, হোস্টেলের মেয়েদের জিম্মি করে, একের পর এক নির্যাতন চালিয়ে যায়। অনেক মেয়ে নিজেকে বাঁচাতে ওই বাথরুমের ভিতর লুকিয়ে থাকে, শেষমেশ উপায় না দেখে, বাথরুমে থাকা ব্লেড দিয়ে হাত পায়ের শিরা কেটে আত্মহত্যা করে। পরে ডোমেরা যখন লাশ উদ্ধার করে তখন ওই

বাথরুমের মধ্যে দেখতে পেয়েছিল পাঁচটি তরুণী কী ভাবে ভয়ে জড়সড় হয়ে, একে অপরকে জড়িয়ে ধরে রক্তে রঞ্জিত হয়ে, ভীত অবাক চোখে মরে পড়ে আছে। তাই অনেকে বলে ওই পাঁচটি মেয়ের আত্মাই এখন ওই অভিশপ্ত বাথরুম ঘিরে রয়েছে।

রুবি বাথরুম সম্পর্কে এত কিছু শুনে, ভয়ে একেবারে তটস্থ হয়ে থাকে। এই হোস্টেলেই তার থাকতে ইচ্ছে করে না। তার পরও, কী করার, উপায় নেই, এখানেই থাকতে হবে। তবে তার রুমমেট ঝর্না নামের মেয়েটি খুবই সাহসী। ভূত বলে যে পৃথিবীতে কিছু আছে তা এই মেয়েটি বিশ্বাসই করে না। রুবি কখনও যদি ভূত সম্পর্কে কিছু বলে ঝর্নাকে, তবেই হলো, 'ভূত এসে তোকে চুমু খাবে, জড়িয়ে ধরবে, আদর করবে, তারপর...হা...হা।'

গভীর রাতে রুবির যখন টয়লেট পায় তখন ঝর্নার যাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে, একা বাথরুমে যেতে ভয় লাগে বলে। ঝর্না চটির পটর-পটর শব্দ তুলে হিন্দি গান গাইতে-গাইতে বাথরুমের দিকে এগোতে থাকে, আর তার পাশে জড়সড় রুবি কুঁজো হয়ে হাঁটতে থাকে। একজন বাথরুমের ভিতরে গেলে অন্য জন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। ঝর্না যখন বাথরুমের ভিতরে থাকে আর রুবি দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে তখনও শুনতে পায় বাথরুমের ভিতরে ঝর্না গুন-গুন করে হিন্দি গান গেয়েই চলেছে।

ঝর্নার মত সাহসী একটা মেয়ে পাশে থাকায়, রুবির হোস্টেলের দিনগুলো ভালই কাটছিল। আরও জানতে পেরেছে সে বিগত সাত-আট বছরে কোন মেয়ে ভৌতিক কিছুই দেখতে পায়নি। হোস্টেলের সাহসী মেয়েদের মন্তব্য ভূত সম্পর্কিত এসব কথা স্রেফ গুজব। রুবি আজকাল বেশ সাহসী হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার পর ছাড়া দিনের বেলাতে একাই সাবলীলভাবে বাথরুম ব্যবহার করে।

এমনই একদিন দুপুরে, দুটো বা আড়াইটা বাজে। রুবি এক বান্ধবীর বাসা থেকে হোস্টেলে ফিরেই গোসল করার জন্য বাথরুমে গিয়েছে। ট্যাপের নীচে বড় একটা বালতি রেখে মাথা নুইয়ে, মাথায় পানি দিচ্ছে। আর ভাবছে, আজ যে বান্ধবীর বাসায় গেল তার কথা। বান্ধবীটি কতই না সুখে আছে, এখানে স্থানীয় বাড়ি ঘর, প্রতিদিন রিকশা করে কলেজে আসে আবার বাসায় ফিরে যায়, মায়ের হাতের রান্না খেতে পারে। বাবা-মা, ভাইয়ের আদরে কতই না সুখী জীবন মেয়েটার। আর রুবির বাবা-মা রয়েছে কত দূর গ্রামে, মায়ের হাতের রান্না খাওয়া তো পরের কথা, কত দিন মাকে দেখেইনি। মা-বাবার কথা মনে করতেই রুবির চোখ জ্বালা করতে শুরু করে। বালতি থেকে আঁজলা ভরে কিছু পানি তুলে চোখে ছিটিয়ে দিয়ে আবার মাথা নুইয়ে পানি দিতে থাকে। বান্ধবীর ভাইটিকে

খুবই সুপুরুষ মনে হয়েছে রুবির। গম্ভীর ভরাট কণ্ঠ, দেখেই মনে হয় খুবই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক, অন্য ছেলেগুলোর মত হ্যাংলা টাইপের নয়। 'এমন একটা মানুষকে যদি জীবন সাথী হিসাবে পাওয়া যেত! ছিহ্! এসব কী ভাবছি,' রুবি মনে-মনে বলে। বান্ধবীর বাড়ি থেকে আসার সময় বান্ধবীর ভাইটি শুধু বান্ধবীর অনুরোধে রাস্তার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে এসে রিকশায় উঠিয়ে দিয়েছে আর কথা বলতে এইটুকুই, 'তোমার নাম কি রুবি?' আর এতেই কী সব ভাবছি, রুবি নিজে-নিজে খুব লজ্জাবোধ করে। হঠাৎ বালতির দিকে চোখ যেতেই চমকে ওঠে। বালতির পানির রং টকটকে লাল, মনে হচ্ছে পানি নয় যেন রক্ত। আর রক্ত ভরা বালতির মধ্য থেকে শীর্ণ দুটি হাত, ছাগলের লোমের মত কালো লোমে আবৃত, তার দিকে উঠে আসছে। সে চিৎকার করে ছিটকে পড়ার আগেই তার একটি হাত ওই কালো লোমে আবৃত হাতখানা চেপে ধরে। রুবি ওই কালো হাতের মুঠো থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে-করতে আকাশ ফাটানো চিৎকার ছাড়ে। চিৎকার শুনে মেয়েরা দৌড়ে এসে বাথরুমের দরজায় ধাক্কাধাকি শুরু করার পর, রুবি কীভাবে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েছিল তা জ্ঞান ফিরে পাবার পর নিজেও বলতে পারেনি। রুবির ওই ভয়ঙ্কর হাতের কথা শুনে, ঝর্না ও অন্যান্য মেয়েরা সবাই মিলে রুবিকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে দেখায়, কোথায় বালতি ভরা রক্ত আর কালো হাত? বালতিতে এক বালতি টলটলে পানি, তার উপরে হালকা একটু তেল, যার সাথে রুবির মাথার দুই তিনটি চুলও ভাসছে।

এই ঘটনার পর রুবি হোস্টেল ছেড়ে চলে যেত, কিন্তু অনেক ভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঝর্না তাকে জোর করে হোস্টেলে রাখে। ঝর্না রুবিকে বোঝায়, 'দেখ, রুবি, তুই সেদিন দুপুরে যে কাণ্ডটা করলি এটা স্রেফ তোর মনের ভুল, তুই সারাদিন আজগুবি চিন্তা ভাবনা করে এই অবস্থার সৃষ্টি করেছিস। তুই যেটা দেখেছিস সেটা সম্পূর্ণ একটা হ্যালুসিনেশন। শুধু তুই না, এর আগেও যে মেয়েরা এই সব ব্যাপার দেখেছে তাদের ক্ষেত্রেও। মেয়েরা যখন এই হোস্টেলে থাকতে আসে তখনই শুনতে পায় ওই বাথরুমটায় জমিদার আমলে এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় মেয়েরা আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যার এই ব্যাপারটা হোস্টেলের মেয়েদের মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে, এক সময় ভৌতিক শব্দ শুনতে পায়, ধীরে-ধীরে চোখের সামনে দেখতেও পায়। অডিটরি হ্যালুসিনেশন ভিস্যুয়েল হ্যালুসিনেশনে রূপ নেয়। তুই একটু বেশি পরিমাণে ভীতু বলে তোর ক্ষেত্রে প্রথমেই ভিস্যুয়েল হ্যালুসিনেশন হয়। ভয়টাকে জয় করতে শেখ, এভাবে ভয় পেয়ে যদি পালিয়ে যাস তবে কোন দিনও তোর ভয় কাটবে না। অন্য যেখানে যাবি সেখানের বাথরুমেও ভৌতিক কর্মকাণ্ড দেখবি। আর তুই চলে গেলে

আমি একা হয়ে যাব, কিছুদিন পরে হয়তো আমিও ভূত দেখা শুরু করব। আমিও তো একটা মেয়ে, আমার মনের মধ্যেও ভয় লুকানো আছে। সব সময় সাহস নিয়ে থাকি, ভয়কে প্রশ্রয় দেই না, কারণ প্রশ্রয় পেলেই ভয় মনের মাঝে শিকড় গেড়ে বসে পড়বে।'

রুবি কোন বারণই শুনত না, হোস্টেল ছেড়ে সে চলেই যেত, কিন্তু ঝর্না শেষে যখন বলেছে, রুবি চলে গেলে ঝর্নার একা-একা ভয় লাগবে, তখন এতদিনের রুমমেটের প্রতি সহানুভূতি অনুভব করে হোস্টেলেই থেকে যায়।

এর পর প্রায় বছর খানেক কেটে গেছে, রুবি আর ভয়ঙ্কর কিছু দেখেনি। আর ওই ঘটনার পর থেকে রুবি আর কখনও একা বাথরুমে যায় না, ঝর্নাকে সাথে নিয়ে যায়। ঝর্না আগের মত গুন-গুন করে গান গাইতে থাকে।

দেখতে দেখতে পরীক্ষা এসে যায়। ঝর্না পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এতদিন মোটেই পড়াশুনা করেনি বলে পরীক্ষার আগে সিলেবাস কমপ্লিট করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। রাত দুটো-আড়াইটা পর্যন্ত সে জেগে থাকে। এদিকে রুবি বারোটা-সাড়ে বারোটা বাজলেই ঘুমিয়ে পড়ে।

এমনই একদিন নিশুতি বৃষ্টির রাত, প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। রাত প্রায় পৌনে তিনটা। রুবি বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। আর ঝর্না বই বন্ধ করে ঘুমানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তবে টের পায় তার আগে বাথরুমে যাওয়া দরকার। হোস্টেলের টানা বারান্দা দিয়ে, বৃষ্টির শব্দের সাথে চটির পটর-পটর শব্দ তুলে হেঁটে-হেঁটে চলে যায় বাথরুমে। একটা হুতুম পেঁচার থেমে-থেমে, কুক-কুক শব্দের ডাক ভেসে আসে উত্তর দিকের বড় বাদাম গাছটা থেকে। ঝর্না ভাবে, সে কি এর আগে কখনও বৃষ্টির রাতে কোন পাখির ডাক শুনেছে? ভাবতে-ভাবতেই টয়লেটের প্যানের উপর বসে, চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। হঠাৎ তার ঘাড়ে ফোঁটা ফোঁটা তরল কিছু পড়ার শব্দ টের পায়। হাত দিয়ে ঘাড়ে পড়া তরল ফোঁটা মুছে চোখের সামনে এনে দেখতে পায়, লাল ঘোলাটে এক ধরনের কিছু। মনে হচ্ছে পচা রক্ত, বোটকা গন্ধও আসছে। তরল ফোঁটার উৎপত্তিস্থল দেখার জন্য ঝর্না ঘাড় কাত করে উপরের দিকে তাকাতেই স্তম্ভিত হয়ে যায়। একটা মেয়ের আধপচা গলিত রক্তাক্ত লাশ বাথরুমের ছাদের সাথে উল্টো ভাবে ঝুলছে। মেয়েটা উলঙ্গ, মাথা, চুল, হাত নীচের দিকে ঝুলে আছে আর তা থেকে পচা রক্ত বেয়ে-বেয়ে টপ-টপ করে পড়ছে। চোখটা উল্টে কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে আর জিভটা প্রায় এক হাত বেরিয়ে ঝুলে আছে। চোখের কোটর আর জিভ থেকেও সেই ঘন তরল ঝরছে। ঝর্না ভয় পেয়ে চিৎকার করতে চায়, কিন্তু সে তার বাক্ শক্তি হারিয়ে ফেলে। উঠে দৌড়ে পালিয়ে যাবার

চিন্তা করে, তখনই দেখতে পায় উল্টো ভাবে ঝুলে থাকা পচা গলা লাশটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। চোখ দুটি একবার কোটরের ভিতরে যাচ্ছে, আবার বেরিয়ে শূন্যে ঝুলছে, জিভটাও দুইহাত পর্যন্ত লম্বা হয়ে ল্যাক-ল্যাক করছে, আবার সাপের মত মুখের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। হাত দুটোও নাড়াবার চেষ্টা করছে, হাতের চামড়া ফেটে পচা মাংস খসে খসে পড়ছে। ঝর্না তখনও ছুটে পালাবার চিন্তা করে, কিন্তু তার আগেই পচা লাশটা ধুপ করে তার গায়ের উপর পড়ে, সঙ্গে ভয়ঙ্কর পৈশাচিক হাসির শব্দ।

ঝর্না সকাল পর্যন্ত ওই বাথরুমে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে ছিল। সকালে মেয়েরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রায় একদিন পর তার জ্ঞান ফেরে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা ছিল না, উল্টো-পাল্টা বকতে থাকে, ভয়ে কুঁকড়ে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে। বেশ কিছুদিন ধরে ঝর্না ভয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে অবশেষে হার মেনে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়।

ঝর্না মারা যাওয়ার পর রুবি হোস্টেল ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আর কলেজ কর্তৃপক্ষ, হোস্টেলের সেই বাথরুমটি দেয়াল করে চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছিল।

রুবির আর বেশিদূর পড়াশুনা হয়নি। সে একা হলেই ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ে। তার মনে হয় ঘাড়ের পিছনে কেউ নিঃশ্বাস ফেলছে, পরিচিত নিঃশ্বাসের শব্দ—ঝর্নার। কিন্তু পিছনে তাকালে কাউকে দেখা যায় না। ভীতু মেয়েটার বিয়ে হয়ে যায়। শহরের স্থানীয় বান্ধবীর সেই গম্ভীর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভাই শফিকের সঙ্গেই।

মধ্যরাত। রুবি তার ঘুমন্ত স্বামীর পাশে শুয়ে আছে। একটু আগে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছে। প্রচণ্ড টয়লেট পেয়েছে, কিন্তু একা যেতে খুব ভয় লাগছে। পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা সে, শরীরটাও আজ বেশ অসুস্থ। স্বামী বেচারীর দিকে তাকিয়ে রুবির খুব মায়া লাগছে, অফিসে সারাদিন পরিশ্রম করে এসে, ক্লান্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে। এমন একটা ঘুমন্ত মানুষকে কী করে ডেকে তোলা যায়। রুবি একাই খালি পায়ে পা টিপে-টিপে বাথরুমে চলে যায়। বাথরুমের দরজার ছিটকিনি বন্ধ করতেই আবার সেই ঘাড়ের পিছনে নিঃশ্বাসের শব্দ পায়। এবার পিছন ফিরতে সত্যি সত্যিই সে কিছু দেখতে পায়। দেখতে পায় তার রুমমেট ঝর্না দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দুটি হিংস্র পশুর মত জ্বল জ্বল করছে, আর রোগা পাতলা, কালো কুচকুচে উলঙ্গ দেহটা যেন দীর্ঘদিন অনাহারে কাটিয়েছে। পাটকাঠির মত চিকন দুটি হাত বড়-বড় নখ দিয়ে মাথার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বুড়ো মানুষের মত কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে বলছে, 'রুবি, খুব খিদে, খুব তৃষ্ণা আমার। আমার এই খিদে শুধু তোর ওই পেটের বাচ্চাটাই মিটাতে পারে, দে বাচ্চাটা আমাকে দে,' বলে রুবির দিকে এগোতে থাকে সাপের মত লকলকে কালো দুটি

পা দিয়ে লেংচাতে-লেংচাতে। রুবি চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

রুবি এখন শের-ই-বাংলা মেন্টাল হসপিটালের ১১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা। সেই রাতে, বন্ধ বাথরুমের মধ্যেই রুবির গর্ভপাত হয়ে গিয়েছিল। শেষ রাতের দিকে তার স্বামী ঘুম থেকে উঠে দেখতে পায় রুবি বাথরুমের মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, আর তার কোমরের নীচের শাড়ি, হাঁটু, পা, বাথরুমের মেঝে তাজা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। জলদি করে তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়। সে সময় রুবির স্বামীর কেন যেন বারবারই মনে হচ্ছিল কেউ একজন শুকনো কালো পাট কাঠির মত দেখতে, দূরে দাঁড়িয়ে খিল-খিল করে হাসছে।

অপার্থিব প্রেয়সী

এক

খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা আমার স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। গত পনেরো দিন ধরে আমাকে সেই কাজটিই করতে হচ্ছে। আমি এখন মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামের হাজী আব্দুল কাদের ডিগ্রী কলেজের প্রিন্সিপাল মোবারক হোসেনের বাংলা ঘরের বাসিন্দা। পনেরো দিন আগে আমি এই গ্রামে এসেছি। চাকরির সুবাদে আসা। অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টার পরেও যখন একটা চাকরি জোটাতে পারিনি তখন এই কেশবপুর গ্রামের হাজী আব্দুল কাদের ডিগ্রী কলেজের হিসাব বিজ্ঞানের প্রভাষকের চাকরিটা পাই। কী আর করা! মফস্বল শহরের ছেলে হয়েও বাধ্য হয়ে গ্রামের এই অজ পাড়া-গাঁয়ে এসে পড়ে থাকতে হচ্ছে।

গ্রামে হোটেল, মেস বা ওই জাতীয় থাকার কোনও ব্যবস্থা নেই। আমার ইচ্ছে ছিল কারও বাড়িতে ভাড়া থাকার। সেটাও সম্ভব নয়। গ্রামের মানুষ বাড়ি ভাড়া দেয় না। শেষ পর্যন্ত কলেজ কমিটির সিদ্ধান্তে আমার থাকার ব্যবস্থা হয় প্রিন্সিপাল মোবারক হোসেনের বাংলা ঘরে।

প্রিন্সিপাল মোবারক হোসেন খুবই আন্তরিকতার সাথে আমাকে গ্রহণ করে, তাঁর বাড়িতে এনে ওঠান। এমনিতেও তিনি যথেষ্ট মার্জিত ব্যবহারের অধিকারী। ছোটখাট মানুষ। মাথায় সব সময় গোল টুপি পরে থাকেন। মুখ ভর্তি চাপ দাড়ি, বুদ্ধিদীপ্ত ঝকঝকে চোখ, সৌম্য চেহারা, ফর্সা গায়ের রং। সারাক্ষণ জাবর কাটার মত পান চিবুতে থাকেন। জর্দা দেওয়া পান। কাছে গেলে গা থেকে ভুর-ভুর করে জর্দার গন্ধ আসে। যে গন্ধে আমার মাথা ঝিম-ঝিম করে। তা যা-ই হোক, সব মিলিয়ে তাঁকে আমার ভাল মানুষ বলেই মনে হয়। অবশ্য কয়েক দিনের পরিচয়ে একটা মানুষকে পুরোপুরি চেনা যায় না।

আমার আশ্রয়দাতা প্রিন্সিপাল সাহেবকে, থাকা খাওয়ার বদলে নগদ কিছু টাকা দেবার প্রস্তাব করেছিলাম। তা শুনে প্রিন্সিপাল সাহেব জিভ কেটে লজ্জিত গলায় বলেন, 'ছিহ্! এসব কী কথা বলছেন! লোকে জানলে গ্রামে আর আমার মুখ দেখানোর অবস্থা থাকবে না।'

আমি ইতস্তত করে আবার বলেছিলাম, 'বর্তমান এই দুর্মূল্যের বাজারে একটা লোকের ঘাড়ের উপরে বসে-বসে খেতে তো আমার খুব লজ্জা হয়।'

প্রিন্সিপাল সাহেব এক গাল হাসি দিয়ে বলেন, 'আপনার যদি ঋণ শোধ করার এতই ইচ্ছে হয়, তা হলে প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে আমার মেয়ে দুটিকে ঘণ্টাখানেক পড়াবেন।'

প্রিন্সিপাল সাহেবের দুই মেয়ে। বড় মেয়ের নাম রেবু আর ছোটটির নাম টুনি। রেবু হাজী আব্দুল কাদের ডিগ্রী কলেজেরই এইচ.এস.সি ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী আর টুনি ক্লাস সেভেনে পড়ে।

প্রিন্সিপাল সাহেবের কথা মতই প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে তাঁর মেয়েদের পড়াই। নিজেকে কিছুটা ভার মুক্ত মনে হয়, কিন্তু প্রিন্সিপাল সাহেবের আতিথেয়তার কাছে সে ভার আবার দ্বিগুণ হারে বেড়ে যায়।

সব কিছু মিলিয়ে বলতে হয়, প্রিন্সিপাল সাহেবের বাড়িতে বেশ আরামেই আছি। শুধু ভোর বেলা...

গ্রামের লোকজন রাত দশটার আগেই ঘুমিয়ে পড়ে। আমি শহুরে মানুষ। দীর্ঘদিনের অভ্যেস অনেক রাত করে ঘুমানো এবং সকালে দেরিতে ওঠা। ভোরের ঘুম আমার কাছে স্বর্গীয় পরশ বলে মনে হয়। কিন্তু প্রিন্সিপাল সাহেবের বাড়িতে এখন আর আমি ভোরের স্বর্গীয় ঘুমটা দিতে পারি না। ফজরের আযানের পরই প্রিন্সিপাল সাহেব এসে ডাকাডাকি শুরু করেন, 'আসাদ সাহেব, উঠে পড়ুন। আযান হয়ে গিয়েছে, নামাজ পড়তে যেতে হবে...'

অগত্যা স্বর্গীয় ঘুমটা ভেঙে চোখ ডলতে-ডলতে আমাকে প্রিন্সিপাল সাহেবের সাথে মসজিদের দিকে যেতে হয়। দিনের পর দিন এভাবে আমার ঘুমের ঘাটতি হওয়ায় সারাদিন আমাকে এক ধরনের অস্বস্তি আর মাথা ধরা নিয়ে কাটাতে হয়।

দুই

রেবু আর টুনি দুই বোন, প্রতি সন্ধ্যায় বই-খাতা নিয়ে আমার কাছে পড়তে আসে।

সেভেনে পড়ুয়া মিষ্টি চেহারার টুনি বেশ চঞ্চল ও চটপটে স্বভাবের। সারাক্ষণ হড়বড় করে কথা বলতেই থাকে। কিন্তু রেবু, টুনির সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের। শান্ত-লাজুক টাইপের মেয়ে। অল্প কথা বলে। নিজ থেকে আগ বাড়িয়ে কখনোই কিছু বলে না। আমি কিছু জিজ্ঞেস করলে, ক্ষীণ স্বরে সংক্ষেপে সেই প্রশ্নের জবাব দেয়। মেয়েটা এতই নিচু স্বরে কথা বলে যে মাঝে-মাঝে আমি তার সব কথা বুঝিও না।

রেবু আর একটা কাজ করে, তা হলো সে সব সময় বোরখা পরে থাকে। মুখটাও নেকাব দিয়ে ঢেকে রাখে। সে বাইরে বা কলেজে যায় বোরখা পরে–খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু আশ্চর্য, সে আমার কাছে পড়তেও আসে বোরখা পরে। কোনও মেয়ে বাড়িতে বসেও বোরখা পরে, এমনটা এর আগে আমি আর দেখিনি! এ বাড়িতে এত দিন হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত রেবুর চোখ দুটি আর ফর্সা কোমল হাত দুটি ছাড়া তার চেহারার ছায়াও কখনও দেখতে পাইনি।

দিঘির জলের মত টলমলে মায়াকাড়া সেই দুটি চোখ। অপূর্ব চাহনি সে চোখের। চোখে-চোখ পড়লে, বুকের ভিতরটা ঢিপ-ঢিপ করে ওঠে। তবে চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না, চোখে চোখ পড়তেই তৎক্ষণাৎ সে চোখ সরিয়ে নেয়।

সন্ধ্যায় যথারীতি রেবু আর টুনি এসে উপস্থিত। ভিতরে ঢুকে না বসেই, রেবু হালকা গলায় টুনিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ফিরে চল। আজ আমরা পড়ব না। স্যারের শরীর ভাল নেই।'

আমি বেশ অবাক হলাম। অবাক চোখে রেবুর দিকে তাকালাম। বরাবরের মতই রেবু সঙ্গে-সঙ্গে চোখ সরিয়ে ফেলল। আমার অবাক হওয়ার কারণ–সত্যিই আজ বিকেল থেকে আমার প্রচণ্ড মাথা ব্যথা করছে। গায়ের উত্তাপও বেড়ে যাচ্ছে। জ্বর আসছে বোধ হয়। কিন্তু রেবু ঘরের ভিতরে ঢুকেই তা বুঝল কী করে! তা হলে মেয়েটা কি খুব গভীর মনোযোগের সাথে আমাকে লক্ষ করে?

রেবু, টুনি চলে গেল। যাওয়ার সময় রেবু একবার পিছন ফিরে তাকাল। আমি চমকে উঠলাম। রেবুর চোখ দুটিতে যেন দরদ উথলে পড়ছে!

আমার প্রতি বেলার খাবার প্রিন্সিপাল সাহেব নিজেই নিয়ে আসেন। নিজ হাতেই আমাকে খাবার বেড়ে খাইয়ে যান। আজ একটু আগে-ভাগেই চলে এলেন।

প্রিন্সিপাল সাহেব আমার কপালে হাত রেখে ঝিম ধরা গলায় বললেন, 'সত্যিই তো আপনার গায়ে বেশ জ্বর! মেয়েরা গিয়ে বলেছে, আপনার যে জ্বর এসেছে। তাই তো এশার নামায পড়েই খাবার নিয়ে চলে এলাম। সাথে জ্বরের ওষুধও নিয়ে এসেছি।'

আমার মোটেই খেতে ইচ্ছে করছিল না। প্রিন্সিপাল সাহেবের পীড়াপীড়িতে কয়েক নলা ভাত গিলে ওষুধটা খেয়ে শুয়ে পড়লাম। ভাত খাওয়ার মধ্যে প্রিন্সিপাল সাহেব গিয়ে ঘর থেকে একটা মোটা কাঁথা আর একটা কম্বল নিয়ে এসেছেন।

মোটা কাঁথা আর কম্বল মুড়ি দেওয়ার পর বেশ ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে শরীরটা হালকা হয়ে যাচ্ছে, মাথা ব্যথাটা ছেড়ে দিয়ে মাথা কেমন ফাঁকা-

ফাঁকা লাগছে। তবে যতই ভাল লাগুক বেশ বুঝতে পারছি, জ্বর আরও বাড়ছে। চোখের সামনে নানা ধরনের অদ্ভুত দৃশ্য ফুটে উঠছে। আমি যেন খোলা মাঠের মাঝে হেঁটে বেড়াচ্ছি। শিরশিরে বাতাস বইছে। সে বাতাস গায়ে কাঁপন ধরাচ্ছে। আবার কখনও দেখি, আমি যেন সমুদ্র সৈকতে বসে আছি। দমকা বাতাসে আমার শীত লাগছে। আবার দেখি, আমি যেন বৃষ্টির মাঝে হেঁটে চলেছি। ঠাণ্ডা পানির ছোঁয়ায় আমার শরীর কাঁপছে।

অদ্ভুত দৃশ্যগুলোর মাঝে কখন যেন হারিয়ে গেলাম। ঠিক বলতে পারব না ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নাকি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। গভীর রাতে আমি সম্বিত ফিরে পেলাম। চোখ না খুলেই অবাক হয়ে টের পেলাম, কে যেন আমার কপালে শীতল একটা হাত রেখে বসে আছে। তার গা থেকে দামি পারফিউমের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি।

টেবিলের উপরে হারিকেনটা টিমটিম করে জ্বলছে। প্রিন্সিপাল সাহেব হারিকেন জ্বেলে রেখে গিয়েছেন অসুস্থ মানুষের ঘর একেবারে অন্ধকার করতে নেই, কখন কী প্রয়োজন হয়!

চোখ খুলে হারিকেনের টিমটিমে আলোতে দেখি, আমার শিয়রে এক তরুণী বসে আছে। তরুণীর গায়ে ঝলমলে লাল শাড়ি। হাত ভর্তি লাল কাঁচের চুড়ি। কপালে লাল টিপ। ঠোঁটে রক্তরাঙা লাল লিপস্টিক। অত্যন্ত মিষ্টি চেহারা তরুণীর। ফর্সা রঙ, ভাসা-ভাসা আয়ত চোখ, দীর্ঘ আঁখি পল্লব, তীক্ষ্ণ নাক, প্রশস্ত কপাল, কাঁধের উপরে ছড়ানো এক রাশ রেশমি কালো চুল। তরুণীর আলতো নড়াচড়ায়ই তার কাঁচের চুড়িগুলো টুনটুন শব্দ তুলছে।

আমি অবাক গলায় প্রশ্ন করলাম, 'কে তুমি?'

তরুণী আমার প্রশ্ন শুনে মুখ টিপে হাসতে লাগল। শরীর দুলিয়ে সে হাসছে। তার হাসি দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার খেয়াল হলো–আরেহ্! এ তো রেবু! রেবুকে বোরখা ছাড়া অন্য কোনও পোশাকে দেখা হয়নি বলে এতক্ষণে চিনতে পারিনি।

রেবুর শীতল হাতখানা আমার কপাল বেয়ে নেমে চোখের উপরে স্থির হলো। ঠিক তখনই যেন আমি সম্মোহিতের মত ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে বেশ বেলা করে আমার ঘুম ভাঙল। ততক্ষণে রোদের মিষ্টি আলো পুবের জানালা গলে আমার বিছানায় এসে পড়েছে। শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। গায়ে বোধ হয় জ্বর নেই। তবু ভাল আজ প্রিন্সিপাল সাহেব ফজরের নামাজ পড়তে ডাকেননি।

রাতের কথা মনে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে পুলকিত হয়ে উঠলাম। রেবু বিছানার শিয়রের যে জায়গায় বসে ছিল, সে জায়গার বিছানার চাদর এখনও আলুথালু তার গায়ের পারফিউমের মিষ্টি গন্ধটা এখনও ঘরের বাতাসে

ভেসে বেড়াচ্ছে। আনন্দে নেচে উঠল আমার মন। আজ সব কিছু ভাল লাগছে। ভাল লাগছে সকালের মিষ্টি রোদ। ভাল লাগছে শরতের ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ। ভাল লাগছে ঝিরঝিরে বাতাস। এমন কী ভাল লাগছে জানালার পাশের বড় আম গাছটার মগডালে ডেকে যাওয়া কাকটার এক ঘেয়েমি কা... কা...কা ডাকও!

হঠাৎ আমার বুকটা কেঁপে উঠল, দরজার দিকে তাকিয়ে। দরজা তো ভিতর থেকে বন্ধ। তা হলে রাতে...সব কিছু কি জ্বরের ঘোরে আমার মস্তিষ্কের কল্পনা! না, তা হতে পারে না! আমার ঘরের বাতাসে মিষ্টি পারফিউম, বিছানার শিয়রের চাদর আলুথালু, সেই নরম হাতের শীতল স্পর্শ...সবই কি মিথ্যে!

আমার বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে, হঠাৎ আমার চোখে পড়ল বালিশের পাশে পড়ে আছে একটা লাল টিপ। এই লাল টিপটা কাল রাতে রেবুর কপালে দেখেছি। কোনও কারণে হয়তো কপাল থেকে টিপটা খসে পড়েছে। সযত্নে টিপটা তুলে নিলাম। মনে-মনে ভাবলাম, একদিন নিজের হাতে এই টিপটা রেবুর কপালে পরিয়ে দেব।

দরজার দিকে তাকিয়ে আবার আমার মনের ভিতরে দুলে উঠল। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ! তা হলে কী করে কাল রাতে রেবু এই ঘরে এসেছিল!

তিন

সন্ধ্যায় যথারীতি রেবু ও টুনি আমার কাছে পড়তে এল।

রেবুর মধ্যে কোনও পরিবর্তন চোখে পড়ল না। সে আগের মতই বোরখা পরে, নেকাব দিয়ে মুখ ঢেকে এসেছে। আগের মতই মোলায়েম গলায় কথা বলছে। চোখে চোখ পড়লে তৎক্ষণাৎ চোখ সরিয়ে নিল।

আমি অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে রেবুকে পর্যবেক্ষণ করে কিছু বোঝার চেষ্টা করছি। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। রাতের সেই লাল শাড়ি পরা রেবুর সাথে এই রেবুর কোনও মিল খুঁজে পাচ্ছি না। বরং লক্ষ করছি, বারবার তৃষ্ণার্তের মত রেবুর দিকে তাকানোর ফলে রেবু কেমন সংকোচ বোধ করছে। ছোট্ট টুনি তো মুখ ফুটে বলেই ফেলল, 'স্যর, আপনি কেমন যেন আগের মত আর মনোযোগ দিয়ে পড়াচ্ছেন না। সারাক্ষণ মনমরা হয়ে কী যেন ভাবছেন।'

আমি থতমত খেয়ে বললাম, 'না...মানে...জ্বর থেকে ওঠার পর শরীরটা ঠিক আগের মত...এখনও বোধ হয় গায়ে সামান্য জ্বর আছে।'

বেশ কয়েক দিন হতে চলল, আমাকে স্থায়ী ভাবেই যেন অন্যমনস্ক রোগে পেয়ে বসেছে। কলেজে ক্লাস নেয়ার সময়ও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। ব্যাপারটা প্রিন্সিপাল সাহেবের চোখেও পড়ল। প্রিন্সিপাল সাহেব একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, আসাদ সাহেব, আজকাল আপনাকে কেমন যেন অন্য রকম লাগছে! শরীর ঠিক আছে তো?'

আমি প্রিন্সিপাল সাহেবের প্রশ্নের কোনও জবাব দিতে পারিনি।

আগে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প-উপন্যাসের বই পড়তাম। এখন রাত জেগে রেবুকে নিয়ে ভাবি। শুধু রেবুকে নিয়েই যে ভাবি সেটা বললে ভুল হবে। অনেক বিচিত্র ভাবনা মাথায় আসে। সেদিন রাতের সেই লাল শাড়ি পরা রেবু আর বোরখা পরা রেবুর যে অনেক তফাৎ! রেবু যথেষ্টই নম্র-লাজুক একটা মেয়ে–সে কী করে সেদিন রাতে আমার ঘরে এসেছিল! দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, তা হলে সে এসেছিল কী করে! আমি ওই রাতের স্মৃতিকে একটা স্বপ্ন বলেই ভেবে নিতাম, যদি-না কুড়িয়ে পাওয়া লাল টিপটা বুকে কাঁটার মত বিঁধে থাকত। লাল টিপটা তো মিথ্যে নয়। টিপটা এখনও আমার কাছে আছে। আমার বইয়ের পাতার ভাঁজে রেখে দিয়েছি। প্রতিদিন একবার বের করে, টিপটাকে দেখে-দেখে আবোল-তাবোল ভাবি।

ভাবতে-ভাবতে মাঝে-মাঝে আমার বিবেক আমাকে দংশন করে। প্রিন্সিপাল সাহেব আমার আশ্রয় দাতা, অন্ন দাতা...আর সেই আমি কি-না তাঁর মেয়ের সাথে প্রেম করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছি। পাতে খেয়ে বুকে ঠোকর দিতে চাচ্ছি আমি! রেবু, টুনিকে আমি পড়াই। সেই অর্থে আমি শিক্ষক, ওরা ছাত্রী, ছাত্রী-শিক্ষকের যতটুকু সম্পর্ক রাখতে হয় সেটাই থাকা উচিত, ব্যস। এ কী করছি আমি!

উল্টো-পাল্টা ভাবতে-ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি, ঘুমের মধ্যেই শুনতে পেলাম মৃদু টুন-টুন শব্দ। এক সময় ঘুম পুরোপুরিই ছুটে গেল। মেয়েদের কাঁচের চুড়ির টুনটুন শব্দ হচ্ছে। অন্ধকারেও স্পষ্টই বুঝতে পারলাম ঘরের মধ্যে কারও অস্তিত্ব। টেবিলের উপরে আলো কমিয়ে প্রায় নিভু-নিভু অবস্থায় হারিকেনটা জ্বালানো রয়েছে। গ্রামের মানুষ ঘুমাবার আগে এভাবেই হারিকেনের আলো কমিয়ে নিভু-নিভু অবস্থায় জ্বালিয়ে রাখে। তা না হলে ঘুম ভেঙে পানি খেতে চাইলে বা টয়লেটে যেতে চাইলে, আলো পেতে সমস্যা হয়।

বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে হারিকেনের আলোটা বাড়ালাম। আলো স্পষ্ট হতেই দেখলাম, লাল শাড়ি পরা আমার সেই স্বপ্ন কন্যা সমস্ত ঘর তন্নতন্ন করে কী যেন খুঁজছে। আমি হতবাক হয়ে গেলাম! হতবাক ভাবটা সামলে কোনও মতে প্রশ্ন করলাম, 'কী খুঁজছ তুমি? কে তুমি?'

লাল শাড়ি পরা তরুণী আমার বইয়ের মধ্যে খুঁজতেই তার কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা পেয়ে গেল। আমিও ততক্ষণে বুঝলাম সে তার টিপটা খুঁজছিল। ওটা পাওয়ার পরে, কপালে টিপটা পরে, আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি দিল সে। এত সুন্দর সে হাসি! হাসিটা আমার হৃদয় স্পর্শ করল! আচমকা হাসির সাথে-সাথেই ঘরের ভিতরে দমকা হাওয়ার সৃষ্টি হলো। দমকা হাওয়ায় হারিকেনটা নিভে গেল। সমস্ত ঘর ডুবে গেল গভীর অন্ধকারে, সেই সাথে এক রাশ নিস্তব্ধতা। আমি টেবিলের উপরে হাতড়ে দেয়াশলাইটা পেয়ে গেলাম। দেয়াশলাই ধরিয়ে আবার হারিকেনটা জ্বাললাম। হারিকেনের আলোতে দেখি ঘরে কেউ নেই, লাল শাড়ি পরা স্বপ্ন কন্যা উধাও! ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ!

আমার মাথাটা এলোমেলো লাগছে। কী হচ্ছে এসব! বাস্তবিকই লাল শাড়ি পরা কেউ কি আমার ঘরে এসেছিল! নাকি ভুল দেখেছি!

বইয়ের ভাঁজে খুঁজে দেখি লাল টিপটা নেই। তা হলে! এই তরুণী কে! আমি এখন শতভাগ নিশ্চিত এই তরুণী রেবু নয়। রেবু হতে পারে না। রেবুর মত সহজ-সরল একটা মেয়ে এত রাতে আমার ঘরে আসার প্রশ্নই ওঠে না। তা হলে মেয়েটা কি অপার্থিব কেউ!

ভাবতে-ভাবতে আমার দিশেহারা অবস্থা। কার কাছে আমি এই সব কথা বলি? রেবু-টুনির কাছে? প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে? না, তা উচিত হবে না। ভিত্তিহীন এমন কথা শুনলে তাঁরা আমাকে পাগল ভাববেন। তাঁদের মুখ থেকে এই কথা ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত গ্রামে, এমনকী কলেজে। তখন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও আমাকে পাগল ভাববে।

সারারাত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে ভোরের দিকে একটু তন্দ্রার মত এল—অমনি শুনতে পেলাম প্রিন্সিপাল সাহেবের গলা, 'আসাদ সাহেব, উঠে পড়ুন...ফজরের আযান হয়ে গেছে...'

কী আর করা, বিছানা ছেড়ে প্রিন্সিপাল সাহেবের সাথে মসজিদের দিকে গেলাম।

নামাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে গ্রামের এক লোকের কাছে আমরা ভয়ানক এক খবর শুনলাম।

শুনলাম, গ্রামের চেয়ারম্যান গফুর মিয়ার ছেলে মনির গত রাতে খুন হয়েছে। তার বীভৎস লাশ পাওয়া গেছে উত্তর পাইক পাড়ার তিন রাস্তার মোড়ের বট গাছের নীচে। রাতে মনির বন্ধুদের নিয়ে সাহেবপুর বাজারে যাত্রা দেখতে গিয়েছিল। যাত্রা চলাকালীন সময়ে মনিরকে লাল শাড়ি পরা, লম্বা করে ঘোমটা টানা এক নারী এসে ডাকে। মেয়েটি মনিরকে বন্ধুদের কাছ থেকে আড়ালে নিয়ে যায়। বন্ধুরা মনিরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। তারা ধরে নেয়, যাত্রার কোনও মেয়ে মনিরকে ডেকে নিয়েছে। কারণ মনিরের সাথে

যাত্রার বেশ কয়েকটা মেয়ের ভাব-ভালবাসা আছে। কয়েক ঘণ্টা পার হয়ে যাওয়ার পরও যখন মনির ফিরে এল না, বন্ধুরা মনিরকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। সারারাত খুঁজেও মনিরকে পাওয়া যায় না। ভোর বেলা উত্তর পাইক পাড়ার বট গাছের নীচে মনিরের লাশ দেখতে পাওয়া যায়। বীভৎস লাশ–চোখ দুটি খুবলে তুলে ফেলা হয়েছে, সমস্ত শরীর তীক্ষ্ণ নখের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত, কোমরের নীচে শিশ্নটাও টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। লোকজন কেউ-কেউ বলছে এ মানুষের কাজ নয়, কোনও হিংস্র জন্তু-জানোয়ার এমনটা করেছে। আবার কেউ বলছে ভূত, জিন পরীর কথা। তবে যা-ই হোক, লাশটা দেখে বোঝা যাচ্ছে প্রচণ্ড আক্রোশে–মানুষ জিন-ভূত হোক আর জানোয়ারই হোক, মনিরের এই অবস্থা করেছে।

মনে-মনে ভেবেছিলাম সরাসরি না হোক, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অন্য ভাবে লাল শাড়ি পরা নিশিকন্যা সম্পর্কে প্রিন্সিপাল সাহেব বা রেবু-টুনিকে কিছু জিজ্ঞেস করব। কিন্তু চেয়ারম্যানের ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে সেই সিদ্ধান্তও বদল করলাম। কারণ চেয়ারম্যানের ছেলের মৃত্যুর সাথেও লাল শাড়ি পরা, বড় করে ঘোমটা টানা কোন নারী জড়িত।

চার

আজকাল রাত আটটা-নয়টা বাজতেই গ্রামের পথ-ঘাট একেবারে জনশূন্য হয়ে যায়। সাহেবপুর বাজারের যাত্রার পালাও বন্ধ হয়ে গেছে। চেয়ারম্যানের ছেলের মৃত্যু সম্পর্কে বিভিন্ন গুজব ছড়িয়েছে। সবার মনে ভূত-পেত্নী, দৈত্য-দানবের ভয় ঢুকে গেছে। ভয়ে অধিকাংশ লোকজনই সন্ধ্যার পর আর বাড়ি থেকে বের হয় না।

আমি যথারীতি সন্ধ্যার পরে রেবু-টুনিকে ঘণ্টা খানেক পড়াই। পড়ানো শেষে নিজের ঘরে বসে গল্পের বই পড়ি অথবা নিশিকন্যাকে নিয়ে ভাবি।

আজকাল একটা ব্যাপার লক্ষ করছি, নিশিকন্যাকে নিয়ে ভাবতে আমার খুব ভাল লাগে। মনের ভিতরে বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করি। সত্যি কথা বলতে কী, এর আগে কোনও মেয়েকে আমার এত ভাল লাগেনি। কী অপূর্ব তার চাহনি! মনে হয় ওই চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে সারা জীবন পার করে দেয়া যাবে। কী লাবণ্য তার চেহারায়! কী মিষ্টি তার হাসি!...

ও রকম অদ্ভুত গতিবিধির একটা মেয়েকে আমার ভয় পাওয়ার কথা! ভয় যে একেবারে পাই না তা বললে ভুল হবে। তবে ভয়ের চেয়ে ভাল লাগাটা আরও বেশি।

অনেক রাত। ঘুমন্ত গ্রাম। চারদিকে পিনপতন নীরবতা। মাঝে-মাঝে রাত জাগা পাখি আর কুকুরগুলোর নিজেদের ভাষার কথোপকথন শোনা যাচ্ছে।

আমি বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছি। চোখে ঘুম নেই। নিশিকন্যার কথা ভাবছি। টেবিলের উপরে আলো কমিয়ে রাখা হারিকেন। আবছা আলোর মাঝে আমার অস্থির চোখ দুটো যেন কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আচমকা আমার শিয়রের পিছনে কাঁচের চুড়ির টুনটুন শব্দ। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখি লাল শাড়ি পরা নিশিকন্যা দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ হাসি-হাসি। আমার বুকটা ঢিপ-ঢিপ করে উঠল। নিশিকন্যা পিছন থেকে সরে এসে আমার শিয়রের পাশে বিছানায় বসল। তার গায়ের সৌরভে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। নিশিকন্যা প্রথমবারের মত মুখ খুলল। কী মিষ্টি গলার স্বর!

'তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? এতক্ষণ ধরে তো আমার অপেক্ষাই করছিলে।'

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, 'আমি মোটেও ভয় পাচ্ছি না। সত্যি করে বলো তো কে তুমি?'

'আমি কে তা জানলে তুমি আরও ভয় পাবে। তার চেয়ে বরং আমার পরিচয়টা গোপনই থাক।'

'না, আমি ভয় পাই না। কারণ...' কথা শেষ না করে আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'কী কারণ!'

ভণিতা না করে বললাম, 'আমি তোমাকে ভালবাসি।' আমার গলা কেঁপে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বললাম, 'ভালবাসার মানুষকে কেউ ভয় পায় না।'

ভালবাসার কথা শুনে নিশিকন্যার চোখ আর্দ্র হয়ে উঠল। ভাঙা গলায় নরম স্বরে বলল, 'তুমি কী করে বুঝলে, আমি যে মানুষ।'

'তা হলে তুমি কী!'

চোখ মুছতে-মুছতে নিশিকন্যা বলল, 'তা আরেক দিন বলব। এখন আমি চলে যাব।'

আমি নিশিকন্যার হাত চেপে ধরলাম। মখমলের মত কোমল আর মাখনের মত নরম সেই হাত। মুখে বললাম, 'আজই বলতে হবে।'

'আজ নয় কাল, আমি কাল আবার আসব। এখন আমাকে যেতেই হবে।'

নিশিকন্যা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। দরজার সামনে গিয়ে পিছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি দিল। আমিও বিছানা থেকে নেমে তার

পিছু নিলাম। দরজার কাছে আমি পৌঁছাতে-পৌঁছাতে সে বন্ধ দরজা গলে বেরিয়ে গেল। আমার নার্ভ তখন এতই উত্তেজিত ছিল যে সেই ব্যতিক্রম চোখেই পড়ল না। দরজা খুলে আমিও বাইরে বের হলাম। ফকফকা চাঁদের আলো। নিশিকন্যা কেমন অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে। আমিও তার পিছু-পিছু হাঁটতে লাগলাম। আমি যতই দ্রুত হেঁটে তার কাছে পৌঁছাতে চাই সে ততই দূরে সরে যায়। নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব রয়েই যাচ্ছে। এক সময় সে ঝোপ-ঝাড়ে ঘেরা অন্ধকারের মাঝে মিলিয়ে গেল। আমার সম্বিত ফিরে এল। দেখলাম আমি প্রিন্সিপাল সাহেবের বাড়ির একেবারে উত্তর দিকে এসে পৌঁছেছি। ঝোপ-জঙ্গলে ভরা একটা জায়গা। চারদিক থেকে বুক সমান দেয়াল দিয়ে ঘেরা।

পাঁচ

সন্ধ্যায় রেবু-টুনিকে পড়াচ্ছি। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে গত রাতের নিশিকন্যার স্মৃতি।

বাড়ির উত্তর দিকের জংলা জায়গায়, যেখানে গিয়ে নিশিকন্যা হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল, সেখানটা দিনের আলোতে আজ ভালভাবে দেখে এসেছি। দুই থেকে আড়াই কাঠা জায়গা, পলেস্তারা খসে পড়া নোনা ধরা ইঁটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। রাতের বেলা যতটা ঝোপ-ঝাড়ে ঘেরা জংলা জায়গা বলে মনে হয়েছিল দিনের আলোতে দেখা গেল বাস্তবে ততটা নয়। অযত্ন আর অবহেলায় বড় হয়ে ওঠা কয়েকটা গাছ আর সামান্য ঝোপ-ঝাড়। ভিতরে ঢোকার জন্য মরিচা ধরা জীর্ণ একটা গেটও রয়েছে।

আমি এখন বুঝতে পারছি ওই জায়গাটায় কী! তার পরেও নিশ্চিত হওয়ার জন্য টুনিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের বাড়ির উত্তর দিকের দেয়াল ঘেরা ওই জায়গাটা কী?'

টুনি তার স্বভাবসুলভ হড়বড় করে বলতে লাগল, 'বাড়ির কবরস্থান। ওখানে আমার দাদা-দাদীর কবর আছে, অনেক পুরানো কবর। আর আমার...' টুনির গলার স্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে ওঠে, 'বড় আপুর কবর আছে। বড় আপুর নাম ছিল রেণু। রেণু আপু আমাকে খুব ভালবাসত...'

হঠাৎ রেবু চটে যাওয়া গলায় বলে উঠল, 'টুনি, এসব কী হচ্ছে! পড়া বাদ দিয়ে গল্প বলা হচ্ছে!' রেবু কটমট চোখে টুনির দিকে তাকাল। রেবুর এমন রুক্ষ মূর্তি এর আগে আমি আর দেখিনি।

টুনি রেবুর ধমক খেয়ে কথা বন্ধ করে, বই খুলে, ছলছল চোখে বইয়ের

দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি কৌতূহল নিয়ে দু'জনকেই উদ্দেশ্য করে বললাম, 'তোমাদের বড় বোন কীভাবে মারা গিয়েছিল?'

রেবু-টুনি দু'জনই মাথা নিচু করে বসে আছে। রেবুর চোখও এখন ছলছল করছে। তাদের মুখভঙ্গি দেখে বুঝলাম তারা তাদের বোনের মৃত্যুর কারণ বলতে চায় না। তা ছাড়া রেবুর বোধ হয় কিছুটা অভিমানও রয়েছে তার মৃত বোনের প্রতি।

রাতের খাবার নিয়ে প্রিন্সিপাল সাহেব আমার ঘরে এলেন।

খাওয়ার ফাঁকে আমি প্রিন্সিপাল সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, 'স্যর, আপনার বড় মেয়েটি কীভাবে মারা গিয়েছিল?'

কথাটা শোনার পর প্রিন্সিপাল সাহেব চোখ বড়-বড় করে পলকহীন চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া গলায় বললেন, 'আপনি কার কাছে জেনেছেন আমার যে আর একটি মেয়ে ছিল!'

আমি চুপ করে রইলাম। বুঝলাম টুনির নাম বললে, ঘরে গিয়ে টুনিকে বকাঝকা করবেন। কারণ, বড় মেয়ের নাম শুনে তিনি যেমন আপসেট হয়ে পড়েছেন!

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে, প্রিন্সিপাল সাহেব রাগী-রাগী গলায় বললেন, 'আপনি ভুল শুনেছেন। আমার আর কোনও মেয়ে ছিল না। রেবু আর টুনি আমার দুটি মাত্র মেয়ে।'

গত রাতের মত ঠিক বারোটা এক মিনিটের সময় নিশিকন্যা এসে আমার ঘরে হাজির হলো।

আমরা দু'জন মুখোমুখি হয়ে বসলাম। মৃদু আঁচে হারিকেন জ্বলছে। হারিকেনের ম্লান আলোতে দু'জনের চোখ টলমল করছে। দু'জন-দু'জনার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছি। মনে হচ্ছে দু'জন-দু'জনার কত দিনের চেনা! কত আপনজন!

আমি নিশিকন্যার একটা হাত কোলে তুলে নিয়ে বললাম, 'এখন বলো কে তুমি? কেন তুমি আমাকে এভাবে তোমার রূপের মোহে পাগল করলে!'

নিশিকন্যা কাতর গলায় বলল, 'তুমি শুনবে আমার কথা! আমার কষ্টগুলো! আমার না বলা কথাগুলো! যে কথাগুলো আজ পর্যন্ত কাউকে আমি বলতে পারিনি।'

আমি নিশিকন্যার হাতে ভরসা দেয়ার ভঙ্গিতে মৃদু চাপ দিয়ে বললাম, 'অবশ্যই শুনব! তোমার কথা শুনব বলেই তো আজ সারাদিন ধরে অধীর

আগ্রহে অপেক্ষা করেছি।'

'শোনো তা হলে, আমি প্রিন্সিপাল মোবারক হোসেনের বড় মেয়ে রেণু। রেবু-টুনির বড় বোন রেণু।'

এই পর্যন্ত শুনেই আমি অবাক গলায় বললাম, 'তুমি তো...'

নিশিকন্যা আমার ঠোঁটে তার আঙুল চেপে ধরে বলল, 'আগে সব শোনো, তার পরে যা বলার বলবে।'

'...ঘরের বড় মেয়ে বলে বাবা আমাকে খুব ভালবাসতেন। বাবার সাধ্যের মধ্যে আমার এমন কোনও আবদার নেই যা বাবা পূরণ করতেন না। আমি যদি বলতাম বাবা, আমাকে আলতা এনে দাও। বাবা চার মাইল দূরের হাট থেকে আমার জন্যে আলতা কিনে আনতেন। আমি নেইলপালিশ চাইতাম, বাবা নেইলপালিশ কিনে এনে দিতেন। আমি চুল বাঁধার ফিতে, চুড়ি চাইতাম, বাবা কিনে এনে দিতেন। বাবার খুব আদরের মেয়ে ছিলাম আমি।

'সেবার আমি এইচ.এস.সি প্রথম বর্ষের ছাত্রী। বাবার সাথেই কলেজে যাই, কলেজ থেকে ফিরে আসি। বাবা তিন দিনের জন্যে ঢাকা গেলেন। কলেজের কী এক ব্যাপারে তাঁকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যেতে হবে।

'ঢাকা যাওয়ার আগে বাবা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "মা, ঢাকা থেকে তোর জন্য কী আনব?"

'আমি খুশিতে নেচে উঠে বললাম, "বাবা, আমার জন্যে একটা লাল রঙের জামদানি শাড়ি আনবে।" লাল রঙ আমার খুব পছন্দের।

'বাবা ঢাকায়। আমাকে একা একাই কলেজে যেতে হয়, কলেজ থেকে ফিরতে হয়। একা-একা যেতে-আসতে আমার ভয়-ভয় লাগে। মনকে অভয় দেই, মাত্র তো তিনটা দিন, তার পরেই তো বাবা ফিরে আসছেন।

'সেদিন কলেজের ক্লাস শেষে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হলো। আমরা কয়েক বান্ধবী মিলে কলেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘণ্টাখানেক বৃষ্টি থামার অপেক্ষা করলাম। বৃষ্টিটা থামছেই না। আকাশ ভেঙে যেন বৃষ্টি শুরু হয়েছে! বৃষ্টি না থামায় বান্ধবীদের সবাই বৃষ্টিতে ভিজে-ভিজেই বাড়ির দিকে রওনা দিল। কলেজের বারান্দায় আমি একাই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। যদি বৃষ্টি থামে সেই অপেক্ষায়, খিদেয় পেটের ভিতর চোঁ-চোঁ করছে। সকালে প্রায় না খেয়েই কলেজে এসেছি। আর সইতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত বৃষ্টিতে ভিজেই বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলাম। অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরছে, আমি একা হেঁটে চলছি।

'হাঁটতে-হাঁটতে ইঁট বিছানো রাস্তার পাশের ক্লাবটার সামনে এসে পৌছালাম। চেয়ারম্যানের বখাটে ছেলে মনির এবং তার আরও কিছু বখাটে বন্ধুরা মিলে এই ক্লাবটা বানিয়েছে। তারা সব সময় ক্লাবের সামনে বসে

কেরাম খেলে আর স্কুল-কলেজগামী ছাত্রীদের দেখলে উত্ত্যক্ত করে। ক্লাবের সামনে এসে আমার কেমন ভয়-ভয় লাগছে। আশপাশে তাকিয়ে দেখলাম কেউ নেই, নির্জন চারদিক, ক্লাবেও কেউ নেই। হঠাৎ কোথা থেকে যেন মনির এসে আমার সামনে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে একটু আগেই নেশা করার স্পষ্ট ছাপ। সে আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলল, "এই যে, রূপবতী, বৃষ্টিতে ভিজে তোমার যৌবন যে একেবারে উপচে পড়ছে।" আমি ভয়ে জবুথুবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পশুটা আবার বিচ্ছিরি ভাবে হেসে বলল, "তুমিও একা, আমিও একা, চল না ক্লাব ঘরের ভিতরে গিয়ে একটু রঙ-তামাশা করি।" সে আমার গায়ে হাত দিতে চাইল। আচমকা আমি তার গালে একটা চড় বসালাম। চড় খেয়ে সে সত্যি-সত্যিই জানোয়ার হয়ে উঠল। আমাকে টেনে-হিঁচড়ে ক্লাব ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল। সেদিন আমার চিৎকার আর কান্না কেউই শুনতে পেল না।'

নিশিকন্যা কেঁদে উঠে বলল, 'শয়তানটা আমাকে নষ্ট করল।'

আমি নিশিকন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। কিছুক্ষণ কাঁদার পর নিশিকন্যা ভাঙা-ভাঙা গলায় আবার বলতে শুরু করল, 'বাড়িতে ফিরে এলাম। আমার মা-বোনেরা আমাকে দেখে কিছুই বুঝল না! বাথরুমে ঢুকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গোসল করলাম। কিছুতেই যেন আমার গা থেকে ওই পশুটার শরীরের দুর্গন্ধ যাচ্ছে না। নিজেকে অপয়া মনে হলো। কী করে এই মুখ বাবা-মাকে দেখাব? বৃষ্টি ঝরা আকাশটার মত আমিও সারাদিন আমার ঘরে বসে কাঁদতে থাকলাম।

'সন্ধ্যার পরে বাবা ঢাকা থেকে ফিরে এলেন। বাড়ি ফিরেই বাবা তাঁর আদরের মেয়েকে রেণু-রেণু বলে ডাকলেন। বাবা তো জানেন না তাঁর আদরের মেয়েটা আজ শেষ হয়ে গেছে।

'বাবা বসার ঘরে বসে আছেন। আমি ভাল ভাবে চোখ-মুখ মুছে, বসার ঘরের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'বাবা আমাকে দেখেই অনুতপ্ত গলায় বললেন, "মা, আমাকে ক্ষমা করে দে। তোর লাল রঙের জামদানি শাড়ি আনতে একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। বাড়িতে এসে মনে পড়ল। এত ব্যস্ততা ছিল! আগামী বার ঠিক এনে দেব।"

'আমি ভারাক্রান্ত গলায় বললাম, "ঠিক আছে, বাবা।"

'বাবা উদ্বিগ্ন গলায় আবার বললেন, "মা, তোকে অমন দেখাচ্ছে কেন? গায়ে জ্বর এসেছে নাকি! কাছে আয় দেখি গায়ে জ্বর কি-না।"

'আমি কোনওমতে নিজেকে সামলে বললাম, "না, জ্বর আসেনি।" ছুটে নিজের ঘরে চলে গেলাম।

'আমি নিজের ঘরে বসেও শুনছি, বাবা চেঁচিয়ে বলছেন, "রেণু, মা,

শাড়ি আনিনি বলে তুই তো আমার উপর রাগ করেছিস! দেখিস সবচেয়ে দামি শাড়িটাই তোকে এনে দেব।"

'বাবা ভেবেছেন শাড়ির জন্য আমি মন খারাপ করেছি। অথচ আমি যে...আমার মনের ভিতর ঝড় বইতে শুরু করেছে। আমি নষ্ট হয়ে গেছি। আমার এই শরীরটা আজ থেকে অপবিত্র। কী করে এই কলঙ্কিত মুখ আমি সবাইকে দেখাব। বুকের ভিতরটা জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছিল।

'রাত বারোটা। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য আত্মহত্যার পথ বেছে নিলাম। ঘরের আড়ার সাথে গলায় দড়ি দিয়ে আমি আত্মহত্যা করলাম।

'ভোর বেলা বাবা-মা, বোনেরা আমার ঝুলন্ত লাশ দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। মা-বোনেরা অনেক কাঁদল কিন্তু বাবা একটুও কাঁদল না। বাবা মনে করলেন, তিনি শাড়ি আনেননি বলেই আমি আত্মহত্যা করেছি। বাবার প্রচণ্ড অভিমান হলো। যে আদরের মেয়ে সামান্য একটা শাড়ির জন্য বাবা-মায়ের ভালবাসাকে উপেক্ষা করে চির বিদায় নিতে পারে, তার জন্যে কেঁদে কী লাভ! বাবা আমাকে ভুল বুঝলেন! সবাই আমাকে ভুল বুঝল!'

নিশিকন্যা ডুকরে কেঁদে উঠল। আমি নিশিকন্যার মাথাটা আমার বুকের মাঝে গুঁজে নিয়ে হাত বুলাতে লাগলাম। তার চোখের জলে আমার বুকটা ভিজে গেল, আর বুকের ভিতরটা হু-হু করতে লাগল।

কাঁদতে-কাঁদতে নিশিকন্যা এক সময় বলে উঠল, 'তুমি জানো না আমি বেঁচে থাকলে তোমার সাথেই আমার বিয়ে হত! আমি তোমার বউ হতাম! যেদিন থেকে এটা আমি বুঝলাম, সেদিন থেকেই আমি তোমার সাথে দেখা দিতে শুরু করলাম। কী মধুর হত আমাদের বিবাহিত জীবন! সব শেষ হয়ে গেল। আজ আমি একটা অতৃপ্ত আত্মা। যে আত্মার কখনোই মুক্তি মিলবে না।'

আমি ভেজা গলায় বললাম, 'কিছুই শেষ হয়নি। আমি আজও তোমার। শুধু তোমার। শুধু তোমারই জন্যই এই আমি।'

পরিশিষ্ট

রোজ রাতে নিশিকন্যা আমার কাছে আসে। না সে আর এখন নিশিকন্যা নয়, সে আমার প্রেয়সী।

আমার প্রেয়সী আর আমি সারারাত জেগে গল্প করি। কত কথা বলি আমরা দু'জনে—সুখের কথা, দুঃখের কথা, হাসির কথা, কষ্টের কথা...কত শত বিচিত্র বিষয় নিয়েই না কথা হয় আমাদের! যেন কথা ফুরায়ই না! রাত ফুরিয়ে যায়, রাত আসে, সে আমার আরও আপন হয়।

জোছনা রাতে আমরা দু'জন হাত ধরে গ্রামের মেঠো পথে হেঁটে

বেড়াই। বৃষ্টির রাতে দু'জনে এক সাথে বৃষ্টিস্নান করি। কী আনন্দ দু'জনার মনে!

মাঝে-মাঝে আমি তাকে কবিতা পড়ে শোনাই। সে মুগ্ধ হয়ে শোনে। তার চোখ দিয়ে মুক্তোর মত অশ্রু ঝরে পড়ে। সে চোখ মুছে গাঢ় স্বরে বলে, 'এই, কবিতাটা আবার পড়ো তো!'

চন্দ্রভুক রাতে,
আবছা অন্ধকার ঘরে বসে থাকি চুপচাপ।
শোনা যায় নূপুরের মৃদু শব্দ।
সহসা চমকে উঠি কে? কে?
চাপা হাসির আওয়াজ,
চুড়ির হালকা গুঞ্জন ভেসে আসে।
অজানা ফুলের সৌরভ ঘিরে রাখে চারিদিক,
মুগ্ধ নয়নে দেখি আমার প্রেয়সীর মুখ।
অধীর আগ্রহে আছি আমি
ভোরের অপেক্ষায়,
প্রথম সূর্যের, প্রথম আলোয়
তাকে দেখব বলে।

***